রোদ জল ঝড়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী

দাম : সাড়ে চার টাকা

প্রকাশক শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী,
১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী, বাণী-শ্রী প্রেস,
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই লেখকের অন্যান্য বইয়ের কয়েকখানি

ছেড়ে আসা গ্রাম (১ম ও ২য় খণ্ড)

শতাব্দীর সূর্য

বিদেশ বিভূঁই

পরম্পরা

অনেক সুর

সুভদ্রার ভিটে

বাজীমাৎ

মধুরেণ

স্বপ্ন-কোরক

॥ এক ॥

মিশন রো এক্সটেনশন।

পাঁচতলা বড়ো বাড়ি। তারই একতলার একটি ঘরের সামনে টুলে বসে দিব্যি আরামে ঝিমোয় অফিস পিয়ন কমলাপতি। কিছুদিন হলো এ তার একরকম নিত্যকার রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ার পর থেকেই তার কেমন জানি আপনা আপনিই ঝিমিয়ে আসে চোখ।

দ্বারভাঙা জেলার দেহাতী জোয়ান কমলাপতি। বছর দুই আগে সে যখন এই ডেভিড এ্যাণ্ড হাজরা কোম্পানীর চাকরি নেয় তখন তার শালপ্রাংশু চেহারার তারিফ না করেছে এমন কেউ ছিলেন না। বড়োবাবু তখন জোরকরেই তাকে তাঁর নিজের পিয়ন করে নিয়েছিলেন।

প্রথম বছরটা পুরোপুরি কমলাপতি তার বড়োবাবুর ঘরের এক কোনায় বসেই নকরি করেছে। পরের বছরের প্রথম ভাগটাও তার তেমনি ভাবেই কেটেছে। মাত্র কয়মাস আগে হুকুম হয়েছে তার ওপর টুল নিয়ে ঘরের বাইরে বসার। সেই থেকে কমলাপতি বাইরেই বসে আর দুপুর থেকে এমনিভাবে ঝিমোয়।

সাধে কি হুকুম হয়েছে কমলাপতির ওপর বাইরে বসার! বড়োবাবু অভিজ্ঞজন। রোগমুক্ত থাকতে হলে রোগীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, ছোটবেলা থেকেই নাকি এ নিয়ম

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মেনে আসছেন বড়োবাবু। বিশেষ করে এসব রোগের বেলা তো কথাই নেই। তাই কমলাপতিকে বাইরে বসিয়ে রেখে তিনি নিশ্চিন্ত। সেই থেকে তার আর তেমন কোনো ডাক খোঁজও করেন না বড়োবাবু। বলতে গেলে টুলে বসে ঝিমোনো আর হাই তোলাই তার এখনকার একমাত্র কাজ।

বড়োবাবুর সহৃদয়তায় কমলাপতি তাই সত্যি সত্যি খুব মুগ্ধ। অন্য সব কেরাণীবাবুরা যাঁর ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত, যাঁকে খুশি রাখার জন্যে তাঁদের মধ্যে চলে খোশামুদির প্রতিযোগিতা সেই অতি কড়া ব্যক্তিটি সত্যই ভারি স্নেহশীল তাঁর দেহাতী সরল অফিস পিয়নের প্রতি। সেজন্যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকাইতো স্বাভাবিক।

বড়োবাবুকে দুবেলা দুবার সেলাম করে আর মাসের শেষে মাইনের আধাআধি বখরা দিয়ে কমলাপতি সে কৃতজ্ঞতার ঋণ-শোধের সামান্য চেষ্টা করে মাত্র। বাস্তবিকই সে মনে করে, তার যে রোগ তাতে এখনো যে তার নকরি রয়েছে তা নিতান্তই বড়োবাবুর দয়ায়। তা নইলে কবে খতম হয়ে যেতো তার চাকরি। কাজেই সে যে সর্বক্ষণ বড়োবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট বখরা দিয়ে থাকে তা মোটেই তেমন কিছু নয়।

একি বলছো হরবিৎ, এমন মানুষকে দয়ার অবতার বলে মনে করে অফিস পিয়ন কমলাপতি ?—হাসপাতালের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে এই কাহিনী শুনে একটু আঁৎকেই উঠেছিলো

শান্তনু। দেশব্যাপী দাংগা হাংগামা, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ প্রভৃতি মানবতা-বিরোধী ঘটনাবলী মানুষের সুকোমল হৃদয়বৃত্তি-গুলোকে বহুলাংশে নষ্ট করে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহালেও কতদূর নির্মম হলে ক্ষয় রোগগ্রস্ত সাধারণ একজন পিয়নের কাছ থেকে তারই উপরস্থ মনিব যে মাসিক ঘুষ নেবার ব্যবস্থায় অবিচল থাকতে পারে, সে কথা ভাবলে অবাক লাগে বৈকি!

কিন্তু সেদিন আরো বেশি অবাক হতে হয়েছিলো শান্তনুকে। শুধু একজন নিরক্ষর সরল গ্রাম্য কমলাপতিই নয়, হরষিতের মতো শিক্ষিত সচেতন তরুণকেও অবস্থা বিপর্যয়ে নির্মম প্রলোভনের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে, একথা জেনে শান্তনু শুধু বিস্ময়াবিষ্টই হয়নি, অত্যন্ত বেদনাবোধও করেছে।

সর্বত্র ব্যর্থ হয়ে পুরো দুবছর চেষ্টার পর ডেভিড এ্যাণ্ড হাজরা কোম্পানীতে সামান্য বেতনের একটি চাকরির সন্ধান পেয়ে স্বভাবতই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলো হরষিৎ। সাধারণ কেরাণিগিরির কাজ হলেও এর চেয়ে ভালো কিছু সে প্রত্যাশা করে না।

সাক্ষাৎকারে বড়োবাবুকে খুশি করতে পেরে সে নিশ্চিত হলো চাকরি সম্বন্ধে। কিন্তু সবকথার পর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড়োবাবু যখন তার প্রাপ্যের কথা তুললেন তখন আবার নিরাশায় ভেঙে পড়া ছাড়া আর কিছুই করবার ছিলো না হরষিতের। নিজেকে চালিয়ে নেবারই যার ক্ষমতা নেই, বড়োবাবুর দাবী মেটানোর চিন্তাও যে করতে পারেনা সে।

হরষিৎকে মুখ কালো করে নির্বাক হয়ে যেতে দেখে শেষপর্যন্ত বড়োবাবুই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে ভাই, তোমাকে এনিয়ে কিছুই ভাবতে হবে না। বেকার জীবনের দুঃখ তোমার ঘুচে এসেছে, সে বিষয়ে আমিই তোমাকে নিশ্চিন্ত করে দিচ্ছি। আর মাত্র দুটো মাস তোমাকে একটু কষ্ট সইতে হবে। আসছে পয়লা থেকেই তুমি কাজে লেগে যাচ্ছ। তবে মাইনের খাতায় সই করলেও প্রথম মাসের মাইনেটা শুধু তুমি পাবে না। পরের মাস থেকে তুমি রেগুলার গুণে গুণে একশো ত্রিশ টাকা মাইনে নেবে।'

একথার প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে হরষিতেরও দয়ালু বলেই মনে হয়েছিলো বড়োবাবুকে। অনির্দিষ্টকাল ধরে ব্যর্থতায় ভেঙে আর চুরমার হয়ে যেতে হবে না তাকে। বড়োবাবুর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আশার আলো দেখতে পেয়েছিলা সে। তাই সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে হরষিৎ আরো দুমাস কঠোর সংগ্রাম করে চলেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে।

তারপর থেকে রীতিমতোই হরষিৎ মাইনে পেয়ে এসেছে, কিন্তু সংগ্রাম থেকে অবসর পাওয়া তার ভাগ্যে জোটেনি কোনোদিন। সামান্য আয়ের পাঁচ জনের সংসার চালিয়ে নেওয়াই শুধু নয়, ঐ বড়োবাবুকে খুশি রাখতে গিয়েও কম হিমশিম খেতে হয়নি হরষিৎকে, কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। চারদিকের তাল সামলাতে গিয়ে নিজেকে বঞ্চনা করতে হয়েছে পদে পদে।

সেই আত্মবঞ্চনারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে এই হাসপাতালে।

তবু দয়ালু বলে মনে হয়েছে তোমার বড়োবাবুকে?—হরষিতের নিজের মুখে তার দুঃখের কাহিনী শুনে সেদিন তাকে এই প্রশ্নটিই করেছিলো শান্তনু সমাদ্দার। সবশুনে দুচারটি কড়া কথাও তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিলো। কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনায় নিজেকে সে কোনো রকমে সামলে নিয়েছে।

শান্তনুর মনে হয়েছে, তার কথার জবাবে ঠিকই বলেছে হরষিৎ, 'অবস্থা বিপাকে ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা ভুল হয়ে যায় মানুষের, মানুষ তার প্রতিবাদের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। সেজন্যেই লোকে বলে, মানুষ অবস্থার দাস।'

কিন্তু একি নিতান্তই পরিহাস নয়?—সেদিন থেকে শান্তনুর মনে এ প্রশ্ন নিয়ে প্রচণ্ড তোলপাড়।

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আজো সে খুঁজে পায়নি। শুধু এইটুকুই সে বুঝেছে, স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মমতা-হীনতাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর সমাজ সংসারের বহু দুর্গতি দুর্দশার মূলেও প্রধানত রয়েছে মানবিকতার এই অভাব।

হাসপাতালে আসার পর রোগীদের মধ্যে হরষিতের সঙ্গেই শান্তনুর প্রথম পরিচয়। হরষিৎ বয়সে শান্তনুর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট। গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই সে হরষিতের দুঃখ-বেদনার নানা কাহিনী শুনেছে। সেই জীবন-যন্ত্রণার

সঙ্গে একান্তে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে সে দেখেছে, কোন তফাৎই নেই তাদের মধ্যে। আর এ শুধু তাদের দুজনের কথাই নয়, এমনি বেদনা এমনি হতাশা আজ বাঙ্‌লা দেশের ঘরে ঘরে।

শান্তনুকে প্রথম থেকেই খুব ভালো লেগেছিলো হরষিতের। এতো ভালো লেগেছিলো যে হঠাৎ একদিন সে 'ভালোদা' বলে ডাকতে শুরু করে দেয় শান্তনুকে। তারপর ধীরে ধীরে শান্তনুর সে ডাকটাই চালু হয়ে যায় সারা হাসপাতালে ছোটদের মুখে মুখে।

এক এক সময় পারিবারিক ইতিহাসের কথা মনে হয় শান্তনুর। পূর্বপুরুষদের নানা কীর্তিকলাপ স্মরণ করে সময় সময় গৌরবও বোধকরে সে। তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের সূর্যদীঘি আজো বহন করছে তার প্রপিতামহ সূর্য সমাদ্দারের পুণ্য নাম। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তী আছে যে বিরাট সে দীঘির স্বচ্ছ জলে যদি তেমন ভাবে তাকানো যায় তাহলে সূর্য সমাদ্দারের ছায়া নাকি চোখে পড়ে।

গাঁয়ে নাকি একবার ভীষণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছিলো অনাবৃষ্টির ফলে। জলের জন্যে হাহাকার। তৃষ্ণায় মানুষ মারা পড়ছে, এমনি খবরও আসছে এদিক ওদিক থেকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতংকের বিস্তৃতিতে সূর্য সমাদ্দার অত্যন্ত বিচলিত। চিন্তা-ভাবনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, সমগ্র জমিদারীর বিনিময়ে হলেও গ্রামবাসীদের জলকষ্ট তিনি চিরকালের মতো নিবারণ করে যাবেন। সেই

স্থির সিদ্ধান্তেরই ফল তাঁর জন্ম-গ্রামের বিখ্যাত সেই সূর্য-দীঘি।

গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা ছিলেন শান্তনুর পিতামহ। তারপর তার জ্যাঠামশায়ের দান-খয়রাতে উপকৃত হয়নি গ্রামে এমন লোক বিরল।

শান্তনুর জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল যুগ তখন। জমিদার হলেই বসে বসে খেতে হবে, এ মনোভাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন তার জ্যাঠামশায়। তিনি যেমনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, তেমনি ছিলেন বড়ো সরকারী চাকুরে। নিজেদের জমিদারী এলাকা ও গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব অশিক্ষা দূর করার জন্যে তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিলো না। গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য যথাসম্ভব মোচনের জন্যেও তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

বহু দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের বেতন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ জমিদার কাশীনাথ নিজে বহন করতেন এবং বাজারে দুটি মুদি দোকানের ওপর তাঁর এমন এক গোপন নির্দেশ ছিলো যার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাঁকে প্রতারণা করেছে। ঐ দুই দোকানের মালিকের সঙ্গে তিনি যে বন্দোবস্ত করেছিলেন তা বিচিত্র। শুধু বিচিত্র নয়, আত্মীয়-স্বজনরাতো বটেই, অনেক উপকৃত লোকরাও কাশীনাথের এই ব্যবস্থাকে পাগলামির সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছে। অন্তত ডালভাতের চিন্তা থেকে তিনি তাঁর গ্রামবাসীদের অব্যাহতি

দিকে চেয়েছিলেন। আর তারই জন্যে ঐ দুটি দোকানের ওপর তাঁর নির্দেশ ছিলো, চাল-ডাল-তেল-নুনের দাম যদি কোনো গ্রামবাসীর বাকি পড়ে তাহলে তা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর, সে জন্যে কোনো দরিদ্রের ওপর তারা যেন কোনোরকম পীড়ন না করে।

এমন পাইকারী ব্যবস্থার সুযোগ যে অনেক চতুর ব্যক্তিই পুরোমাত্রায় গ্রহণ করবে সে তো জানা কথা। এমন কি যে দুজন দোকানদারের সঙ্গে তাঁর এই দরাজ চুক্তি তারাও যে এ ব্যাপারে ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় দেবে তাতেও সন্দেহ করার কিছু নেই।

কাজেই কয়েক বছরের মধ্যেই এর ফল দাঁড়ালো বিপর্যয়কর। উচ্চ-শিক্ষিত ও পদস্থ চাকুরে হলেও জমিদার কাশীনাথ ছিলেন আত্মভোলা সরল মানুষ। তার ওপর তিনি ছিলেন অকৃতদার। কোনো বোঝাকেই বোঝা বলে মনে হতো না তাঁর। তাই অন্যের দায়িত্বকে অতি সহজে হাসিমুখে নিজের বলে গ্রহণ করতে কোনোদিনই কুণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে।

শান্তনুর বাবা কালীনাথও ছিলেন অদ্ভুত রকমের ভ্রাতৃভক্ত। তিনিই বাড়িতে থেকে নিজেদের জমিদারী দেখাশুনা করতেন। কিন্তু শিক্ষিত ও বিচক্ষণ হলেও বড়োভাই কাশীনাথের কোনো কাজ বা কোনো ইচ্ছের বিরোধিতা করার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। কাজেই দাদার সমস্ত খামখেয়ালের জের তাঁর ওপরও এসে পড়তো সময় সময়। কিন্তু তার পরিণতি তাঁকে

যে একদিন রিক্তভাণ্ডার করে ফেলবে কালীনাথ তা কোনো-দিনই ভাবতে পারেন নি।

রাজসাহী থেকে হঠাৎ কাশীনাথের মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকেই চারদিক থেকে একের পর এক তাঁর ঋণেরও সংবাদ আসতে থাকে কালীনাথের কাছে। গাঁয়ের দোকানদারদের কাছে কার কতো ঋণ হিসেবের খাতায় জমা হয়ে আছে জ্যেষ্ঠের নামে তাই বা কে জানে!

সমস্যা সমাধানের চিন্তায় বিচলিত ছোটভাই। ভ্রাতৃঋণের নানা খবর থেকে কালীনাথ বেশ বুঝতে পারছেন, দানের নেশায় পেয়ে বসেছিলো কাশীনাথকে। মনোবল ছিলো তাঁর অসীম। ঋণ করে দান করতেও তিনি কোনোরকম ভয় পেতেন না বা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। সব দেনাই তিনি অনায়াসেই শোধ করে দেবেন, তাই ছিলো তাঁর দৃঢ় ধারণা। কিন্তু তিনি আর কি করে জানবেন নিয়তির বিধান। নিজহাতে সমস্ত দেনা তিনি শোধ করবেন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলো তাঁকে আকস্মিক মৃত্যু।

অসম্পূর্ণ দলিল নিয়েও অনেকে এসে দাবী পেশ করছে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ নেই কালীনাথের, বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই তাঁর সেরকম। যে করেই হোক দাদার সম্মানকে অক্ষয় অটুট রাখতে হবেই!

শেষ পর্যন্ত তাই অধিকাংশ জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে জ্যেষ্ঠের ঋণ পরিশোধ করলেন কালীনাথ। শুধু তাই নয়, গ্রামের দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যে কাশীনাথ যে সমস্ত

বিধিব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন সে সবও তিনি চালু রাখলেন। কিন্তু সব কিছুরই ওপর খুবই সজাগ দৃষ্টি তিনি রাখতে লাগলেন সেই থেকে।

জমিদার বাড়ির পারিবারিক ব্যয়ের অংকও অকস্মাৎ অনেক নিচে নেমে এলো। সেই প্রথম অভাবের ছায়াস্পর্শ ঘটলো শান্তনুর জীবনে। কিন্তু সেই অভাব যাতে তীব্র হয়ে না ওঠে তাদের কাছে, তারই জন্যে কালীনাথ জমিদারের আসন থেকে নেমে এলেন অনেক নিচে অতি সাধারণদের মধ্যে, সকলের সমান হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে গেলেন।

আপন পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন কালীনাথ। শান্তনু তখন ঐ বিদ্যালয়েরই ছাত্র। প্রথম প্রথম তার সম্মানবোধেও যেন একটু আঘাত লেগে-ছিলো সেজন্যে। কিন্তু পরে সে বুঝেছিলো, গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা না নিয়ে আর কোনো উপায়ও ছিলো না তার বাবার।

তারপরের ইতিহাসের গতি অতি দ্রুত। সে ইতিহাস আরো করুণ। সমগ্র দেশের ওপর দিয়ে যে ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেলো চল্লিশের যুগে এবং যার ভয়াবহ পরিণতিতে দেশের বুক চিরে রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে উঠলো দেশবাসী, তারই ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে শান্তনুরাও হলো ছিন্নমূল। হররিষৎও তাই। সেদিক থেকে কোনো তফাৎই নেই হরষিৎ আর শান্তনুর মধ্যে। হতে পারে হরষিৎ গরীবের ছেলে। সে নিজেই বলেছে, নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম বলে কলেজের পড়াটুকু আর

শেষপর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। কিন্তু পূব বাঙলার উদ্বাস্তুদের মধ্যে কজনইবা নিঃস্ব নয়, গরীব নয়।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় এককালের জমিদার, তালুকদার বা ধনী-সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এধরণের কথা শুনলে কিন্তু মনে মনে হাসি পায় শান্তনুর। চরম অসহায়তায় বৃষ্টিধারার মতো চোখের জলে যাদের নিত্যস্নান তাদের মুখে অতীত সুখের অশোভন অহমিকা যে হাস্যকর তা জানা-অজানা অনেককেই সে বলেছে। কে কবে কি ছিলো সেটা বড়ো কথা নয়, তাদের জীবন আবার কী করে রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে তাই হলো ভাববার কথা। বাস্তবিক পক্ষে শান্তনু ঠিক এভাবেই চিন্তা করে এসেছে এতোদিন ধরে। সে ভুল করেও এপর্যন্ত কোনো দিন কাউকে বলেনি যে, সে জমিদারের ছেলে বা কোথাও তাদের পারিবারিক কীর্তি কাহিনী বর্ণনা করে কোনো রকম বাহবা পাবারও চেষ্টা করেনি কখনো। হাস পাতালেও শান্তনু ছোটবড়ো সকলের কাছেই সমান।

॥ দুই ॥

না বাপু, আর পারা যায় না এভাবে।—মুখখানাকে যতোদূর সম্ভব বিকৃত করে সকরুণ বিরক্তি প্রকাশ করেন অকিঞ্চন ঘোষ।

যা বলেছো ভায়া, বাস্তবিকই খেয়ে-দেয়ে উঠেই থালা-বাটি-গ্লাস মাজা-ঘসার এ নিয়ম রীতিমতো একটা শাস্তি বিশেষ।—দাত্বও ঘোষের কথায় সায় দিয়েই কথা বলেন। তবে তাঁর মতো বুড়োদের যে এধরণের কঠোর নিয়ম থেকে রেহাই দেওয়া উচিত সে পয়েন্টের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে শেষ মন্তব্যটুকু করতে ভুল হয় না দাত্বর।

কেন, তা হবে কেন দাত্ব? আইনের কাছে সবাই সমান, এতো একেবারে আমাদের সংবিধানেরই কথা।

আরে রেখে দাও তোমার সংবিধান। ছেলেছোকরা আর বুড়োমানুষের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না বুঝি? যতো সব ইয়ে!—দাত্ব এক ধমকে থামিয়ে দেন প্রকাশকে। কিন্তু প্রকাশ বেশিক্ষণ চুপ করে থাকবে তেমন পাত্রই নয়। আইনের ছাত্র আইনের প্যাচে বুড়োকে কাবু করে আনন্দ পেতে চায় একটু।

না, তা হয় না দাত্ব। আইনের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো বিশেষ অধিকারের স্থান নেই এদেশে। আইনের চোখে সবাই সমান। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এ একদম সমস্ত

ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারের কথা। এ থেকেই বুঝতে পাচ্ছেন দাছ, আপনি বুড়ো হয়েছেন বলেই আপনার জন্যে কোনো বিশেষ সুবিধে আইন স্বীকার করে না। কাজেই তেমন দাবী করাও মোটেই উচিত নয় আপনার দিক থেকে।

কথাগুলো সব ঠিকই বলেছো ভায়া। তবে কি জানো, আইনের বাইরেও কতোগুলো বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা দরকার এবং সব জায়গাতেই তা করা হয়। তাকেই বলে সামাজিক রীতি। বয়েসের একটা সম্মান আছে না! সেতো আমাদের শাশ্বত ভারতের সনাতন প্রথা।—দাছুর পক্ষ টেনে ছুটো কথা বলেন অকিঞ্চন ঘোষ।

ঠিক ঠিক, একথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। হাসপাতালে আছি বলেই যে আমরা একেবারে সমাজবর্জিত জীব বনে গেছি তাতো আর নয়। সামাজিক রীতিনীতি হাসপাতালেও আমরা মেনে চলবো, তাই স্বাভাবিক। সত্যি সত্যি একেবারে মোক্ষম কথাটিই বলেছে ঘোষ।—বলেই একটিবার ঢোক গিলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন দাছু:

আরে সাধেই কি বলি, বাপ-মা ওর বৈষ্ণব-বিনয়ে যদিও নাম রেখেছেন 'সামান্য ঘোষ,' তবু অসামান্য কথা শুনতে হলে এই একটি মাত্র লোকই আছে সারা হাসপাতালে।

কয়লাখনির মালিকের ছেলে অকিঞ্চন মধ্য বয়েসে রাজরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে এখানকার বাসিন্দে। দরাজ হাতে খরচের জন্যে সবারই তিনি অতিপ্রিয়। ছোটবড়ো সকলের

ঘোষ দা। কেবলমাত্র দাত্নই তাঁকে ঠাট্টা করে ডাকেন 'সাঁকান্ত' বলে, 'অকিঞ্চনে'র সোজাসুজি মানে ধরে।

বাস্তবিকই অত্যন্ত কম কথার মানুষ অকিঞ্চন ঘোষ। কিন্তু ক্বচিৎ কখনো যে দুএকটি কথাই তিনি বলেন তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। তাই তাঁর কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে দাত্ন এতোটা উল্লসিত। কিন্তু তাহলে কি হবে, সাধরণত ঘোষদার কথার ওপর কথা কেউ না বল্লেও দাত্নকে ঘায়েল করতে না পারলে যে আনন্দ নেই। কাজেই চুপ করে থাকা আর সম্ভব হয় না প্রকাশের পক্ষে।

শাশ্বত সনাতন ভারতের ভরসা আর করবেন না দাত্ন! সে ভরসা করতে গেলে পদে পদেই আপনাকে বিড়ম্বনা ভুগতে হবে। আজকের স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন বিধি-বিধানের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে শিখুন, তাহলেই দেখবেন আর কোথাও কোনো অসুবিধে নেই।

কি জানি বাপু, তোমাদের আইন-কানুনের মাথামুণ্ডু আমি বুঝিওনা। বেশতো, তাতে দেশের যদি কিছু ভালো হয়, কোনো মঙ্গল হয় হোক। কিন্তু কোনো দিকেই তো কোনো-রকম ভালো হবার লক্ষ্মণ দেখছি না কিছু। আর কিছু না বুঝি, এটাতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এক যক্ষ্মা রোগেই সারা দেশ উজাড় হবার যোগাড়।—প্রকাশের অতি বিজ্ঞজনোচিত উপদেশের উত্তরে আইনের তর্ক এভাবে এড়িয়ে যান দাত্ন।

শান্তনু আগেই সরে পড়েছে কলতলা থেকে। বাসন মাজা শেষ হয়ে গেলে সে বড়ো বিশেষ দাঁড়ায় না আর

কলতলায়। তবে দাছুকে নিয়ে আর প্রায় সবাই কিন্তু রোজই এবেলা ওবেলা আহারান্তিক একটু জটলা না জমিয়ে পারে না। আর এই জটলার বিষয়বস্তুরও কোনোদিন অভাব ঘটেনা। একটা-না-একটা কিছু জুটে যায়ই। এরপর নিত্য বিকেলে 'দাছুর আসর' তো আছেই।

দীননাথ টি-বি হাসপাতালের অধিকাংশ রোগী এবং রোগিনীরাই অল্প বয়েসী। সমস্ত যক্ষ্মা হাসপাতালেরই একই অবস্থা। বুড়ো-বুড়ির সংখ্যা সর্বত্রই নগণ্য। এখানে দাছু যোগেন মজুমদার তেমনি একজন বুড়ো রোগী এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি বয়স্ক। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস তাঁর। তাই তিনি সকলকার দাছু।

ভারি রসিক লোক এই যোগেন মজুমদার। মোটামুটি ভালোই কি একটা চাকরি করতেন কোন মার্চেণ্ট অফিসে। রিটায়ার করার মুখেই মুখ থেকে হঠাৎ একদিন রক্তক্ষরণে জীবনের সবকিছুই কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেলো তাঁর। তা না হলে হাসপাতালে এই কৃচ্ছ্রসাধন কোনো দিনই করতে হতো না তাঁকে।

রোগী-জীবনের গ্লানি, খরচের দুর্বহ ভার ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যক্ষ্মা হাসপাতালের আবহাওয়াটা সব সময়ই যেন আতংক আশংকায় অসহনীয়। তাই বলে তিনি যে দমে যাবেন তেমন পাত্র মোটেই নন দাছু। নিদারুণ রোগগ্রস্ত হয়েও তিনি তাঁর পুরোনো জীবনের সরসতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

কর্মজীবনে অফিসের কর্মক্লান্ত সহকর্মীদের সময় সময় দাহু ফাঁকি পেটে খিল ধরিয়ে দিতেন হাসির গল্প করে। এক এক দিন দুএক জন প্রবীন ব্যক্তি হয়তো সতর্ক করে দিয়ে বলতেন এতো হাসি ভালো নয় যোগেন। তার উত্তরে তাঁর জবাব ছিলো একেবারে খোলাখুলি পরিষ্কার। তিনি বলতেন, মৃত্যুর চেয়েতো মন্দ আর কিছুই হতে পারে না দাদা, আর ঐ মৃত্যুর হাতে সবাইকেই একদিন ধরা দিতে হবে। কিন্তু হাসতে হাসতেই যদি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে পারি তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে, বলুন।

পুরোনো জীবনের সেই মনোভাবকে আজো যে এই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে অক্ষুন্নভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন দাহু তা সত্যি দুর্লভ। বাস্তবিকই মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মধ্যে কোনো বিষন্নতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা গেছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে হাসি ঠাট্টা নিয়েই তিনি মেতে আছেন সর্বক্ষণ।

টি-বি হাসপাতালের নিরানন্দময় জীবনে এই হাসিটুকু যেদিন শুকিয়ে যাবে সেদিনই মৃত্যু, কথায় কথায় যখন তখনই দাহুর মুখে শুনতে পাওয়া যায় এই কথা। কাউকে কখনো মুখভার দেখতে পেলেই হলো, দাহু অমনি সেখানে এমন এক কথা পেরে বসবেন যাতে ঐ মুখভার করা মুখেও হাসি না ফুটিয়ে কিছুতেই পারবে না ঐ মুখের মালিক। দাহু সব সময়ে সবাইকেই বলেন, আরে ভাই হেসে নাও—ঐ হাসির মধ্যেই যেটুকু জীবনের স্বাদ, আর সব বাজে বোগাস্।

সেদিনও ঐ বাসন মাজা-ঘষার বিরক্তিকর প্রসংগ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা হাসির রোল পড়ে গিয়েছিলো কলতলায় এই দাছুরই কল্যাণে।

দাছুর কথার খেই ধরেই স্থপ্রতুল বলেছিলো—ঠিকই বলেছেন দাছু, আপনাকে কি আর আমাদের দিদি কোনোদিন কষ্ট করতে দিয়েছেন যে, আজ এই বুড়ো বয়েসে এমন সব ঝামেলা সইবে আপনার! দেখুন, যদি বলেন তো সরাসরি গিয়ে একেবারে বলে আসি স্থপারিন্টেণ্ডেন্টকে আপনাকে অন্তত এধরণের নিয়ম-কানুনের বাইরে রাখতে। আর যদি তিনি একান্তই অরাজী হন আমাদের অনুরোধ রাখতে, আমরাই না হয় এক-একদিন এক-একজন আপনার একাজটুকু করে দেবো।

না হে না ভায়া, ও-সবের কোনো দরকার নেই। কোথা দিয়ে আবার কোন ঝামেলায় গিয়ে জড়িয়ে পড়বো কে জানে। ওসব রিস্ক-ফিস্কের মধ্যে আমি নেই বাবা। পাস-না-করা উকীল প্রকাশ বলেছে, আইনের চোখে নাকি ছেলেবুড়ো সব সমান, ও নাকি একেবারে মৌলিক অধিকারের ব্যাপার। কাজেই তোমরা যা পারবে, আমাকেও তাই পারতে হবে। আর তা পারবোও আমি। কব্জিতে এখনো তেমন জোরটুকু আছে, বুঝলে!—থালাটাকে আড়ভাবে কলের নিচে পেতে তাড়াতাড়ি ধুয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে নিজের তাকতের একটু বাহু পরিচয় দেন দাছু।

সে যাইহোক, আর কোনো হাসপাতালেই কিন্তু এই

থালা-বাসন মাজার বদনিয়ম নেই। একটু সেরে উঠতে না উঠতেই থালা মাজো, লকার সাফ করো! যতো সব ইয়ে....
—বলতে বলতে থেমে যায় অনাদি। সুরটা একটু বেশি চড়া হয়ে গিয়েছিলো বলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বাকসংযম করে ফেলে।

থাম, থাম, না জেনেশুনে চেঁচাসনে অনাদি। মাদ্রাজের মদনাপল্লী স্যানেটোরিয়ামেও এই নিয়ম, জানিস কিছু। সেখানেও ফ্রি বেডের পেশেণ্টদের বাসনপত্র সব নিজেদেরই মেজে নিতে হয়। আরো অনেক কাজ করে তারা আমাদেরই মতো। আমার তো মনে হয়, মদনাপল্লীর অনুকরণেই এসব চালু করা হয়েছে আমাদের হাসপাতালে। আর এর জন্যে এতো বিরক্তিরই বা কী কারণ থাকতে পারে আমিতো বুঝি না। দাতুর কথা স্বতন্ত্র, তিনি বুড়ো মানুষ। বাকি আর কারোই এটুকু কাজে তেমন কষ্ট হবার কথা নয়।—আরো যেন ছুচারটে কড়া কথা বলার ইচ্ছে ছিলো সুপ্রতুলের। কিন্তু ছুদিকে ছুহাত ছড়িয়ে দিয়ে বাদ সাধেন তাতে স্বয়ং দাতু।

আরে ভালো, এনিয়ে আবার ঝগড়ার কি আছে। কালে কালে আমাদের এ দেশটাও তো ঐ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের দেশগুলোর মতোই হয়ে যাবে। আর খারাপ দিকগুলো দেখতে গেলে, সে সব দেশের মতো হবার তেমন কীইবা আর বাকি আছে! শুনেছি, ওসব ম্লেচ্ছ দেশে রান্নাবান্না বাসন মাজা ইত্যাদি ঘরকন্নার প্রায় সব কিছু কাজ ব্যাটাছেলেরাই করে থাকে। বাইরে গিয়ে আমাদেরও ঠিক

তেমনি অবস্থায় যে পড়তে হবে না তাইবা কে বলতে পারে? তাই ছাড়া পাবার আগে হাসপাতাল থেকেই এসব কাজে রপ্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। কি বলো তোমরা? বুড়োকালে আমার বুড়িকে আর আমার জন্যে ভুগতে হবে না, নিজেকে নিয়ে আমার এই সান্ত্বনা।

দাদুর একথায় হো হো করে হেসে ওঠে সকলে।

আহা, দিদির ওপর দাদুর কি টান! দিদি আমাদের ভাগ্যবতী।—প্রকাশের এই টিপ্পনিতে সবাই একেবারে হেসে খান্ খান্। হাসতে হাসতেই কলতলা থেকে যে যার ঘরমুখো।

॥ তিন ॥

নানা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার এক-একটি প্রতীক যেন এক-একজন রোগী। তাদের মধ্যে কিছু লোক চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও প্রতিদিন মুক্ত থাকার সুযোগ পায় দাদু যোগেন মজুমদারের সঙ্গলাভে। প্রতিদিনের বৈকালিক 'দাদুর আসর' ক্রমশই তাই ফেঁপে উঠছে। শ্রোতার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

আরে ভাই তোমরা অভাবের কথা বলছিলে। এই অভাব কি শুধু তোমার-আমার? ধরতে গেলে দেশের প্রায় সকলেরই শোচনীয় অবস্থা।—এই বলে দাদু সে দিনের বৈঠকের প্রস্তাবনা শুরু করেন।

শোচনীয় অবস্থা নিয়ে আর কোনো গবেষণার কথা শুনতে চাই না আমরা। পারেন তো কোনো উপায় বাৎলে দিন এ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে।—কয়েকজন একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠে বাধা দেয় দাদুকে।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চাও তোমরা। বেশ ভালো কথা, এই ভাবে দাদু আবার শুরু করেন বলতে—

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে বড়ো বড়ো লোকরা সব বড়ো বড়ো কথা বলেন। আমাদের শান্তনু, সুপ্রতুল, প্রকাশ ভায়া প্রভৃতির মুখে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন ইত্যাদি নানারকম দাওয়াইয়ের কথা হামেসাই শোনা যায়। কিন্তু ওসব কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। যে পথের নিশানা করাই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য সে পথে কবে লক্ষ্যে পৌঁছুবো কিংবা আদৌ পৌঁছোনো যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ। কী দরকার ওসব সুদীর্ঘ সুকঠিন পথ ধরে চলতে যাবার। তার চেয়ে বরং অর্থসংকট সমাধানের যে সহজ পথের কথা আজ আমার মনে পড়ছে সে পথেই তোমাদের ট্রাই করে দেখতে বলবো। আমার তো মনে হয়, একবার জানাজানি হয়ে গেলে দেশশুদ্ধ্ লোকই শেষে তোমাদের ফলো করবে।

সেটা কি পথ দাদু, তাই আগে বলুন, শুনি।—একদল চেঁচিয়ে ওঠে অতি উল্লাসে। অভাব মোচনের সর্টকাটের সন্ধান দিচ্ছেন দাদু, আনন্দে সবার ফেটে পড়ারই তো কথা।

সবুর। সবই বলছি। কিন্তু সব কথা নিবিষ্ট হয়ে শুনতে

হবে তোমাদের। কারণ পথটা সহজ হলেও, ভালো করে সব কথা না শুনে গোড়াতেই যদি সব গুলিয়ে ফেলো তাহলে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তখন আর দাত্নকে দোষ দিলে চলবে না।

না না দাছু, আমরা একেবারে হাতে দূর্বো নিয়ে মুখ বুজে শুনবো আপনার প্রতিটি কথা। টাকা-পয়সার সমস্যা মেটাবার এমন সুযোগ কি হারাতে আছে?—তার স্বভাব-সুলভ ভঙিতে টিপ্পনি কেটে ছোট্ট একটি মন্তব্য করে প্রকাশ মুখুয্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল ওঠে আসর জুড়ে। এমন কি দাছু নিজেও হেসে ফেলেন।

যাই বলো প্রকাশ ভায়া, এ কিন্তু তুর্বো হাতে নিয়েই শোনার ব্যাপার। কারণ এ নিছক একটা ব্রত অনুষ্ঠান। আর ব্রতকথা তুর্বো হাতে নিয়েই তো শোনবার নিয়ম।—দাছুর মুখ থেকে একথা বের হতে না হতেই প্রত্যেকের হাতে হাতে তুর্বোর গোছা। কচি ঘাস বিছানো হাসপাতাল মাঠের একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই নিত্য বসে দাছুর আসর। সেখানে আর যাইহোক দূর্বোর তো অভাব থাকার কথা নয়।

ওমা, ব্রতকথা! কিসের ব্রত দাছু, মঙ্গলচণ্ডী বুঝি?—একটি মধ্যবয়সী মহিলা জিগ্যেস করে একপাশ থেকে। মাস কয়েক হলো মেয়েরাও যোগ দিচ্ছে দাছুর আসরে। তারাও অনেকে দাছুর ভক্ত হয়ে উঠেছে।

না মা, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কথা আমি বলছি না। সকল রকম মঙ্গল করেন মা মঙ্গলচণ্ডী। আমি যে ব্রতের কথা বলছি তা সম্পূর্ণ আলাদা। পয়সাই শুধু যাদের কামনা,

তাদের জন্যেই এই ব্রত পালনের বিধি। আর তার জন্যেই এ ব্রতের নাম শ্রীপয়সা পঞ্চমীর ব্রত।—ব্রতের নাম শুনেই আবার হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

তোমরা হাসছো বটে, কিন্তু শ্রীপয়সা পঞ্চমী ব্রতের যে ঘটনাটি আজ আমি তোমাদের কাছে বলবো তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না তোমরা।

বেশতো দাদু, বলুন!

বলছি, বেশ চুপটি করে শোন তবে।—এই বলে দাদু শুরু করলেন নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি সুদীর্ঘ কাহিনী বলতে:

এটি আসলে গল্প নয়, প্রায়-গল্পও নয়,—একেবারে খাঁটি একটি সত্যি কাহিনী। ঘটনাটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছিলো।

প্রায় বছর ছাব্বিশ আগের কথা। আমি তখন টালার দিকে থাকতাম। ওদিকটা তখন এমন শহর হয়ে ওঠেনি। এখানে-ওখানে টিনের বাড়ি ছিলো অনেকগুলো। আমিও তেমনি একটি বাড়িতেই থাকতাম। চুঁচড়ো থেকে দু বছরের একটা ঠিকে চাকরি পেয়ে সবে এসেছি কোলকাতায়। পুরো-পুরি পাকা বাড়িতে ঘর ভাড়া নেবো, তেমন কথা কল্পনা করাও তখন আমার পক্ষে কঠিন। তবে যেখানে এসে প্রথম উঠেছিলাম তা নামে টিনের বাড়ি হলেও ইঁটের দেওয়াল, সিমেণ্টের মেঝে। টিনের চালের নিচেও দর্মার সিলিং। একটি এজমালি উঠোনকে চারদিক হতে বেষ্টন করে দশবারোটি

ঘর। ভেতরের দিকে সবগুলো ঘরের সামনে দিয়েই আবার একফালি করে টানা বারান্দা। উঠোনটাও ইট দিয়ে বাঁধানো। বেশ ঝকঝকে তকতকে। একখানা কি দুখানা ঘর নিয়ে অনেকগুলো নিম্নবিত্ত পরিবারই বাস করতেন এখানে। বলা বাহুল্য আমিও তাঁদেরই একজন।

পূবদিকের একটিমাত্র ঘর নিয়ে আমি থাকতাম। আমার ঘরের ঠিক সামনের দুখানা ঘর নিয়ে থাকতো অঘোর চক্রবর্তী। সেই অঘোরই এই কাহিনীর নায়ক।

এখানে যতোগুলো পরিবার বাস করতেন তাঁদের মধ্যে অঘোরের অবস্থাই ছিলো সবচেয়ে ভালো। সে যা করতো তাকে খুব সম্ভব ঠিকেদারি বলে। কারো বাড়ির নর্দমা ভেঙে গেলে, কারো ছাদ দিয়ে জল পড়তে থাকলে কিম্বা কারো কারো ঘরের মেঝের বা উঠোনের সিমেন্ট উঠে গেলে অঘোরই তা সারিয়ে দেওয়ার ঠিকে নিতো। তারপর একটি রাজমিস্ত্রী ও একটি মজুর নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তা সারিয়ে দিয়ে আসতো। একাজে রুজি-রোজগার তার যাই হোক না কেন, নামটা ছিলো তার ও অঞ্চলে সকলের মুখে মুখে।

এ জন্যে অবশ্য অঘোরকে খাটতেও হতো খুব। সকালে উঠে প্রথমেই বেকার রাজ ও মজুর খুঁজে বেড়াতে হতো তাকে। কারণ তার যেমন কাজের কোনোই স্থিরতা ছিলো না, তেমনি কোনো নির্দিষ্ট রাজ বা মজুর রাখাও তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই যখন যেমন কাজ পেতো সেইরকম

রাজ বা মজুর খুঁজে-পেতে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসে কাজ চালাতে হতো তাকে। অবশ্য অনেকদিন এ-লাইনে কাজ করার ফলে বহু রাজ-মজুরের সঙ্গেই তারও পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং লোকের অভাবে তাকে কখনো অসুবিধায় পড়তে হতো না। তবে ঠিক ঠিক লোকজন খুঁজে-পেতে নিতে মেহনৎ করতে হতো বৈকি? সেই ভোর-বেলা বেরিয়ে গিয়ে ফিরতে ফিরতে তার প্রায়ই হয়ে যেতো বেলা একটা-ছুটো। তারপর কোনোরকমে চারটি কিছু নাকে-মুখে গুঁজে দিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়তো আর ফিরতো সেই রাত্রি আটটা-নটা বাজার পর। কোনো কোনো দিন অবশ্য তাকে সন্ধ্যার সময়ও ফিরতে দেখা যেতো। সেদিন তাদের দাম্পত্যালাপ বিচিত্রভাবে জমে উঠতো। তবে তার জীবনে তেমন সুযোগ দেখা দিতো খুবই ক্বচিৎ কখনো।

অঘোর, তার স্ত্রী প্রভা ও একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে—এই নিয়ে তাদের সংসার। অঘোরের বয়েস বছর তিরিশেক হবে। বয়েস অবশ্য তার তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। চেহারা শুধু শ্রীহীনই নয়, বেচারা যেমন রোগা তেমনি লম্বা। তবে ঠিক সে এমনটি হলে কি হবে, তার স্ত্রী প্রভা কিন্তু বেশ গোলগাল ট্যাবা-টুবো। বছর বাইশেক বয়েস হবে তার। ছু-তিন বছর শহরবাস সত্ত্বেও চোখে-মুখে তার গ্রামের সারল্য মাখানো রূপশ্রী।

অঘোরের স্ত্রী একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসতো।

ছুটি-ছাটার দিনে মাঝে-মাঝে অঘোর যখন সস্ত্রীক সিনেমায় যেতো সে সময় তার স্ত্রীকে জবজবে করে মাথায় সুগন্ধ তেল ঢেলে, একমুখ পাউডার মেখে, পায়ে আলতা লাগিয়ে, একটি সিল্কের নীল রুমাল কোমরে গুঁজে একেবারে ফিটফাট হয়ে স্বামীকে অনুসরণ করতে দেখা যেতো। এ বিষয়ে অঘোরের উদারতাটাও ছিলো লক্ষ্যণীয়। স্ত্রীর এইসব সৌখিন বিলাসের উপকরণগুলো সে বেশ খুশী মনেই যোগাতো। তবে একবার পাশের তিনতলা বাড়ির মেয়ের দেখাদেখি তার বৌ চেয়েছিলো একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। সেদিন অঘোরকে ঘোরতর আপত্তি করতে দেখা গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, আপত্তিতে বাগ মানাতে না পেরে দাঁত কিড়মিড় করে সে তার স্ত্রীর গালে কষে বসিয়ে দিয়েছিলো এক চড়।

অঘোর অবশ্য খুবই রাগী ও বদমেজাজী বলে পরিচিত ছিলো। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও প্রায়ই তাকে তার স্ত্রীর ওপর হম্বিতম্বি করতে শোনা যেতো। কিন্তু এইসব তর্জন-গর্জন তাদের দাম্পত্য-জীবনে কোনো ফাটল সৃষ্টি করতে পারতো বলে মনে হয় না।

প্রভা ছিলো অত্যন্ত সরল ও ভালোমানুষ। তাই সব সময়েই রাগারাগি একতরফা তড়পানিতেই শেষ হতো। তা ছাড়া অঘোরের রাগ যেমন তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড হয়ে উঠতো তেমনি দ্রুতই তা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। সকালে হয়তো তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও তীক্ষ্ণ, আবার রাত্রেই হয়তো তা উচ্চ দাম্পত্যালাপে মধুর ও শীতল। সোচ্চার সেসব মিষ্টি

আলাপের একআধটুকু যে আমার কানেও না আসতো তা নয়।

রান্নায় ঝাল বোধ হয় অঘোর একেবারেই সইতে পারতো না। কারণ এ নিয়ে তাকে প্রায়ই গণ্ডগোল করতে দেখা যেতো। একটু ঝাল লাগলেই সে রাগে থালা ঠেলে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠতো। 'এতো ঝাল মানুষে খেতে পারে!'—বলেই সে তিড়িং করে দাঁড়িয়ে উঠে লাফাতে থাকতো। লাফানো কথাটা এখানে আক্ষরিকভাবে সত্যি। অত্যন্ত রেগে গেলে অঘোর এক অদ্ভুত রকমের লাফ শুরু করতো। অনেকটা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দড়ি-লাফায়, দড়ি ছাড়াই অঘোর ঠিক সেইরকম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকতো।

সেসময় প্রভা নানা কৌশলে স্বামীকে ঠাণ্ডা করতো। —'আমার মাথা খাও, যেও না। এই যে তোমার জন্যে দুধ রেখেছি। দুধ দিয়ে খাও।'—বলে ক্ষিপ্রহাতে হয়তো দুধ এনে দিতো। অনেক সময় কাকুতি-মিনতি করে হাত ধরে স্বামীকে আবার পাতের কাছে বসিয়ে দিতো। সে সময় দু একটা চড়-চাপড়ও যে পতিপ্রাণা প্রভার অদৃষ্টে জুটে যেতো না তা নয়। তবে হাতে পায়ে ধরে পাতে ফের একবার বসিয়ে দিতে পারলে অচিরেই অঘোরের রাগটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতো। এমনি কোনো রাগারাগির দিনের সন্ধ্যায়ই হয়তো অঘোর একটা টিয়েপাখি রঙের তাঁতের শাড়ি নিয়ে ঘরে ফিরতো। তারপর সেই শাড়ি পরে তার স্ত্রী যখন প্রথামত তাকে

প্রণাম করতে আসতো, তখন তার স্বভাব-সুলভ রসিকতায় সে যেন ফেটে পড়তো—'আরে, দেখি দেখি, এযে একেবারে পরস্ত্রী বলে মনে হচ্ছে!'—বলেই হে-হে করে হাসতে থাকতো। তার এক মেয়ের-মা বাইশ বছর বয়েসের বৌ তখন হয়তো একটু সলজ্জ হেসে বলতো, 'যাও, তোমার যেমন কথা।'

অঘোরের পাল্টা উত্তরে প্রভাকে তখন নিশ্চয়ই 'অসভ্য কোথাকার' বলে পাশের ঘরে পালিয়ে যেতে হতো?—প্রশ্ন করে সুপ্রতুল।

ঠিক তাই। আমার ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই দাম্পত্যলীলা আমি প্রায়ই চেয়ে চেয়ে দেখতাম। এই গার্হস্থ্য-নাট্যে অবশ্য হাস্যরসেরই প্রাধান্য ঘটতো বেশি। তবে একবার হাস্যরস, বীররস ও করুণরসের একেবারে ত্রিবেণী সংগম হয়েছিলো। এবার সেই ঘটনাই বলি।

বাঃ, বা-দাতু! এ যেন ঠিক একেবারে রসবড়া। একটানা বলে যান দাতু। থামলেই রসভঙ্গ।—এতোক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে প্রকাশ মুখুজ্যে। দাতু আবার বলতে শুরু করেন।

হ্যাঁ, সেদিন বোধহয় শনিবার। দুপুরে অঘোর যথারীতি খেয়ে উঠেছে। সেদিন সব কাজই একটু সকাল-সকাল সারা হয়েছে। বেলা তখন গোটা বারো হবে। অঘোরের বেরোবার উদ্যোগ চলছে। খেয়ে উঠেই স্ত্রী প্রভা হঠাৎ একমুখ হেসে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, 'ওগো, আজ গোটা তিনেকের সময় একবার এসো। আমার ব্রত আছে।'

ভ্রূ কুঁচকে অঘোর বললে, 'তোমার ব্রত তা আমাকে মানতে হবে কেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দরকার আছে। এসো কিন্তু, আমার মাথার দিব্যি।'—আবদারের সুরে বললে প্রভা।

'আচ্ছা দেখা যাবে।' বলে অঘোর বেরিয়ে গেলো।

প্রভার মনে গুরুতর চিন্তা, যদি অঘোর তার অনুরোধ না রাখে তাহলে তার এতো সাধের ব্রতটাই পণ্ড হয়ে যাবে। ঠাকুর-দেবতা, পূজো-আর্চা সবতাতেই তো ব্যাটাছেলেদের অবিশ্বাস। তাই আরো বেশি দুশ্চিন্তা।

তিনটে নয়, গোটা চারেকের সময় সত্যিই সেদিন বাড়িতে ফিরে আসে অঘোর। সারা দুপুর রোদ্দুরের তাতে দাঁড়িয়ে থেকে তখন সে শ্রান্ত। প্রভা তাড়াতাড়ি এসে তাকে পাখার বাতাস করতে থাকে। তারপর অঘোরের হাতমুখ ধোয়ার পর তাকে জল খাবার দেওয়ার জন্যে বারান্দায় একটি পশমের আসন পেতে দিয়ে আসে প্রভা।

স্ত্রীর সেবা পাওয়া অঘোরের কাছে কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু পশমের আসন পেতে জলখাবার খেতে দেওয়ার মধ্যে যে কিছুটা নতুনত্ব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীর দিকে তাই সে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলে।

স্ত্রীর হাবভাবে কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলো না। একটি নতুন লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে সে। খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। ব্রতের উপবাস সত্ত্বেও প্রভার মুখখানি বেশ স্নিগ্ধ ও টলটলে।

বারান্দার নানা স্থানে আলপনা আঁকা। তার মধ্যে একটি ছোটো কাঠের বাক্সের ওপর কিছু ফুল ছড়ানো। খেতে বসে অঘোর এই সব চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে আর মনে মনে হাসে।

প্রভা তাকে কয়েক রকমের কাটা ফল খেতে দিলে। কিছু চালমাখা এবং ডালমাখাও দিলে। তারপর যা দিলে সেইটেই মারাত্মক। একটি ছানার ডেলার মধ্যে একটি রূপোর আধুলি পুরে তাকে খেতে দেওয়া হলো। স্বামীকে না-জানিয়ে একটি রজত মুদ্রা খাইয়ে দেওয়াই নাকি এই ব্রতের নিয়ম। অন্তত এই রকমই শুনেছে প্রভা। তাই সে কিছু না-বলে ছানার ডেলাটা অঘোরের হাতে দিয়ে শুধু বললে,' 'নাও, এটা একবারে গিলে খেয়ে ফ্যালো। চিবিও না কিন্তু। খবরদার!'

ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অঘোর অন্যমনস্কভাবেই ছানার ডেলাটা গিলে ফেললে। আর গেলামাত্রই তা তার গলায় বেধে গেলো।....কিন্তু ছানা কি এতো শক্ত হতে পারে? গুলির মতো মনে হচ্ছে যেন!

সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে চোখ কপালে উঠলো অঘোরের। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো তার কাছে। পৃথিবী বনবন করে যেন সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগলো। কী এখন করবে সে? ডাক্তার ডাকবে? কিন্তু কথা বলারই যে ক্ষমতা নেই তার। কেমন একটা অসহায় অবস্থা। প্রভাও হতভম্ব।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলো অঘোর এবং ভাগ্যক্রমে

সফলও হলো। প্রাণপণে খক করে একটা জোর কাশি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছানার ডেলাটা বার করে ফেললে সে। তারপর থু-করে ফেলে দিলে তা। কিন্তু মেঝেতে শুধু ছানাই নয়, তার সঙ্গে ঠং করে আরও কী একটা যেন পড়লো!

অঘোর প্রথমে ভাবলে তার এক পাটি দাঁত বোধহয় খুলে পড়লো। কিন্তু তাতো নয়। এযে একটা নতুন চকচকে আধুলি! ভীত, সন্ত্রস্ত অঘোর একেবারে অবাক।

অ্যাঁ, ফেলে দিলে!—হায় হায় করে উঠলো প্রভা। 'আমার যে শ্রীপয়সা পঞ্চমীর ব্রত। যাঃ, সবই মাটি হয়ে গেলো।'—প্রভা একেবারে যেন শোকাচ্ছন্ন!

কিন্তু আধুলি এলো কোত্থেকে?—কোনোক্রমে জিগ্যেস করলো অঘোর। ভয় ও বিস্ময়ের ঘোর তখনো ভালোভাবে কাটেনি তার।

আমিই দিয়েছিলাম ছানার মধ্যে। শ্রীপয়সা পঞ্চমীর ব্রতে লুকিয়ে তাই দিতে হয়। গত বছর সতীর বাবা যে লটারিতে অতো টাকা পেলে তা কিসের জোরে? সতীর মা পয়সা পঞ্চমীর ব্রত করেছিলো বলেই তো! একটা সিকি ছানার মধ্যে দিয়ে সতীর বাবাকে খেতে দিয়েছিলো। সতীর বাবা কোঁৎ করে তা গিলে ফেললে। কি জিনিস জানতেই পারেনি কিছু। জানলে আর লটারিতে টাকা পেতে হতো না। অনেক আশা করে আমি সিকির বদলে আধুলি দিয়েছিলাম গা! আর তুমি তা গিলতে পারলে না। সবই আমার অদেষ্ট, সবই কপাল।—অঘোরের স্ত্রী রীতিমতো কাতর হয়ে ওঠে।

তা হবারই কথা। কি বলো তোমরা ?—গল্প বলা শেষ করে শ্রোতাদের মতামত জিগ্যেস করেন মজুমদার মশাই। সতীর মা পয়সা পঞ্চমীর ব্রত করে লটারির টাকায় বড়োলোকের গিন্নী বনে গেলো আর প্রভার বেলায় ব্রত পালনই সম্ভব হলো না। এ কপাল ছাড়া আর কি ?

দাছুর যতো কথা !—এই বলে একগাল পানমুখে থাকতেও ডিবে থেকে আর একটা পান মুখে পুরে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্রজরানী। ব্রজরানীর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরো কজন মেয়েও। তাদের সকলেরই একরকম ধারণা, মেয়েদের ডাউন করার জন্যেই দাছুর আজকের এই গল্প এবং তারই প্রতিবাদে একযোগে তাদের এই সভা ত্যাগের উদ্যোগ।

প্রকাশ কিন্তু দাছুর গল্পের তারিফ না করে পারে না। সে চট করে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললে, অঘোরের ছদ্মনামে দাছু তাঁর আত্মজীবনীরই একটি অধ্যায় ভারি সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করলেন। দিদি আমাদের বড়োলোকের গিন্নী হবার জন্যে এতো চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন, তা সত্যি সত্যি দুঃখের কথা।

আরে থামো, থামো পাকা ছেলে কোথাকার।—দাছু জোর করে প্রকাশকে থামিয়ে দিলেও সভায় প্রকাশের কথায় তখন হাসির ঝড়। আসর থেকে তখন প্রায় সকলেই যে যার ঘরমুখো এক একটি দুশ্চিন্তামুক্ত পাতলা মন নিয়ে।

রোজই এমনি হয়। দাছুর ষ্টকে যে এমনি কতো মজার মজার গল্প জমা হয়ে আছে তা ভেবেই সকলের বিস্ময়।

॥ চার ॥

আরো কয়েকদিন পরের কথা।

সকালবেলা কনফারেন্স রুমের সামনে ভিড় জমে রোগীদের। প্রতি সপ্তাহেই কনফারেন্স ডে-তে এমনি হয়ে থাকে। সব ডাক্তারেরা মিলে পরীক্ষা করেন তালিকা-নির্দিষ্ট সব রোগীদের এবং আলোচনা করে স্থির করেন, কাকে রাখা হবে আর কাকে ছাড়া হবে।

প্রতি সপ্তাহেই কিছু কিছু করে রোগীকে তো ছাড়তেই হবে। তা না হলে নতুন রোগীদের স্থান হবে কি করে? বেড-প্রার্থীদের তালিকা বেড়েই চলে ক্রমাগত। কাজেই নতুনের জন্যে পুরোনোদের পথ না ছেড়ে দিয়ে উপায় নেই।

অবশ্য রোগীদের ছাড়া ও রাখার ব্যাপারে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুপারের কথাই চূড়ান্ত, বাকি ডাক্তারেরা তাঁর কথায় সায় দেন মাত্র। তা হলেও নিয়মমাফিক একটা করে বৈঠক বসে প্রতি সপ্তাহেই। আজও তেমনি বৈঠকই বসেছে।

ডাক্তারদের কনফারেন্স বসেছে কনফারেন্স রুমের ভেতরে। আর বাইরে রোগীদের অনেকেরই বুক ঢিপ ঢিপ দুশ্চিন্তায়। ভয়, এবারই যদি পরীক্ষার পর ছুটির অর্ডার হয়ে যায়। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে কোথায় গিয়ে উঠবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা সবাই যখন এড়িয়ে চলতে চাইবে

তখন কী ভাবে মানিয়ে চলতে হবে, সে সব ভাবনাতেই ভেঙে পড়ে প্রায় প্রত্যেকে।

জন দশবারো রোগীর পরই হঠাৎ শান্তনুর ডাক পড়ে কনফারেন্স রুমে।

কি হে, তোমায় তো বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। বেশ সুস্থই আছো, কী বলো?—ঘরে ঢুকতেই সুপারের সাদর আপ্যায়নে বুকটা কেঁপে ওঠে শান্তনুর। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অতো দূরে কেন, আর একটু এগিয়ে এসো।—কাছে ডেকে নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন শান্তনুর চোখ মুখের দিকে। তারপর তিনিই প্রথম পরীক্ষা করে দেখলেন তার বুক-পিঠ। আরো দু একজন ডাক্তারও ষ্টেথিসকোপ লাগিয়ে শান্তনুর অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করলেন। ভিউ-বক্স-এ লাগানো হলো তার সত্ত তোলা এক্স-রে ফটোটা।

যা বলেছি, বেশ ভালোই তো মনে হচ্ছে এ রোগীকে। আপনি কি বলেন ডাঃ গুপ্ত?—চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভেবে এক্স-রে ফটোটার দিকে একবার আড়ভাবে দেখে নিয়ে ডাঃ গুপ্তকে প্রশ্ন করলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

কিন্তু এ জায়গাটা? এখানটায় কেমন লাগছে যেন। দেখুনতো স্যার, একটা ক্যাভিটি বলে মনে হচ্ছে না?—গুপ্ত সন্দেহ প্রকাশ করেন এক্স-রে প্লেটের একটা জায়গা পেন্সিল দিয়ে নির্দেশ করে।

ডাঃ সোমও প্লেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে

লক্ষ্য করেন ডাঃ গুপ্তের নির্দেশিত স্থানটি। তাঁরও চোখেমুখে যেন কেমন একটা সন্দেহের ছাপ ফুটে ওঠে। কিন্তু মুখ খুলে নিজের মতামত দেন তিনি কদাচিৎ। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পুরোপুরি বশংবদই বলা যায় তাঁকে। তাই মুখার্জির মত না জানা অবধি তিনি একদম চুপচাপ।

ও নো নো ছাটস্ নাথিং। ওটা মোটেই ক্যাভিটি নয়। হি ইজ অলমোষ্ট এ্যাবসোলিউটলি ও-কে।—এই ভাবে ডাঃ গুপ্তের সন্দেহকে একরকম হেসেই উড়িয়ে দেন মুখার্জি সাহেব। তারপর উপস্থিত সমস্ত ডাক্তারদের লক্ষ্য করে বলতে আরম্ভ করেন—আমি যখন ইটালিতে ছিলাম তখন ঠিক এরকমই একটা কেস এসেছিলো আমার হাতে। সেখানেও অনেক ডাক্তার ক্যাভিটি বলেই মনে করেছিলেন সেটাকে। কিন্তু তাঁদের সে মতকে কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। যুক্তিতর্কে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কনভিন্স করতে না পারায় প্রথম প্রথম আমার কথাকে তাঁরা আমলই দিচ্ছিলেন না। কিন্তু দুদিন বাদেই আমি যখন প্রমাণ করে দিলাম যে, ওই রিং স্যাডোর কারণ অন্য কিছু তখন সে কী কাণ্ড! চারদিক থেকে কেবল কনগ্রাচুলেশন আর কনগ্রাচুলেশন! চিকিৎসক মহলে একেবারে মহাধুম।

এমনি ভাষায় আত্মপ্রশংসা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথার ওপর আর কথা বলার সাহস থাকতে পারে কারো?

ডাঃ সোম বরং ডিটোই দেন সুপারের কথায়। তিনি

সোজা-সুজিই বলেন, হ্যাঁ স্যার, ওটা ঠিক ক্যাভিটি নয়। ওই রিং স্যাডোর সঙ্গে ক্যাভিটির কোনো সম্পর্কই নেই।

আর কোনো ডাক্তারই অবশ্য এ সম্বন্ধে আর কোনো মতামত প্রকাশ করেন না। মুখার্জি সাহেব যে শুধু বয়েসেই প্রবীণ এবং হাসপাতালে উচ্চতম পদমর্যাদার অধিকারী তা-ই নয়, তাঁর বৈদেশিক অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর কথাই যে শেষ কথা হবে তা স্বাভাবিক। তবে সেজন্যে ভিন্ন মত পোষণ বা প্রকাশের অধিকার যে অন্য ডাক্তারদের থাকবে না তেমন কোনো কথা নেই। আর বাইরে যতোই কড়া হোন না কেন, মুখার্জি সাহেব নিজেও তা চান না। তিনি বরং উল্টোটাই আশা করেন তাঁর সহকারীদের কাছ থেকে। এমন কি অতি আনুগত্যের জন্যে সময় সময় ডাঃ সোমকে নিয়ে এক-আধটুকু রসিকতা করতেও শোনা যায় তাঁকে।

মোটের ওপর ক্যাপ্টেন মুখার্জি সব দিক থেকেই সজ্জন। এবং তাঁরই জন্যে যেমনি তাঁর সহকারী ও কর্মচারীবৃন্দ ঠিক তেমনি সমস্ত রোগীই তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সহৃদয়তার স্পর্শে দীননাথ হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীই মুগ্ধ। হাসপাতালে নানা সংগঠনমূলক কাজের প্রধান উদ্যোক্তা বলে শান্তনুর সঙ্গে মুখার্জি সাহেবের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শান্তনুর স্বাস্থ্যোন্নতিতে তাই তিনি এতো খুশি। খুশির আতিশয্যেই তিনি বলে ফেলেন:

আর কোনো ভয় নেই তোমার শান্তনু। সুদিন তোমার আসন্ন।

তাই কি স্যার!—শান্তনু উত্তরের মধ্য দিয়েই প্রশ্ন তোলে। আশেপাশে সবাই নীরব। এমন কি মুখার্জি সাহেবও। আর ঠিক সেই সময়েই রোগীকে একটিবার শুধু জিজ্ঞেস করেন ডাঃ উপাধ্যায় :

আপনার ডেট অব এ্যাডমিশন ?

শান্তনু বছর দুই আগের একটা তারিখ বলে দেয় ভয়ে ভয়ে। মুখ তার বিবর্ণ এবং চোখ দুটো তার কোটরাগত হয়ে গেছে ততোক্ষণে।

বাপ্‌স, দু বছর হয়ে গেছে !—এ্যাডমিশন ডেটের কথা শুনে সকলকে শুনিয়েই স্বগতোক্তি করেন ডাঃ গুপ্ত। সুপারকে একটু খুশি করতে চান এই মন্তব্যে। কে জানে আবার ক্যাভিটির প্রশ্ন তোলায় মনে মনে বিরূপ হয়ে আছেন কিনা কর্তা!

ইউ ইয়ংম্যান, হোয়াট মেকস ইউ ওয়ারি সো মাচ ? ইউ শুড ফিল হ্যাপি।—শান্তনুকে ভয়ক্লিষ্ট ও বিমর্ষ দেখতে পেয়ে মুখার্জি সাহেব নিজেও অস্বস্তিবোধ করেন একটু। তাই তাকে চাঙা করে তোলার জন্যে একেবারে ইংরেজী ভাষারই আশ্রয় নিতে হয় সাহেবকে।

শান্তনুকে চিয়ার আপ করেই তার চার্টখানি টেনে নিয়ে খস খস করে লিখে দেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট :

টু ফার্লংস ওয়াকিং এভ্রি ডে। রি-এগজামিনেশন আফটার এ ফর্টনাইট।

তাঁর মন্তব্যসহ চার্টখানা ডাঃ গুপ্তের হাতে নিজেই তুলে দেন মুখার্জি সাহেব।

আমার তো মনে হচ্ছে, পনেরো দিন পর আমরা আবার যখন শান্তনুকে পরীক্ষা করবো তখন তাকে ধরাই যাবে না কোনো রোগী বলে।

হ্যাঁ স্যার, এ কেসটাতে আমরা খুব র‍্যাপিড প্রগ্রেসই লক্ষ্য করছি গত দুমাস ধরে।—ডাঃ উপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সায় দেন সুপারের কথায়।

একটা বিষয় আমি সব সময়ই কি ভাবি জানেন, সে হলো যক্ষ্মারোগীদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের পাব্লিকের সাইকলজিক্যাল এ্যাটিটিউডের কথা। এ মনোভাবের যতোদিন না আমূল পরিবর্তন হচ্ছে ততোদিন হাসপাতালে রোগীদের স্থান সংকুলানের সমস্যার কোনো সমাধানই সম্ভব হতে পারে না।

কথাটা ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু এতোকাল ধরে যে ধারণা নিয়ে যক্ষ্মা ও যক্ষ্মারোগীকে দেখে আসছে আমাদের দেশের মানুষ সে ধারণা চট করে তাদের মন থেকে দূর হয়ে যাবে সেরূপ আশা করাও বোধ হয় ঠিক নয়।—সবিনয়েই সুপারের কথার উত্তর দেন ডাঃ গুপ্ত।

কিন্তু আমি শেষবার যখন লণ্ডনে ছিলাম সেখানে কি দেখেছি জানেন? সাধারণ·যক্ষ্মারোগীরা বাড়িতেই থাকে। তাদের ছোটোখাটো ডে-টু-ডে ওয়ার্ক তারা ঠিক মতোই করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বসেই তাদের চিকিৎসা হয়।

যক্ষ্মা সম্বন্ধে অকারণ ভীতিও নেই সে দেশের লোকের আর হাসপাতালে এমনিভাবে ভিড় জমিয়ে অযথা সময়েরও অপচয় করে না তারা।

কিন্তু ওসব দেশের সঙ্গে কি আমাদের দেশের অবস্থার কোনো রকমেই তুলনা করা চলে স্যার? আমাদের দেশে ক'টা পরিবারেরই বা একাধিক ঘরের বাড়ি; আর যক্ষ্মারোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাতে পারে তেমন আর্থিক স্বাচ্ছল্যই বা ক'জনের আছে?—জবাব দেয় শান্তনু।

ডাক্তারদের কথার মধ্যে এমনি করে গায়ে পড়ে উত্তর দেওয়াটা হয়তো উচিত হয় নি শান্তনুর। তাহলেও ডাক্তাররা কিন্তু সবাই খুশি। কারণ সুপারের মুখের ওপর এমনি ভাষায় চট করে জবাব দেওয়া তাঁদের কারো পক্ষেই তো সহজ ছিলো না। তা ছাড়া কথায় কথায় তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতার প্রসংগ তোলাটা মুখার্জি সাহেবের অনেকটা যেন ম্যানিয়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ ধরণের কথা উঠলে তাঁর সহকারীরা চুপ করেই থাকেন সাধারণত। তবে মুখার্জি সাহেব যতো ভালো লোকই হোন, অন্তত এ ব্যাপারে এ ধরণের একটা জবাব পাওয়া যে তাঁর প্রয়োজন ছিলো, তা মনে মনে বিশেষভাবেই অনুভব করেন তাঁর ডাক্তার সহকর্মীরা। তাহলেও এ আলোচনাকে যে আর এগোতে দেওয়া চলে না, এও তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন।

তাহলে পেশেণ্টকে স্যার জানিয়ে দেওয়া যাক অর্ডারটা।

হ্যাঁ, বলে দিন। নেক্স্ট পেশেণ্টকে ডাকুন তাড়াতাড়ি।

—ডাঃ গুপ্তকে একথা বলেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান মুখার্জি সাহেব। রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে তিনি অবাক। তারপর ঘড়িটাকে কানের কাছে তুলে পরীক্ষা করে দেখেন ঘড়ি বন্ধ!

যাঃ, ঘড়িটায় চাবি দিতেই ভুল হয়ে গেছে আজ!—এই বলে নিজের হাতঘড়িটাকে মিলিয়ে নেন মুখার্জি সাহেব কনফারেন্স রুমের দেয়াল ঘড়ির সঙ্গে। বাস্তবিকই, যে ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে সুপারের তাতে এ ধরণের ছোটো-খাটো ভুলভ্রান্তি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে।

এদিকে তু ফার্লঙ করে প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণ এবং আর এক পক্ষকাল পরে আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ ঘোষণা করে দিয়েছেন ডাঃ গুপ্ত।

সুপারের এ অর্ডারে ততোটা সন্তুষ্ট হতে পারে না শান্তনু। ডিসচার্জ নোটিশ আপাতত চাপা থাকলেও তাকে যে আর বেশি দিন রাখা হবে না হাসপাতালে তা বেশ বুঝতে পারছে সে। পরের প্লেটেই অর্থাৎ পরের বারের পরীক্ষার পরই তার ছুটির অর্ডার হয়ে যাবে হয়তো।

মুখ শুকিয়ে একেবারে চুপসে যায় শান্তনু ছুটির কথা ভাবতে। কিন্তু কী আর করবে? কিছুই করার নেই তার। দিদিকে দিয়ে সুপারকে একবার যে বলানো যায় না তা নয়, তবে ভালো হয়ে যাবার পরেও হাসপাতালে থাকবো, এমন আব্দার তো করা উচিত নয়। তাই ডাক্তারদের নমস্কার জানিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বিদায় নিয়ে আসে শান্তনু।

তখনো আরো অনেকের পরীক্ষা বাকি।

॥ পাঁচ ॥

ওয়ার্ডে আসা মাত্রই সবাই মিলে একেবারে ছেঁকে ধরে শান্তনুকে।

কী হলো, কী ট্রিটমেণ্ট ঠিক হলো তোমার? ত্রিশ গ্র্যাম ষ্ট্রেপটোমাইসিন আর পাঁচ গ্র্যাম আই-এন-এ-এইচ এইতো!—পঞ্চানন ছুটতে ছুটতে এসে গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে বন্ধুকে। সবার আগেই আসে সে। তারপর এদিক ওদিক থেকে আরো অনেকে। তার কারণও অবশ্য আছে। কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই শান্তনু প্রথমেই পঞ্চাননের নজরে পড়েছিলো। পঞ্চানন যে তৈরি হয়েই ছিলো তেমনি ভাবে। তার দরকার। অত্যন্ত বেশি দরকার।

পঞ্চাননের এখন আর দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই এই দীননাথ হাসপাতালে। সম্প্রতি একটা ঘটনার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে বড়ো তেমন কথাও বলে না। কথা না বলার কারণ হয়তো এক-একজনের বেলায় এক-এক রকম। কেউ কথা বলে না ঘৃণায়, কেউ বা সংকোচে, আবার অনেকে হয়তো ভাবে পঞ্চাননের সঙ্গে ভাব রাখতে গেলে সবাই বিশ্রী রকমের ধারণা করে বসবে। এমনি সব নানা কারণেই আজকাল আর একরকম কারো কাছেই তেমন পাত্তা মেলে না পঞ্চাননের। তাই তার মনোদুঃখের সীমা নেই।

যে ঘটনা নিয়ে পঞ্চাননের এ অবস্থা তা এমন কোনো

অস্বাভাবিক বা অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। যক্ষ্মা হাসপাতালের নৈরাশ্যময় পরিবেশে এরূপ ঘটনা হামেশাই ঘটতে পারে। এবং মাঝে মাঝে ঘটেও থাকে।

মন-দেয়া-নেয়ার কারবার শুরু করেছিলো পঞ্চানন এই হাসপাতালেরই একটি রোগিনীর সঙ্গে। ব্যাপারটা বেশ নির্বিবাদেই চলে আসছিলো মাস পাঁচ ছয় ধরে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ফাঁস হয়ে গিয়েই যতো মুস্কিল।

রোগিনীর নাম ফুল্লরা। অষ্টাদশী তরুণী। তায় আবার সদ্য বিধবা। বছর দুই স্বামীর ঘর করে সে-জীবনের অনুপম স্বাদকে ভুলে থাকতে চাইলেও কিছুতেই তা ভুলতে পারে না সে।

বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিলো ফুল্লরার। কিন্তু অদৃষ্টে তা সইলে তো! হঠাৎ যক্ষ্মারোগ ধরা পড়লো স্বামীর। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ থাকলেও বিবাহ-পূর্ব জীবনের চরম উচ্ছৃঙ্খলতার এই ফল। অনেক চেষ্টা এবং অনেক অর্থব্যয় করা হলো তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। মাস ছয়-সাতের মধ্যেই তাকে বিদায় নিতে হলো এই মরজগত থেকে।

কিন্তু সেখানেই দুঃখের অবসান হলো না। ফুল্লরারও এক্স-রে প্লেট করাতে হলো। সন্দেহ মিথ্যে নয়। বুকের একটা দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আক্রমণ-চিহ্ন। আর দেরি করা ঠিক হবে না। স্বামীকে অনুসরণ করে তাকেও আশ্রয় নিতে হলো এই দীননাথ হাসপাতালেই।

হাসপাতালে ফুল্লরা এসেছে প্রায় ন মাস আগে। ডাক্তার, নার্স এমন কি রোগীদেরও সকলেরই সহানুভূতির পরিমাণ একটু বেশিই ফুল্লরার প্রতি। এমন সুন্দর দেখতে, আর এতো অল্প বয়েসে বিধবা, তার ওপর এই রোগ। স্বামীও আবার এই হাসপাতালেই বছরখানেক আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সহানুভূতির মাত্রাধিক্যের এসব নানা কারণ।

বিধবা হলেও পয়সাওয়ালা ঘরের বৌ ফুল্লরা। পেয়িং বেডের পেশেণ্ট। সব সময় সাধারণ রোগীদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার দিকে তার বেশ ঝোঁক। কিন্তু এতোটা আত্মসংকোচন করে থেকেও হাসপাতালে আসার কিছুদিনের মধ্যেই কী করে যে তার স্বামীর স্মৃতি একেবারে ধুয়ে মুছে গেলো তা ভাবতে গিয়ে ফুল্লরা নিজেও বিস্মিত বোধ করে এক-এক সময়।

মানুষের বেশি সহানুভূতিই বিপদ ঘটিয়েছে ফুল্লরার। তা-ই বিপথগামিনী করেছে তাকে।

নেহাৎ দাদু বলেই মেয়েদের সঙ্গেও অসংকোচে কথা বলার একটা বিশেষ সুবিধে রয়েছে যোগেন মজুমদারের। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি হলেও অকিঞ্চন ঘোষের পক্ষে তেমন সুবিধের দাবী করা সম্ভব নয়। এমন কি দাদুর বয়সী হলেও তাঁর পক্ষে সে সুযোগ নেওয়া আদৌ সম্ভব হতো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তবু যা হোক, দাদুর সঙ্গী হবার ফলেই ফুল্লরার সঙ্গে কথা বলার একটা চান্স এসে গিয়েছিলো অকিঞ্চন ঘোষের।

দু একটা প্রবোধ বাক্য শোনাবার জন্যেই সেদিন খোলা মাঠে বেড়াতে বেড়াতে দাদু ঘোষদাকে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ফুল্লরার সামনে।

আমার কথা তুমি মা নিশ্চয় শুনে থাকবে। কেউ যদি তোমাকে আমার বিষয়ে কিছু বলে নাও থাকে, তাহলেও অন্তত হাওয়ায় তোমার কানে ভেসে এসে থাকবে এ শর্মার কাহিনী।—দাঁড়িয়ে পড়েই এমনি বিচিত্র ভাষায় ফুল্লরাকে আত্মপরিচয়ের ভূমিকা উপহার দেন যোগেন মজুমদার।

হ্যাঁ, আমি বিলক্ষণই চিনি আপনাকে। এ হাসপাতালে সবারই দাদু আপনি। অনেকের মুখেই আপনার কথা শুনেছি।—উত্তর দেয় ফুল্লরা।

কিন্তু এই সামান্য ঘোষকে নিশ্চয়ই চেনো না তুমি।

হ্যাঁ, সত্যি তাই। ওঁর সম্বন্ধে আমার তেমন কিছুই জানা নেই। তবে এটুকু জানি, ইনি আমাদের হাসপাতালেরই একজন কেবিন পেশেণ্ট।—করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে থামে ফুল্লরা।

ও এরই মধ্যে সে সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে! ভারিতো চালাক মেয়ে তুমি মা। আরে আমিও কি আর কম চালাক। সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা যে তোমার রয়েছে এই দুএক মিনিটের আলাপেই আমিও তার খোঁজ পেয়েছি।

কী যে বলছেন দাদু! ওসব কথায় কান দেবেন না মিসেস সাহা। আমার নাম অকিঞ্চন ঘোষ। দাদু ভালোবেসে

ডাকেন 'সামান্ত' বলে। ডাকুন, তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আমার মধ্যে কোনোরকম অসামান্ততা আরোপ করা অত্যন্ত অন্যায়। আমি সব সময়েই দাহুর সে কথার প্রতিবাদ করি। দাহুর এসব হাসি-ঠাট্টার কথাকে আপনি কখনো আমল দেবেন না যেন।—অকিঞ্চনের এ কথার মধ্যেই অসামান্ততার সন্ধান পায় ফুল্লরা। তাঁর চেহারার মধ্যে যেমনি একটা বড়োমানুষী ও বনেদী ভাব, তাঁর কথার মধ্যেও তেমনি গাম্ভীর্য ও লালিত্যের সুন্দর সমন্বয়। এতেই কেমন যেন একটা মুগ্ধভাব ছেয়ে ফেলে ফুল্লরার সারা মনখানিকে। সেই মনকে শান্ত করতে কম সংগ্রাম, কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাকে!

ছু চারটে সহানুভূতির কথা ও প্রবোধবাণী এবং আরো সামান্ত হাসি-তামাসার পর দাহু সেদিন অকিঞ্চন ঘোষকে নিয়ে ফুল্লরার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অকিঞ্চন যে সেই থেকে ফুল্লরার মন কী ভাবে জুড়ে বসেছিলো তার কিছুই টের পান নি তিনি।

মনের গতিবিধি টের পাওয়া খুব সহজও নয়। তাছাড়া যে মেয়ে সবাইকেই এক রকম এড়িয়ে চলে এবং কথাবার্তায় চালচলনে সংযমও যার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো তাকে নিয়ে কোনো রকম সন্দেহও সহজে উঠতে পারে না। কাজেই মাঝে মাঝে ফুল্লরাকে অকিঞ্চনের সঙ্গে আলাপ করতে দেখেও সন্দেহজনক কোনো ব্যাপার বলে কখনো মনে হয় নি দাহুর। আর শুধু দাহুরই বা কেন, আরো অন্যান্য

যাদের চোখে পড়েছে তাদের মনেও কোনো রকম ঢেউ তুলতে পারে নি ফুল্লরা ও অকিঞ্চনের এই সামান্য আলাপ-সালাপ। শুধু কি তাই, অকিঞ্চন নিজেও ফুল্লরাকে বুঝতে পেরেছে অনেক দেরিতে।

প্রথম প্রথম নির্দোষ তুএকটি কথাবার্তার মধ্য দিয়েই অকিঞ্চনের সামনে নিজের মনকে খুলে ধরতে চেয়েছে ফুল্লরা। কিন্তু পর পর সে চেষ্টার ব্যর্থতায় বার বার কেবল তুফানই উঠেছে তার মনের সমুদ্রে। সে ঝড়ের ছাপ পড়েছে তার চোখে মুখে। সে ছাপ ক্রমশই এতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, চেষ্টা করেও আর তাকে ঢেকে রাখা চলে না।

এই ঝড়ের মধ্যেই আর একটা সংগ্রামও নীরবে চালিয়ে আসতে হচ্ছে ফুল্লরাকে। হাসপাতালে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার স্বামীর বয়সীই একজন যুবক যে তার রূপমুগ্ধ হয়ে পড়েছে, যুবকটির হাবভাব দেখে তা টের পেতে ফুল্লরার খুব বেশি দিন লাগে নি। কিন্তু সুদর্শন হলেও সে যে ফ্রি বেডের পেশেণ্ট। কাজেই তার ইসারায় সাড়া দেবে ফুল্লরা, তা হতেই পারে না। এতোদিন সে তাই উপেক্ষার সঙ্গেই এড়িয়ে এসেছে পঞ্চাননকে। হাঁটতে চলতে বা কখনো কোনো উপলক্ষে একটি কথাও সে এপর্যন্ত বলে নি পঞ্চাননের সঙ্গে।

তবে কি সেই চরম উপেক্ষারই প্রত্যাঘাত আসছে অকিঞ্চনের কাছ থেকে। রাতদিন কেবল সেই চিন্তাই ফুল্লরা করছে কদিন ধরে। অকিঞ্চনকে পাবার কোনো

আশাই তার নেই আর। তবু কেন জানি সে দিকেই তার মন টানে বার বার। শুধু কি ধনী বলে, না সহজ সরল একটি মিষ্টি মানুষ বলে। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কোনো ইংগিত বা আভাষ কেন আসে না? তাহলে পঞ্চাননও হয়তো তার চেষ্টায় নিরস্ত হয়ে যেতো। এমনি সব চিন্তায় দিন দিন অতি বিশ্রী চেহারা হয়ে উঠেছে ফুল্লরার।

ফুল্লরার সে চেহারা দেখে দাছুর আসর থেকে ফেরার পথে একদিন অকিঞ্চনও শিউরে ওঠেন। পাশাপাশি হতেই নিজের অজ্ঞাতেই যেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলেন:

কয়েকদিনের মধ্যে একী চেহারা করে ফেলেছেন মিসেস সাহা? এ যে একদম চেনাই যায় না আপনাকে! এরই মধ্যে কী হলো আপনার?

কী আবার হবে? এর জন্যে আপনিইতো সম্পূর্ণ দায়ী।

আমি? সে কি কথা?—ফুল্লরার জবাবে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে অকিঞ্চনের মাথায়। ভাগ্যিস খুব কাছাকাছি অন্য কেউ ছিলো না! ফুল্লরার একথা কেউ শুনতে পেলে কতো রকমেরই না রটনা হতো তা নিয়ে!—ভাবেন অকিঞ্চন।

আহা, একেবারে কচি খোকা আপনি, কিছুই বোঝেন না! ন্যাকা কোথাকার!—এই বলেই এক ঝাপটায় ছুটে এগিয়ে চলে যায় ফুল্লরা। চোখ দুটো তার রাগে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে আর কি।

সামান্য একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফল যে এমনি দাঁড়াচ্ছে

পারে তা কল্পনাও করতে পারেন নি অকিঞ্চন ঘোষ। ফুল্লরার এ ব্যবহারে তিনি বেকুব বনে গেছেন একেবারে। কি যে সে প্রত্যাশা করেছিলো তাঁর কাছে আর কীইবা পায় নি, তা ভেবেই পান না ঘোষদা।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দিন দশবারো আগে অদ্ভুত রকমের একটা কথা বলেছিলো ফুল্লরা। বলেছিলো, রোজ রোজ দাছুর আসরে গিয়ে বিকেলবেলাগুলো নষ্ট না করে বরং চলুন দুজনে আমরা ঘুরে বেড়াবো, কী বলেন? সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিই নি আমি, উল্টো হাসির হাওয়ায় উড়িয়েই দিয়েছি তার সে প্রস্তাব। আজকের এ বিষোদ্গারণ তাহলে তারই ফল হবে হয়তো।—আপন মনের সঙ্গেই এমনি ধারায় আলাপ করতে করতে নিজের ঘরের দিকে চলে যান অকিঞ্চন।

ঘোষদার সঙ্গে এই আকস্মিক দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ফুল্লরার নিজের ওপরও বড়ো কম হয় নি। ঘোষদা শুধু এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেই ক্ষান্ত। কিন্তু ফুল্লরার মনের সমুদ্র তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তা তরংগে তোলপাড়।

শুধু ইসারা নয়, রীতিমতো আহ্বান জানিয়েছিলো সে অকিঞ্চনকে। তাতে নিরুত্তর থাকলেও এতোটা আহত বোধ করতো না ফুল্লরা। কিন্তু অবজ্ঞা চিরকালই অসহ্য তার কাছে। তাই সে আহত ফণিনীর মতোই ফেটে পড়েছিলো অকিঞ্চনের হঠাৎ প্রশ্নে। যার কথাকে আমল দিতে তিনি নারাজ, তার কুশল-অকুশলের প্রশ্ন নিয়ে

তাঁর এতো মাথাব্যথার কি প্রয়োজন? কাজেই অন্যায় সে করে নি, ঠিকই করেছে, ফুল্লরার এই ধারণা। তার মতো মেয়ের আহ্বানে কোনো পুরুষ নির্লিপ্ততার ভাব দেখাতে পারে, এ ছিলো তার কল্পনারও বাইরে। আর তা সত্যি সত্যি যখন ঘটে গেলো, সে তার জীবনের চূড়ান্ত অপমান হিসাবেই গ্রহণ করেছে তাকে। সে অপমানের প্রতিশোধ নেবে না সে? তাই সে নিয়েছে। অকিঞ্চনকে অন্তত কথার কঠোরতায়ও যে সে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পেরেছে তাতে পুরোপুরি না হোক, কিছুটা তৃপ্তি বোধ করছে ফুল্লরা।

কিন্তু এসবইতো অতীতের কথা। যা হবার তা হয়ে গেছে। অকিঞ্চনকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলাই ভালো। সে কাজটা যে খুব সহজ নয় তা বেশ ভালোই জানে ফুল্লরা। এক-একজনকে ভুলতে গিয়ে তার মনের চোখের সামনে অনেক তরুণ-প্রৌঢ় পুরুষের ছবিই তো বার বার ভেসে ওঠে ডকুমেণ্টারী ফিল্‌মের মতো। কী করে এ সমস্যার সমাধান করবে সে? পুরোপুরি ভুলতে না পারলে অকিঞ্চন ঘোষের মুখখানিও না হয় সেই অনেক মুখের সারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে তারই একটিতে পরিণত হবে! তাছাড়া আর কীইবা উপায় থাকতে পারে?

পদ্মার সৌভাগ্যে ভারি ঈর্ষা হয় ফুল্লরার। পদ্মা সব কথাই খুলে বলে ফুল্লরাকে। ওদের দু জনের মধ্যে অদ্ভুত

রকমের অন্তরঙ্গতা। কাছাকাছি ছুটি কেবিনে আছে ওরা। নিত্য দেখা, নিত্য আলাপ-আলোচনা থেকেই এমনি গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে পদ্মার সঙ্গে ফুল্লরার।

কথায় কথায় পদ্মাই সেদিন অতি সংগোপনে একটা কথা বলেছিলো ফুল্লরাকে। অত্যন্ত গোপনীয় কথা। পদ্মা জানে, প্রাণ গেলেও ফুল্লরা ফাঁস করবে না সে কথা। তাই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই বলেছিলো। এমনি খোলাখুলিভাবেই আজকাল তাদের মধ্যে সব সময় কথাবার্তা হয়ে থাকে।

সত্যনাথের সঙ্গে পদ্মার ভাবের আদান-প্রদান চলছে অনেকদিন ধরে। পদ্মারই সে স্বীকৃতি। আর কেউ সে সম্বন্ধে কিছু না জানলেও ফুল্লরা জানে। কিন্তু পদ্মার আব্দার রাখবার জন্যে সত্যনাথ যে তাকে সঙ্গে করে সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' ছায়াচিত্র দেখে আসবে একথা পদ্মার মুখে শুনেও ফুল্লরা সহজে বিশ্বাস করতে পারে নি। মাথার দিব্যি কেটে তবে পদ্মা তাকে বিশ্বাস করিয়েছে। সত্যনাথকে কি সাধেই এতো ভালোবাসে পদ্মা।

কিন্তু সত্যনাথও তো ফ্রি বেডেরই পেশেণ্ট! পদ্মা অতো-বড়ো একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসারের মেয়ে হয়েও যদি সত্যনাথের প্রতি এতোটা অনুরক্ত হতে পারে, তাহলে ফ্রি বেডের পেশেণ্ট বলে পঞ্চাননকেই বা সে এতো তুচ্ছ বলে মনে করছে কেন?

ফুল্লরা বেশ কিছু দিন ধরেই লক্ষ্য করে আসছে, পঞ্চানন সত্যি সত্যি তার রূপমুগ্ধ। তাকে একটু দেখার জন্যে, তার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যে কী আকুতি পঞ্চাননের? আর তার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলে সে যেন একেবারে কৃতকৃতার্থ—হাসিতে রাঙা হয়ে ওঠে তার সারা মুখখানি। ফুল্লরাকে বাস্তবিকই ভালোবাসে পঞ্চানন। এতোদিন ধরে এমনি অবজ্ঞা-উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয় নি তাব। আর ফ্রি বেডের রোগী হলেই যে সে একেবারে দীনদরিদ্র হবে তেমনই বা কি কথা আছে। সত্যনাথ যদি গরীবই হবে তবে পদ্মার জন্যে এতো রকমের খরচ করছে সে কি করে! হতে পারে সে জাডির্ণ-হ্যাণ্ডারসনের কেরাণী, তারই জন্যে তাকে খুব গরীব মনে করার কারণ নেই। কোম্পানীরই একটা ফ্রি বেড রয়েছে হাসপাতালে, সে-ই বেডেই আছে সে। তার জন্যে তাকে হেয় মনে না করে ঠিকই করেছে পদ্মা। আর তার সুফলও সে ভোগ করছে। বাস্তবিকই পদ্মার সৌভাগ্য ঈর্ষা করারই মতো।

কিন্তু এই ঈর্ষার ভাব তো সবে এই মুহূর্ত থেকেই শুরু। পদ্মার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যতো গভীরই হোক, ফুল্লরা এতোদিন মোটেই ভালো চোখে দেখে নি পদ্মা-সত্যনাথের মেলামেশার ব্যাপারটাকে। প্রেমের জগতেও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের বাঞ্ছনীয়তার ওপর একটা আস্থা ছিলো ফুল্লরার। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থাকা যে আর চলে না এবং তা সংগতও নয়, একথা আজ সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে।

না, ফুল্লরা আর দূরে সরে থাকবে না পঞ্চাননের কাছ থেকে। ক্রমশই তার আকর্ষণের উষ্ণতা সে যেন অনুভব করছে। ক্রমেই বেড়ে চলেছে সে উষ্ণতা। ফুল্লরার সমস্ত বুকখানি জুড়ে দাউ-দাউ অগ্নিশিখা। পঞ্চাননের প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ না করে আর বাঁচার পথ নেই তার। ফুল্লরা উন্মাদিনী !

এই একই চিন্তার সূতো বুনে বুনে পুরো রাতই কেটে যায় ফুল্লরার। সকালবেলা শয্যা ছেড়ে উঠেই একবার আয়নার দিকে তাকায় সে। তাকিয়েই চমকে ওঠে। মনের আগুন চোখেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যে ! সঙ্গে সঙ্গে বাগানের রক্ত গোলাপের কথা মনে পড়ে যায় তার। দোতলা থেকে তার ঘরের জানালা দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেই আগুন-ছড়ানো ঐ গোলাপবাগ। সে দিকে অবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ ধরে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কী অদ্ভুত মিল বাগানের রক্ত গোলাপের সঙ্গে তার আজকের এই চোখ দুটির। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে মিলিয়ে নেয় ফুল্লরা।

বার বার যে চোখ দুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে পঞ্চাননের প্রেমের সে অবমাননা করেছে, সেই চোখ দুটিকে উপড়ে তুলে পঞ্চাননকে যদি উপহার দিতে পারতো তাহলেই যেন সবচেয়ে বেশি খুশি হতো ফুল্লরা। কিন্তু সেতো আর সম্ভব নয়। তাই বাগানের দুটি রক্ত গোলাপই হবে তার প্রথম প্রেমোপহার। অগ্নিজ্বালার যে প্রচণ্ড দহন তাকে প্রতিদিন

প্রতিক্ষণ সহ্য করতে হচ্ছে তারই প্রতীক রক্ত গোলাপ। স্বামী মরলেও, মন তো মরে নি ফুল্লরার! সে মন ঐ রক্ত গোলাপেরই মতো তাজা, লাল টুকটুকে সেই মন-গোলাপের তাজা পাপড়িগুলোকে কি করে ফুল্লরা অকালে ঝরিয়ে ফেলবে, আর কেনই বা ফেলবে?

এমনি ভাবতে ভাবতে দোতলা থেকে নিচের দিকে নেমে আসে ফুল্লরা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় মেট্রন মিস দাসের সঙ্গে।

এ কী বিশ্রী রকম চেহারা করে ফেলেছো ফুল্লরা?—খুব দয়ার্দ্র-আকুল কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন মিস দাস। ফুল্লরা নিজের বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে যায়।

সরাসরি জবাব না পেলেও এই থেকেই যা সম্ভব যা স্বাভাবিক তাই অনুমান করে নেন মিস দাস। বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান মেট্রন মিস দাসের জীবন। তিনিও স্বামী-কন্যা নিয়ে ঘর করেছেন এক সময়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে কোলকাতা শহরে, শহরের আশেপাশে বিদেশী সৈন্যদের যখন ছড়াছড়ি সে সময় গোরা সৈন্যদের একটা জীপে উঠে সেই যে রুমাল উড়িয়ে বিদায় নিয়ে গেলো কাঁচা মেয়েটা আর সে ফিরে এলো না। আগে বেশ কয়েকদিন সে গোরাদের সঙ্গে বের হয়ে গেছে, আবার ফিরে এসেছে। এক এক রাতে মুঠো মুঠো নোট নিয়ে ঘরে ফিরেছে। মেয়েটার সারা দেহ-মনে ক্লান্তির অবসাদের মধ্যে অনেক টাকা পাওয়ার খুশি-চিহ্নও জ্বল-জ্বল করে উঠতো।

সময় সময়। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন তাঁদের সেই একমাত্র কন্যা সেই যে উধাও হলো আর কোনো হদিসই পাওয়া গেলো না তার। আর সে ঘটনা নিয়েই মেয়ের বাপ-মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। ডিভোর্সের পর আর নতুন সংসার পাতেন নি মিস দাস। পাশ করা অভিজ্ঞ নার্স ষোল বছর আগে সেই যে চীফ মেট্রনের কাজ নিয়ে ঢুকেছেন এই দীননাথ হাসপাতালে সেই থেকে মিস দাস একটানাই আছেন এখানে। এখানে এই ষোল বছরের কর্মজীবনে অনেক দেখেছেন, অনেক স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। মোটামুটি সব কিছুই প্রায় ঠিক ঠিক মতোই ধরা পড়ে সেই অভিজ্ঞতার আলোয়। এ যে ফুল্লরার দেহের রোগ নয় মনের রোগ তা বেশ বুঝতে পারেন মিস দাস। তাই উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না তিনি—'বি জলি এ্যাণ্ড হ্যাপি মাই চাইল্ড'—এই বলতে বলতে দোতলার দিকে উঠে যান। ফুল্লরাও হাঁফ ছেড়ে নেমে আসে।

রক্ত গোলাপের কী রকম একটা ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করে আজ ফুল্লরা। প্রাংগনে নেমেই তাই ছুটে যায় সে গোলাপ বাগের দিকে।

কী আশ্চর্য, বাগানের ঠিক উল্টো দিকেই আরো কয়জন সংগীকে নিয়ে পঞ্চানন চক্রবর্তী! দেখামাত্রই সারা দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলোর মধ্যে রক্ত টগবগিয়ে ওঠে ফুল্লরার।

না, আর চোখ ফিরিয়ে নেবে না ফুল্লরা। আর ভুল করবে না সে। কিছুতেই না।

হঠাৎ পঞ্চাননের দৃষ্টিপথে পড়ে যায় কামনাময়ী ফুল্লরা। দু জোড়া চোখই নিস্তব্ধ নিষ্পলক। কী অসীম ক্ষুধা ফুল্লরার দৃষ্টিতে। সে লালসার তীব্রতায় পঞ্চানন দগ্ধমন। আত্মহারা সে। ফুল্লরাও নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে পঞ্চাননের দৃষ্টির দর্পণে। সে চোখের পাতায় পাতায় আমন্ত্রণ, অধীর-আকুল মিলন-আকাঙ্ক্ষা।

যবনিকার অন্তরালে সেই মিলনেরই পটভূমিকা তৈরি হয় কিছুদিন ধরে।

শীতের অবসানে বসন্ত-বিলাস-প্রমত্ত আকাশ-পৃথিবী। হাওয়ায় হাওয়ায় কামনা-গন্ধ। ক্ষণ-শ্বাশত এক একটি জীবন্ত মন নড়ে নড়ে ওঠে সেই বসন্ত হাওয়ায়।

পঞ্চাননকে বেশ ভালোই লেগেছে ফুল্লরার। এর মধ্যে কতোদিন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে, কতো প্রাগ-উষার আধো আলোয় চুপি চুপি দেখা হয়েছে, আলাপ-সালাপ হয়েছে দুজনের মধ্যে, কিন্তু কোনোদিন কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ঘটে নি। ফুল্লরা এবং পঞ্চানন উভয়েই এতে আরো খুশি।

কিন্তু এ খুশির মেয়াদ কতো দিন? মন-মন খেলার নানা পর্ব। সে সব পর্ব সব চোখ এড়িয়ে কি বেশিদিন খেলে যাওয়া সম্ভব? পুরোপুরি জানাজানি না হলেও, কানাকানি যে বেশ কিছুদিন ধরেই শুরু হয়ে গেছে!

॥ ছয় ॥

কয়েকটা মাস মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে যায়।

বসন্ত শেষে গ্রীষ্মের দাবদাহ। সে দগ্ধ দিনগুলো থেকে পরিত্রাণ নতুন বর্ষায়। কিন্তু সে দহন-মুক্তি দারুণ অশান্তি নিয়ে আসে দুজনের জীবনে।

ফুল্লরার চাল-চলনে তার প্রতি সকলের সহানুভূতিতেই যেন ভাটা পড়ে আসছিলো ক্রমে ক্রমে। একটু সন্দেহও জাগছিলো অনেকের মনে। মেয়েদের মহলেই সে সন্দেহটা প্রথমে দেখা দিয়েছিলো এবং আস্তে আস্তে পুরুষ মহলেও তার প্রসার ঘটেছিলো।

হঠাৎ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পর্কে এতোটা আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন ফুল্লরা? কোনো সাধারণ রোগী বা রোগিনীর ধারে পাশেও কখনো দেখা যায় নি যাকে, ফ্রি-বেডের রোগীদের নামে নাক সিঁটকানোতেই যে অভ্যস্ত তার আচরণের এরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে যে ব্যাপক বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু কেবলমাত্র বিস্ময়েই এর ক্ষান্তি নয়, মেয়ে মহল থেকে একটা কলগুঞ্জন শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে সারা হাসপাতাল জুড়ে।

সে কলগুঞ্জন যে মিথ্যাকে ভিত্তি করে নয় তা প্রমাণিত হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই।

ছেলেদের বাথরুমে মেয়ে-স্যাণ্ডেল!

একদিন প্রত্যুষে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো হাসপাতালে এই ব্যাপার নিয়ে। বর্ষণ-মুখর রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে। কিভাবে এ সম্ভব হতে পারে, এ প্রশ্নে সকলের মন তোলপাড়। গোপনে রহস্যোদ্ধারের চেষ্টাও চলে। কিন্তু কোন রোগিনী স্বীকার করবে এ স্যাণ্ডেল তার বলে ? আর এ এমনই একটা ব্যাপার যা নিয়ে মনে মনে অনেকের নামই আন্দাজ অনুমান করা চলতে পারে, কিন্তু কোনো নাম মুখে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই ব্যাপারটা একরকম ধামাচাপাই পড়ে যায় সাময়িক ভাবে।

কিন্তু এসব কি আর চিরকাল চাপা থাকে ? কথায়ই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। এক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়ালো।

পঞ্চাননকে লেখা ফুল্লরার একখানি চিঠি গিয়ে পড়ে সরাসরি একবারে সুপারের হাতে। সে চিঠি পড়ে ক্যাপ্টেন মুখার্জির নতুন দুশ্চিন্তা। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুতর সমস্যার সমাধানে নানা চিন্তা শুরু হলো।

ফুল্লরা ও পঞ্চাননের মধ্যে গোপনে যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতো তা পরিষ্কারই বোঝা যায় ঐ পত্র থেকে। ভুল করে বাথরুমে স্যাণ্ডেল ফেলে আসায় যে বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। ব্যাপারটা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হবার জন্যেই পঞ্চাননকে চিঠি দিয়েছিলো ফুল্লরা। এর আগেও সে

কয়েকবার চিঠি লিখেছে পঞ্চাননের কাছে। হাসপাতালে তাদের দুজনকে নিয়ে গুঞ্জন ওঠার পর থেকেই প্রকাশ্য মেলামেশাটা এড়িয়ে চলছিলো ওরা। এনগেজমেন্টের জন্যে কিংবা কোনো বিশেষ বক্তব্য জানাবার জন্যে এ ধরণের চিঠি লেখালেখি চলতো ওদের মধ্যে। এর আগে কোনো চিঠিই তো কখনো বে-হাত হয় নি। কাজেই চিঠি মার যাবে, এ চিন্তা একবিন্দুও মনে আসে নি ফুল্লরার। তাই অকস্মাৎ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ডাক পেয়ে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে যায় বেচারা।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ফুল্লরা গিয়ে দাঁড়ালো সুপারের অফিস ঘরে। সুপার ছাড়া আর অন্য কেউ নেই সেখানে। তিনি বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই আসন গ্রহণ করতে বললেন রোগিনীকে। ফুল্লরা এতে খুব খুশি। তার মনের ভয়ও এতে কেটে যায় অনেকটা।

কিন্তু পঞ্চাননকে লেখা তার এ চিঠি সুপারের হাতে পড়লো কি করে?—ড্রয়ার থেকে বের করে নীল খামের চিঠিখানা মুখার্জি সাহেব তার হাতে তুলে দিতেই মাথাটা ঘুরে যায় ফুল্লরার।

দুর্গা জমাদারনী এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার সঙ্গে!—ভেবে এর কোনো কূলকিণারাই করতে পারে না ফুল্লরা। প্রতিবারই সে যথেষ্ট বখশিস দিয়ে আসছে তাকে। এবার আরো বেশি বখশিস দিয়েছিলো, নিজমুখে দুর্গা বেশি চেয়েছিলো বলে। আর এবারই এমন কাণ্ড ঘটে

বললো। চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকে ফুল্লরা। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

আমি জানি এ বিষয়ে কোনো কিছুই তোমার বলার থাকতে পারে না। অলরাইট, তোমাদের এ কেলেংকারি নিয়ে হাসপাতালে একটা হৈ-চৈ হয় এ আমিও চাই নে। সেদিন ছেলেদের কলঘরে মেয়ে-স্যাণ্ডেল নিয়ে যে সোরগোল শুরু হয়েছিলো সেও দেখছি তোমারই ব্যাপার। যাক, সে সব এখন চাপা পড়ে গেছে। মানে মানে তুমি বাড়ি ফিরে যাও, আমি তাই চাই। তুমি কি বলো ?—অতি মোলায়েম ভাবেই ডাঃ মুখার্জি মত জিজ্ঞেস করেন ফুল্লরার।

ফুল্লরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কথা বলার সমস্ত ক্ষমতাই যেন হারিয়ে ফেলেছে সে।

তোমার গার্জেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দু'চার দিনের মধ্যেই তোমার ছুটির অর্ডার হয়ে যাবে। এ ক'টাদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমায়। আর ছুটি হয়ে গেলেও তেমন ভয়ের কিছু নেই তোমার। শরীর তোমার মোটামুটি ভালোই আছে এখন।—ফুল্লরাকে এভাবে আশ্বাস দেন সুপার। তারপরে জানতে চান, কি করে ফুল্লরার পরিচয় হলো পঞ্চাননের সঙ্গে।

আমি বৌদি হই যে ওর। —ছোট্ট উত্তর।

কি করে ? তুমি সাহা আর সে চক্রবর্তী। —বিস্ময় প্রকাশ করেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

আমার স্বামী ওর দাদার বন্ধু ছিলেন। সে সূত্রেই আমাদের বৌদি-দেওর সম্পর্ক।

সুপার মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না এ উত্তরে। তবু এ নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে তিনি বিদায় দেন ফুল্লরাকে।

একই কারণে পঞ্চানন চক্রবর্তীকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে তাকে এখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না হাসপাতাল থেকে। তবে হাসপাতালে পঞ্চাননকে নিয়ে এ ধরণের কোনো ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে অন্য কোনো প্রশ্ন বিবেচনা না করেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, অতি কঠোর ও সুস্পষ্ট ভাষায় সুপার তা জানিয়ে দিয়েছেন তাকে।

ফুল্লরার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় কতোদিনের এবং কি সূত্রে, সে প্রশ্ন পঞ্চাননকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

আশ্চর্য, ঠিক ফুল্লরার মতোই উত্তর দিয়েছে পঞ্চানন। জবাব শুনে সোজাসুজিই ধরে নেওয়া চলে যে, সম্ভাবিত প্রশ্নের এ উত্তর অনেক আগে থেকেই তাদের ঠিক করে নেওয়া। তাই পাইপ টানতে টানতেই একটু মুচকি হাসেন মুখার্জি সাহেব।

দাদার বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে ফুল্লরা তার বৌদি ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, পঞ্চাননের এ যুক্তি সুপার কোনো মতেই মেনে নিতে পারেন না, বরং তাঁর বিশ্বাস এ হাসপাতালেই তাদের প্রথম পরিচয়। তাই বিদায় দেবার আগে পঞ্চাননকে

সুপার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, অন্য কোনো রোগিনীর সঙ্গে আবার তার এ ধরণের মেলামেশার বিন্দুমাত্র আভাষ পাওয়া গেলে এ হাসপাতালে আর একদিনের জন্যেও তার ঠাঁই হবে না।

পঞ্চানন সেই যে মুখ কালো করে সুপারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তারপর কদিন আর তাকে বাইরে বড়ো একটা দেখাই যায় নি। ফুল্লরার ছুটি হয়ে যাচ্ছে, এ কথা শুনে মন তার ভেঙে গিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের চিঠি পেয়ে ফুল্লরার দাদা এসে সাক্ষাৎ করে গেছেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে। সমস্ত কথাই তিনি শুনেছেন এবং এ অবস্থায় বোনকে সরিয়ে নেওয়াই যে সংগত এও তিনি স্বীকার করেছেন।

নিয়ম মাফিক একটা ছুটির অর্ডারও ইসু হয় ফুল্লরার এবং তার দাদা এসে নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি নিয়ে যান তাকে।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই খুব গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মজা এই, দেওয়ালেরও কান আছে। সুপারের ঘরে হঠাৎ ফুল্লরা ও পঞ্চাননকে একই দিনে পরপর তলব করার খবরই শুধু নয়, সুপারের সঙ্গে তাদের দুজনের কথাবার্তার বিবরণও বাইরে কেমন করে সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে!

ফুল্লরার ছুটি হয়ে যাবার পর পঞ্চানন যেদিন প্রথম অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে পারবে মনে করে বাইরে বেরুলো সেদিনই সতেরো আঠারো বছরের এক ছাত্র-রোগী

একেবারে তার মুখোমুখী হয়ে প্রশ্ন করে বসলো, 'কী পঞ্চাননদা, বৌদি কেমন আছেন ?'

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে পঞ্চানন ? বৌদি কথাটাই যে এখানে দ্ব্যর্থবোধক। কাজেই কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু কতো লোককে প্রতিদিন আর পাশ কাটিয়ে যাবে সে ? যার সঙ্গে দেখা সে-ই তো প্রশ্ন করছে, 'কী হে, কি খবর ? বৌদি কেমন আছে ?' আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা জবার মতো রঙ হয়ে যায় পঞ্চাননের। দায়ে পড়ে সুপারের কাছে ফুল্লরাকে বৌদি বলে পরিচয় দিতে হয়েছে পঞ্চাননের, সে খবর এমনিভাবে বাইরে কে রটিয়ে দিলে ? নানাদিক থেকে চিন্তা করেও এর কোনো হদিস করতে পারে না সে। আর তা জেনেই বা তার কী লাভ ? হাসপাতালে তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে বলা চলে। 'বৌদি'র খবরের জন্যে প্রত্যেকেরই যেন ভীষণ দুশ্চিন্তা আর সে দুশ্চিন্তা থেকে তাদের সকলকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব যেন তার !

নিজের ঘর থেকে কোথাও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই পঞ্চাননের, এমনি জটিল হয়ে উঠেছে হাসপাতালের পরিবেশ তার পক্ষে।

সেই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে শান্তনুই রক্ষা করেছে পঞ্চাননকে। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে সে অনুরোধ জানিয়েছে, পঞ্চাননের মনের ক্ষতে আর এভাবে আঘাত না করতে। তাইতো বেঁচে গিয়েছে পঞ্চানন

চক্রবর্তী। তা না হলে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যেতে হতো তাকে।

কি রোগী, কি চিকিৎসক বা সাধারণ কর্মচারী সকলের ওপরই অদ্ভুত রকমের একটা প্রভাব রয়েছে শান্তনুর। গঠন-মূলক নানা কাজের মধ্য দিয়ে সকলের সঙ্গে সে এমন একটা আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলেছে যার ফলে তার কোনো অনুরোধই উপেক্ষিত হয় না হাসপাতালে।

এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শান্তনুর অনুরোধে খুবই সুফল হয়েছে। সেই থেকে কেউ আর বড়ো একটা কথাই বলে না পঞ্চাননের সঙ্গে এবং পঞ্চাননও এড়িয়েই চলে সকলকে। তার যা কথাবার্তা সে শুধু শান্তনুর সঙ্গে। সেই শান্তনু এই হাসপাতালেই থাকবে অন্তত সে যতোদিন আছে, পঞ্চাননের তেমন ইচ্ছে থাকাই তো স্বাভাবিক। আর তাই তো শান্তনু কনফারেন্স রুম থেকে ওয়ার্ডে আসতেই সবার আগে ছুটে এসে তার নতুন ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা কি ঠিক হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চায় পঞ্চানন। সে এও আশা করে, সাধারণত ক্ষয়রোগীদের যেমন ত্রিশ গ্র্যাম স্ট্রেপটোমাইসিন আর পাঁচ গ্র্যাম আই-এন-এ-এইচ দেওয়া হয়ে থাকে, শান্তনুকেও তেমনি আর এক দফা দেওয়া হয়ে থাকবে এবং সে আরো বেশ কিছুকাল তার সঙ্গে এই দীননাথ হাসপাতালেই কাটাবে।

কিন্তু শুকনো মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে শান্তনু যখন উত্তর দিলে—না ভাই তা নয়, টু ফার্লঙস ওয়াকিং দিয়েছেন

ডাঃ মুখার্জি, আর রি-এগজামিনেশন আপটার এ ফর্টনাইট; অর্থাৎ ছুটি আসন্ন—তখন সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা কালির ছাপ পড়ে গেলো পঞ্চাননের মুখের ওপর।

ছুটি পেলে তো ভালোই। সেরেস্থরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে, সেতো আনন্দের কথা, তাতে আবার আফশোষের কী আছে?—কাছাকাছিই কোথায় ছিলেন দাছু, আর একটু এগিয়ে এসে শান্তনুর কথার পিঠে প্রশ্নটুকু বসিয়ে দিলেন টুক করে।

এরই মধ্যে অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে যায় শান্তনুকে ঘিরে। পঞ্চানন অদৃশ্য হয়ে পড়ে সেই ভিড়ের মধ্য থেকে। যাবার সময় শুধু বলে যায়, বিকেলে আবার দেখা করবে সে শান্তনুর সঙ্গে।

শান্তনু সেই সুযোগে একটু একান্তে টেনে নিয়ে যায় দাছুকে। তারপর দাছুর প্রশ্নের উত্তরে বলে—জানেন তো দাছু, কী অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বো যদি এখন ছেড়ে দেয় হাসপাতাল থেকে। ধার-দেনার মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে অতল তলায় তলিয়ে যাবো সপরিবারে, এই চিত্রই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। চারদিকে শুধু যেন অন্ধকারই দেখছি দাছু।

দাছুর ভাঙাচোরা মুখখানিও নিমেষে ম্লান হয়ে যায় শান্তনুর কথা শুনে।

না জানলেও, সবই বুঝি ভাই। গরীব টি-বি রোগীর জীবন যে আমাদের দেশে কী বিড়ম্বিত তা আমার আর

জানতে বাকি আছে কিছু? সবই আমি জানি। তোমার বন্ধু ঐ পঞ্চাননের কথাই ধরো না। ওর যে তিন কূলে কেউ আছে তাতো মনে হয় না। আমি এদ্দিন রয়েছি এই হাসপাতালে, কিন্তু পঞ্চাননের কোনো আত্মীয় স্বজন এসেছে তার খোঁজ-খবর নিতে এ আমার চোখে পড়ে নি। তুমি দেখেছো কখনো? নিশ্চয়ই নয়। বলো দেখি, হাসপাতাল থেকে ছুটির অর্ডার হয়ে গেলে ওর কী অবস্থা দাঁড়াবে? তা তোমার তবু বাবা বেঁচে আছেন। তাঁকে আমি কয়েকদিনই দেখেছি তোমার কাছে। তিনিই সংসার চালান, তাই না? —শান্তনু এক মনে শুনে যায় দাদুর সব কথা। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়:

হ্যাঁ, বাবাই সংসার চালান বটে, তবে সে না চালানোরই মতো। শুনবেন, তবে সব খুলেই বলি।—এই বলে নিজেদের জমিদারী ঐতিহ্যের সমস্ত কাহিনী চেপে গিয়ে শান্তনু তাদের সত্ত অতীত এবং বর্তমান দুরবস্থার বর্ণনা দিতে শুরু করে।

জানেন তো আমাদের বাড়ি ছিল বরিশালে। জায়গা-জমি যা ছিলো তাতে আমাদের বেশ ভালোভাবেই চলে যেতো। গাঁয়ের স্কুলেই মাস্টারি করতেন বাবা। এণ্ট্রান্স পাশ শিক্ষক হলেও সেখানে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিলো তাঁর যথেষ্ট। মাইনের ওপর মানুষের মর্যাদা নির্ভর করতো না গাঁয়ের মানুষের কাছে। সুমিষ্ট স্বভাব ও সততার জন্যে সবাই ছিল বাবার ওপর শ্রদ্ধাশীল। তবে উপার্জন তাঁর যতোই কম হোক না কেন, কোনো বিষয়েই তেমন কোনো

অভাব বোধ করি নি আমরা কোনোদিন। দাদা বি. এ. পাশ করলেন কোলকাতা থেকে। কোলকাতাতেই চাকরির তদ্বির-তদারক শুরু করলেন। সমগ্র পরিবারে কতো আনন্দ, কতো আশা। কিন্তু সেই দাদার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিলো সংসারে।

আহা-হা, তোমার বড়ো ভাই বি. এ. পাশ করে মারা গেলো! কী সর্বনাশ!—বৃদ্ধের অন্তর কেঁদে উঠলো শান্তনুর কথা শুনে। করুণ ব্যথার অনুভব সকলের মনকেই কেমন নাড়া দিয়ে গেলো।

দাদা বেঁচে থাকলে আমাদের সংসারের এ হাল হতো না দাদু! আমাকেও এ অবস্থায় পড়তে হতো না—বলতে বলতে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শান্তনুর আপনা থেকেই। কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করে:

আমি গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরি পেতেই আমার বিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চাইলেন মা-বাবা। আমার কোনো অনুরোধ উপরোধ অনিচ্ছাই টিঁকলো না। বিয়ে হয়ে গেলো। মা-বাবার ইচ্ছেই পূর্ণ হলো। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁদের বিরূপ। শান্তির কামনা তীব্র হলে কী হবে, শান্তি তাঁদের কপালে নেই। দারুণ আঘাত এলো আমার বিয়ের কয়েকমাস বাদেই।

আবার কি আঘাত?—নীরব শ্রোতাদের মধ্য থেকে টুক করে জিজ্ঞেস করেন ঘোষদা।

হঠাৎ বরিশালের নানা জায়গায় রায়ট লেগে গেলো।

চারদিকে রক্তস্রোত বয়ে গেলো কদিন ধরে। সেই রায়টে মারা গেলো আমার ছোট ভাই। বীভৎস মৃত্যু, হৃদয়বিদারক সে কাহিনী।

বলো কী হে, ছোটভাইটিও তোমার মারা গেলো! তা আবার রায়টে!

হ্যাঁ, দাদু। কিন্তু থাক সে কথা। যা বলছিলাম, আজীবন দেশে নিজের জন্মভূমিতে কাটিয়েও বাবা আর থাকতে সাহস পেলেন না গ্রামে।

কেন, কী হলো আবার?—গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন দাদু।

আবার সেই রায়টের ব্যাপার। পঞ্চাশ সালে সারা পূব বাঙলায় হিন্দু বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠলে কেউ আর বাবাকে ভরসা দিতে পারলো না গ্রামে থাকতে। অগত্যা তিনি সকলকে নিয়ে পালিয়ে আসতেই বাধ্য হলেন কোলকাতায়।

জিনিসপত্তর তা হলে বোধ হয় কিছুই আনা সম্ভব হয় নি?—অনাদি জানতে চায়। কথায় তার গভীর আন্তরিক সহানুভূতি।

না, তা কি আর সম্ভব ভাই। পালিয়ে আসতে গেলে জিনিসপত্তর কি আর আনা চলে? কোনোরকমে জীবন নিয়ে পালানো আর কি!

চুলোয় যাক জিনিসপত্তর। প্রাণ নিয়ে যে চলে আসতে পেরেছো ভায়া তাই যথেষ্ট। টাকা পয়সা সোনাদানা কিছু আনতে পেরেছিলে তো! না কি তাও নয়?

তাও তেমন কিছু আনা সম্ভব হয় নি দাদু। জলের দামে বাড়িঘর জমিজমা সব বিক্রি করে যা-ও বা নগদ টাকা কিছু পাওয়া গিয়েছিলো তারও অর্ধেক মারা গেলো রাস্তায়।

তা আবার কি করে মারা গেলো? তোমরা পথে ডাকাতের হাতে পড়েছিলে বুঝি?—প্রভাস জিজ্ঞেস করে।

না, ডাকাত আর বলবো কি করে ওদের। চিরকালের বিশ্বস্ত লোক ওরা। এক সময় যাদের দেখেছি আমার বাপ-জ্যাঠামশায়ের কথায় প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, আমাদের বিপদের দিনে দেখা গেলো আমাদেরই প্রাণ নেবার জন্যে তারা তৈরি!

সে কি রকম?

বিশ্বাসঘাতকতার সে এক চরম দৃষ্টান্ত ভাই। সে কথা মনে করতেও শরীর শিউরে ওঠে। কি আর বলবো!

বলোই না।—শান্তনুকে তাগিদ দেয় প্রভাস।

আমাদের বাড়ির পুরনো মাঝি বদর মিঞা। মোটা-মুটি সম্পন্ন গৃহস্থ। বুড়ো বদর মিঞার সঙ্গে সলা পরামর্শ করেই বাবা ঠিক করেছিলেন রাতারাতি গ্রাম থেকে শহরে এসে স্টিমারে কোলকাতা চলে আসবেন। রাতের অন্ধকারে বদর মিঞাই তার নৌকো করে আমাদের খালে খালে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসবে, সব ঠিক ঠাক। তার আগেই আমাদের সব জমিজমা বাড়িঘর গোপনে গোপনে বেচাকেনা শেষ। তার সব কিছুই জানা বুড়ো মাঝির। তারই পরামর্শে সঙ্গে কোনো মালপত্র নিতে ভরসা পেলাম না আমরা। মাঝরাতে সে আর তার তিন ছেলে আমাদের ছয় জনকে

তাদেরই নৌকোয় নিয়ে ওঠালো। মাঝির তিন ছেলেই জোয়ান মরদ। রওনা হবার আগে বুড়ো মাঝি বলেছিলো, 'দলে ভারি থাকনই ভালো কত্তাবাবু। কওন তো যায় না রাস্তায় কহন কি বিপদ ঘটে। সাবধানের মাইর নাই, বোঝলেন না!' সরল মনে বাবা তার কথা বিশ্বাস করে নিলেন। আমাদেরও কারো মনে তখন কোনোরকম সন্দেহ হয় নি তার কথায়। কিন্তু কি বলবো, গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে এসেই শ্মশান ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে দিলে মাঝি। একে শ্মশানভূমি, তায় আবার চারদিকে মাঠ। গা ছম্ ছম্ করে উঠলো সবার। ভয়ে ভয়েই বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, এখানে থামলে যে বদর।' সে কথার উত্তর এলো বদরের বড়ো ছেলে নাসিরের মুখ থেকে। গম্ভীরভাবে সে বললে, 'আইজ্ঞা, কথা আছে।' কি কথা জানতে চাওয়া মাত্রই নৌকোর ভেতরে এসে ঢুকে বসলো নাসির, আর তার দুভাই পাহারা দাঁড়িয়ে গেলো নৌকোর দুমুখে। কিছুই আর বুঝতে বাকি রইলো না আমাদের। সে সময় আমার মা, বৌদি এবং স্ত্রীর যে কি অবস্থা তা কল্পনা করাও কঠিন। সে অবস্থায় আমি একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও তোমরা?' নাসিরও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলে, টাকা পয়সা ধনদৌলত নিয়ে পাকিস্তানের বাইরে কাউকে যেতে দেবার হুকুম নেই তাদের ওপর। সব কিছু তাদের হাতে সঁপে দিলে তবেই আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবো। এই ভয়ংকর কথা শুনে একেবারে জ্ঞান-শূন্য হয়ে গেলেন

বাবা। দিশেহারা হয়ে বদর মিঞার পা ছুটো তিনি জড়িয়ে ধরলেন ছুটে গিয়ে। 'আহা কী করেন কত্তা, কী করেন'—বলে বাবার হাত ছাড়িয়ে দেয় বটে বুড়ো মাঝি, কিন্তু কোনো আশ্বাসের কথাই পাওয়া যায় না তার কাছ থেকে। নাসির বরং উল্টে আরো চড়া সুরে বলে উঠলো, 'এই সব ভড়ং কইরা কোনো লাভ নাই বুড়া কত্তা, যা আছে সব বাইর কইরা ছান, জীবনে বাইচ্যা যান।'

এমন কথা বলতে একটুও বাধলো না নাসিরের? এ অবস্থায় কী করলে তোমরা?—গভীর সহানুভূতি এবং সমস্ত ঘটনা জানবার জন্তে একটা আন্তরিক আগ্রহ যেন রীতিমতো ভারি করে তোলে প্রভাসের এ প্রশ্নটিকে।

এমনি পরিবেশে আর এমন অবস্থায় কীইবা আর করার থাকে বলো। তবু বাবা একবার প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই বললেন, 'তোমার মনে এই ছিলো বদর? বেশ তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ করো।' বদর মিঞার হয়তো এতে কিছুটা শুভবুদ্ধির উদয় হলো। সে তার ছেলেদের আদেশ করলে, 'নে, সোনা দানা সবটা নে আর নগদ টাকার অর্ধেকটা লইয়া বুড়াবাবুগো ছাইড়া দে।'

ও! এ তো দেখছি অসীম করুণা তোমাদের বদর মিঞার!

এ ঠাট্টার কথা নয় দাছ। বদর মিঞার এই করুণাটুকু না পেলে শান্তনুদের একেবারে শূন্যহাতে মহানগরী কোলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়াতে হতো। তাহলে কী নিদারুণ অবস্থায় ওদের পড়তে হতো একবার কল্পনা করুন দেখি।

কথাটা ঠিকই বলেছো অনাদি। তবে কি জানো, পথে পথে ঘুষ আর জরিমানা দিতে দিতে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়ই আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম এই মহানগরীর রাজপথে। পূর্ব বাঙলার একটি সচ্ছল পরিবার বলে আর আমাদের চেনবার কোনো উপায়ই ছিলো না। এ অবস্থায় সংসারের সব দায়-দায়িত্বই এসে পড়লো আমার ওপর। প্রাণপণে খাটতে আরম্ভ করলাম আমি মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে সবাইকে বাঁচাবার জন্যে। সকালে ট্যুইশানি—দুপুরে অফিস—আবার সন্ধ্যায় দুটো ট্যুইশানি!

এভাবে দেহ-যন্ত্র আর কতো দিন চলতে পারে ভায়া। অসুখ হবে না কেন? দিনরাতের এমনি ধান্দায় কি আর শরীর ঠিক থাকতে পারে।

হ্যাঁ দাদু, এ ভাবেই আমার দিন চলেছে। একটি মাত্র বোন। তার বিয়ে দিতে হবে। সে চিন্তায় আমার সামান্য আয় থেকেই কিছু কিছু করে জমিয়ে চলছিলাম। বোনের বিয়েরও প্রায় সবই ঠিকঠাক। আর ঠিক এমনি সময়েই আমিও পড়ে গেলাম এই কালরোগে।

আরে ভাই, তুমি যে ইতিহাস শোনালে তাতে আরো অনেক আগেই যে তুমি কোনো একটা বড়োরকমের অসুখে পড়ে যাও নি সেটাইতো আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে।

না দাদু, কোনো কিছুতেই আজকের দিনে আর আশ্চর্য হবার কারণ নেই। তবে এ অসুখটিও হলো, ব্যস না-খেয়ে-দেয়ে বোনের বিয়ের জন্যে জমানো সব টাকা এক

ফুঁয়ে যেন কোথায় উড়ে গেলো আমার মাত্র দুমাসের চিকিৎসায়।

তা তো হবেই। বাড়িতে থেকে এ রোগের সঙ্গে টাকার পাল্লা দিয়ে চলা সে কি আমাদের মতো লোকের কাজ ?—অনাদি সায় দেয় শান্তনুর কথায়।

আমি অসুস্থ হবার পর কী কষ্টে যে আমাদের সংসার চলেছে, কতোদিন যে আত্মহত্যার চিন্তা মনে প্রবল হয়ে উঠেছে, তা আর কী বলবো! শুধু কচি ছেলেটার মুখখানি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তাই নিজেকে কোনোরকমে সংযত করে রেখেছি। চতুর্দিকের নিরাশার মধ্যেও আশা করেছি, আবার ভালো হয়ে উঠবো, আবার নতুন চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করে তুলবো। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সে আশা নিতান্তই দুরাশা।

দুরাশার কথা বলছো কেন ভায়া? তোমার মতো শিক্ষিত উদ্যোগী ছেলের কাছে আমি কিন্তু এধরণের নৈরাশ্য আশা করি নি। ইয়ং ম্যান, মনে জোর রাখবে সব সময়। —শান্তনুর ভেঙে পড়া মনকে দাদু একটু চাঙা করে তুলতে চান এই বলে।

জোর কোথা থেকে আসবে বলুন। বাবা যে তাঁর অক্ষম দেহ ও ভগ্ন মন নিয়ে কী ভাবে এখনো নিজে বেঁচে আছেন এবং আর সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাইতো আমার কাছে বিস্ময়। তার মধ্যে আমার ছেলে মানুষ হয়ে উঠবে, কী করে সে বিশ্বাস করবো ?—এ জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা উষ্ণ

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শান্তনুর বুকের সমস্ত পাঁজরাগুলোকে নাড়া দিয়ে।

না, না শান্তনু তোমার একথাকে আমি মোটেই মেনে নিতে পাচ্ছি নে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে তুমি নিজেই সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ছেলেকে ইচ্ছেমতো মানুষ করে তুলবে, সে বিশ্বাস তোমার থাকবে না কেন?

ঠিকই বলেছেন দাদু, এতোটা নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই।—এতোক্ষণে দাদুর সমর্থনে ঘোষদা আবার মুখ খোলেন।

হ্যাঁ, আজকাল তো ডাক্তাররাই বলছেন, বিদেশে অনেক জায়গায় যক্ষ্মা বলে কোনো রোগের অস্তিত্বই নাকি আর নেই। আরে সেদিন শান্তনু নিজেই তো আমায় ভারি মজার একটা গল্প বলেছিলো। আমেরিকার সব চেয়ে পুরোনো যক্ষ্মা হাসপাতালে নাকি কোন সরকারী অফিস বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগই যেখানে লোপ পেয়েছে সে রোগের হাসপাতাল রেখে কি হবে সেখানে? এ অবস্থা আমাদের দেশেও নিশ্চয়ই একদিন হবে। তবে দুদিন আগে আর পরে। তাতে আর তেমন কি আসে যায়। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, এতো পড়াশুনো করে, এতো জেনে শুনেও যদি মনটাকে আশাবাদী ও প্রফুল্ল না রাখতে পারলে তা হলে আর কিসে কি হবে?

আপনার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি দাদু। কিন্তু আশাটা কোথা থেকে আসবে তাই বলুন? অফিস থেকে

এক বছরের ছুটি দিয়েছিল উইদাউট পে-তে। তারপরে আপনা থেকেই চাকরি খতম। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের কোল কমিশনারের কোলকাতা অফিসে কাজ করতাম। সাত বছরের সেই চাকরি বিনা দোষে অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। সরকারী নিয়মেই আমি কর্মহীন হয়েছি, বলার কিছু নেই। কিন্তু হাসপাতাল থেকে এখন আমার যদি ছুটি হয়ে যায় তা হলে বাইরে গিয়ে আমি কি করবো বলতে পারেন? উচ্চ শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবকরাই যেখানে হাজারে হাজারে বেকার, আমার কাজ সেখানে চট করে কোথায় জুটবে বলুন? তা ছাড়া সুস্থ সবল লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমি পারবোই বা কি করে? জানেন তো এ রোগ থেকে সেরে ওঠবার পরেও অন্তত বছর খানেক খুব সাবধানে থাকা একান্তই প্রয়োজন। সাবধানে থাকা দূরের কথা, নিত্য দু মুঠো করে ভাত যে কোথা থেকে জুটবে তা ভেবেই তো আমার অন্তরাত্মা এখন থেকেই যেন শুকিয়ে আসছে। —এই বলে ম্লান ভাবে একটু হাসে শান্তনু।

তুমি কেবল ডার্ক-সাইডটাই দেখছো ভায়া, এই মুস্কিল।

ব্রাইট-সাইড বলে যে কিছু নেই দাদু, কি করে তা দেখবো। সব অন্ধকার। আমাদের দেশে টি-বি রোগীদের পক্ষে সবই অন্ধকার। পড়াশুনোর কথা বলছেন। বিভিন্ন দেশে এ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমাজে টি-বি রোগীদের কোথায় কিরূপ স্থান এসব তন্ন তন্ন করে আমি নানা বই ও পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু আমাদের মতো রোগীদের

এদেশে যে হাল হয়ে থাকে তেমন আর কোথাও হয় না। সমাজে স্থান নেই—স্বাস্থ্যের উপযোগী কাজকর্মের কোনো ব্যবস্থা নেই—দাগী চোরের মতো দিনরাত লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরা—এই বুঝি কেউ জেনে ফেললে এক সময়ে এর টি-বি হয়েছিলো, এই ভয়। এইতো আমাদের দেশে টি-বি রোগীদের জীবন !

কথাটা ঠিকই বলেছো, শান্ত। তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার সঙ্গে তর্ক করে হয়তো আমি পারবো না। তবে কি জানো, বিদেশে যে পরিবর্তনটা আগেই এসে গেছে তার ঢেউ আমাদের দেশেও আসবে, আসতে বাধ্য। এই দৃঢ় ভরসাকেই ব্রাইট-সাইড বলে মনে করতে হবে। তা ছাড়া কেবল হা-হুতাশ করেই বা কী লাভ বলো !—দাদু আর একবার চেষ্টা করেন শান্তনুকে আশ্বস্ত করতে। কিন্তু ছুটি হয়ে যাবে এই চিন্তায় শান্তনুর মনের দুকূল ছাপিয়ে উঠছে তার দুশ্চিন্তার ঢেউ। উত্তরও তাই তার জিভের ডগায়।

কিন্তু আপনি তো জানেন দাদু, বিদেশে ক্ষয় রোগীরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলে জীবনে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কী সুন্দর সব ব্যবস্থাই না আছে। আর হাসপাতালে থাকতেও সরকার থেকে তাদের খরচ দেওয়া হয়ে থাকে পরিবার প্রতিপালনের জন্যে। চিকিৎসা তো বিনামূল্যেই হয়ে থাকে। আর আমাদের দেশে? তাই বলছিলাম, এদেশে আমাদের মতো রোগীদের চিকিৎসার

মানেই হয় না। সরকারীই বলুন আর বে-সরকারীই বলুন, সব টি-বি হাসপাতালই আসলে এখানে লোক দেখানো।

তোমার বাড়িতে ফ্যামিলি মেম্বার কজন, শান্তু?—কথার মোড় ফেরাবার জন্যে প্রশ্ন করলেন দাত্থ।

তিক্ত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে উত্তর দেয় শান্তনু :

তা কম নয়। বাবা, মা, একটি বয়স্থা বোন, বিধবা বৌদি, স্ত্রী আর আমার একটি বাচ্চা।

আজকালের দিনে একে তো নেহাৎ ছোট সংসার বলা চলে না। ছয়জনের খরচ-খরচা চালিয়ে যাওয়া চারটিখানি কথা নয়।—ভ্রূ কুঁচকে মন্তব্য করে দাত্থ মাথা নাড়েন একটু।

সে কথাই বলছিলাম। এতোগুলো মানুষের খোরাক কী করে কোথা থেকে যে জোগাড় করছেন বাবা তা আমি ভেবেই পাই নে। আয় তো যা কিছু বাবার তুবেলার তুটো ট্যুইশানি থেকে। তা ছাড়া ধার আর সাহায্য ছাড়া ইনকামের অন্য কোনো পথই নেই। আচ্ছা কতো কাল আর লোকে ধার বা সাহায্য দেবে বলুন? আমার ছুটি হয়ে গেলে সমস্ত সাহায্যই যে বন্ধ হয়ে যাবে তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন। তখন টাকার ধান্দায় না ঘুরে পারবো আমি? অথচ ডাক্তার তো ছুটি দেবার সময় মেডিক্যাল এ্যাভাইস দেবেন, কমপ্লিট রেষ্ট ফর ওয়ান ইয়ার! কেমন রেষ্ট আমার নেওয়া হবে বুঝতেই পাচ্ছেন :

একটু থেমে দাত্থর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে শান্তনু আবার বলে, আমার কি মনে হয় জানেন দাত্থ? মনে হয় এদেশে

আমাদের মতো গরীব টি-বি রোগীর সুস্থ হওয়াটাই বিড়ম্বনা। মৃত্যুই আমাদের পরম মিত্র, 'আমাদের জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান।—এই বলতে বলতে বেদনাক্ষুব্ধ আবেগে জ্বল জ্বল করে ওঠে শান্তনুর দুই চোখ।

উত্তরে কী যে বলবেন কিছুই ভেবে পান না দাদু। পেট দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি—এই সনাতন আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করে জাতির অসহায়তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্নানের সময় হয়ে গিয়েছে বলে টুক করে উঠে পড়েন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক ভংগ।

॥ সাত ॥

সেদিনই বিকেল বেলা বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছে শান্তনু। ঠিক সেই সময়ই তার ঘরে এসে হাজির পঞ্চানন। ভালো সময়েই এসেছে সে। খালি ঘর পাওয়া গেছে, খুব সুবিধে হবে আলাপ আলোচনার।

এ ঘরের আর তিন জন পেশেণ্ট বাইরে বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। রোজই তারা তেমনি যায়। শান্তনুর নিত্য দেরি। কোনো কোনো দিন আবার বেরোবার তার সুযোগই হয়ে ওঠে না। হবেই বা কি করে। একে তো অসম্ভব রকমের একটা বাতিক তার বই পড়ার। তার ওপর

আবার নানা গঠনমূলক কাজ সে শুরু করেছে হাসপাতালে কাজেই নিত্য ঘুরে বেড়ানোর আর সময় কোথায় ?

প্রায় বছর দুই আগে শান্তনু সমাদ্দার যেদিন প্রথম দীননাথ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সেদিন থেকেই তার চোখে পড়েছে সাধারণ হাসপাতালের সঙ্গে টি-বি হাসপাতালের কতো তফাৎ। সে পার্থক্য যে আকাশ-পাতাল তা বুঝতে খুব বেশি দিন লাগে নি তার। সে দেখেছে, জেনারেল হাসপাতালে রোগীরা যায় অল্প কিছু দিনের জন্যে। সেখানে গিয়ে তাদের তেমন বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু টি-বি হাসপাতালে যে রোগী খুব কম দিনও থাকেন তাঁরও সাধারণত এক বছরের আগে ছাড়া পাওয়া সম্ভব হয় না। ভাগ্য খারাপ হলে কারো কারো তিন চার বছর, এমন কি অনেক সময় তার চেয়েও বেশিদিন লেগে যায় মোটামুটি সেরে উঠতে। কাজেই রোগী, নার্স ও চিকিৎসকদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে মেলা-মেশার সুযোগে বেশ একটা সৌহার্দ ও আত্মীয়তার ভাব গড়ে ওঠে। এই আত্মীয়তার পরিবেশটা বিশেষ করে বেসরকারী হাসপাতালেই বেশি হয়ে থাকে। তার কারণ, সেখানে তো আর সরকারী হাসপাতালের মতো ডাক্তার ও নার্সদের বদলির চাকরি নয়, তাই।

এই দীননাথ হাসপাতালও একটি বে-সরকারী টি-বি হাসপাতাল। শান্তনু যখন দেখলে যে, রোগীদের মধ্যে এক বছর থেকে তিন বছরের পুরনো রোগীর সংখ্যা অনেক তখন তার মনে হলো, এতোগুলো মানুষ মাসের পর মাস শুয়ে বসে

কাটিয়ে দেবে, এ ঠিক নয়। সময়ের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তিরও অপচয় ঘটে থাকে। অথচ এই হাসপাতালে যে আত্মীয়তার পরিবেশ তাতে সকলের সহযোগিতায় অনেক গঠনমূলক কাজেই হাত দেওয়া চলে। রোগী হলেও তারাও তো বৃহত্তর সমাজেরই একটা অংশ। দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাদেরও তো ভাববার অধিকার রয়েছে। নানা বিষয়ে তাই তাদের খোঁজ-খবর রাখা প্রয়োজন। এমনি ধারায় বেশ কিছুকাল ধরে ভেবেছে শান্তনু। ক্রমে ক্রমে তার সেই চিন্তাধারাকে সে প্রকাশ করেছে তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে। তারই ফলে দীননাথ হাসপাতালে গড়ে উঠেছে 'নবজীবন সমিতি' প্রকাশিত হচ্ছে তারই মুখপত্র 'নবারুণ' এবং এই সমিতিরই উদ্যোগে মাঝে মাঝেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাত্র এক বছরের মধ্যে সমিতির গ্রন্থাগারটি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে তুলনায় বাইরের অনেক লাইব্রেরীকেও ম্লান বলে মনে হবে। গ্রন্থাগার বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের গ্রন্থ-পাঠতৃষ্ণাও চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। 'নবারুণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানিও সুসম্পাদিত ও সুরুচিপূর্ণ এবং প্রতিবারই নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে বলে হাসপাতালের সকল মহলেই বিশেষ জনপ্রিয়। এ সব দায়িত্ব পালনে এক এক সময় হিমসিম খেয়ে যায় শান্তনু, কিন্তু এধরণের গঠনমূলক কাজে তার অসীম আনন্দ বলেই কোনোদিন কোনোরকমের অভিযোগ শোনা যায় নি তার

মুখে, বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ পায় নি তার কথাবার্তায় বা আচরণে।

'নবারুণ'-এর নতুন সংখ্যার প্রকাশ আসন্ন। তা নিয়ে কদিন ধরে ব্যস্ততার সীমা নেই শান্তনুর। কাল বিকেলে বেরোতে পারে নি সে মোটেই। আজো 'নবারুণ'-এর একটি ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। হাতের কাজ শেষ করে বাইরে বোরোবার মতলবে তৈরি হতেই পঞ্চাননের ডাকে দাঁড়িয়ে যায় শান্তনু। তারপর, 'আরে এসো এসো' বলে ঘরে ডেকে আনে বন্ধুকে।

আগে থেকে নোটিশ দিয়ে এসেছি কিন্তু, বলতে পারবে না কিছু।

কবে কি বলেছি তোমায় তাই বলো আগে।

না, তা বলো নি। তবে জানি তো কতো কাজে ব্যস্ত থাকো তুমি। তাই সহজে তোমায় ডিসটার্ব করতে চাই নে কখনো।

বেশ, এবার ভণিতা শেষ করে কি কথা বলতে এসেছো তাই বলো দেখি, শুনি।

সে অনেক কথা। শুনতে হবে সব ধৈর্য ধরে।

নিশ্চয়ই শুনবো। না শোনবার কি আছে?

এখানেই বলবো, না বাইরে যাবে?

তোমার যেমন ইচ্ছে।

একটু নিরিবিলিতেই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এঘরের মতো নিরালা এখন আর কোথায় পাওয়া যাবে। এখানেই বসো।

বেশতো এখানেই বসো। বলো কি তোমার কথা।

প্রথম কথাটাই তোমায় নিয়ে। হাসপাতালে তোমার মেয়াদ আর কদ্দিন তাই আগে জানা দরকার।

সে তো ভাই এখনো বলা চলে না। দু সপ্তাহ পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। তখন জানতে পারবো আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, না আরো কিছু কাল রাখা হবে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, ছুটিই হয়ে যাবে এবার।

ছুটি হয়ে যাবে তোমার? তাহলে কি করে আমি থাকবো এখানে?—শান্তনুর ছুটি হয়ে যাবে শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে পঞ্চানন চক্রবর্তীর।

কেন, তোমার কী ভাবনা তার জন্যে? আমার ছুটি হয়ে যাবার সম্ভাবনায় আমার না হয় দুশ্চিন্তা হতে পারে। সেজন্যে তোমার তো এতো দুর্ভাবনার কোনো কারণ দেখছি না।

এ কথা তুমি বলছো কী করে শান্ত। তুমি তো জানো, ফুল্লরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই এখানে। এখন তুমি চলে গেলে আমার যে দম আটকে মরার উপক্রম হবে ভাই।

এখন থেকেই তা নিয়ে কী দরকার এতো চিন্তার? কবে ছুটি হবে তাতো এখনো ঠিক হয় নি কিছু। কাজেই এ নিয়ে এখন তোমার মাথা না ঘামানোই ভালো।—পঞ্চাননের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কথাটা ঘুরিয়ে নেয় শান্তনু।

সাধারণ টি-বি রোগীরা ছুটির কথা শুনলেই আঁৎকে

ওঠে। আতংকিত হবারই কথা। তবে কি জানো, আমি এখন ছাড়া পেলে খুশিই হতাম।

কেন? এতো ভারি আশ্চর্য কথা!—বিস্মিত হয়ে জানতে চায় শান্তনু।

তোমায় ভাই আজো অবধি একটা কথা বলা হয় নি। বলার সুযোগও হয় নি। যাবার আগের দিন অতি গোপনে আমায় এই চিঠিখানা পৌঁছে দিয়ে তার মনের সমস্ত কথা আমায় জানিয়ে গেছে ফুল্লরা।

দেখি দেখি কোথায় সে চিঠিখানা। তোমার আপত্তি না থাকে তো দাও না, পড়েই দেখি।—ফুল্লরার দেওয়া চিঠি পড়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে শান্তনু।

আমার কোন কথাটাই বা তোমার অজানা। কাজেই আপত্তি আর কি থাকবে আমার?—এই বলে পঞ্চানন চিঠিখানা হাতে তুলে দেয় শান্তনুর এবং গভীর মন দিয়ে শান্তনু সেখানা পড়ে ফেলে।

চিঠিখানার মধ্যে সুস্পষ্ট একটি প্রস্তাব রয়েছে ফুল্লরার। চিঠির অনেক কথায় শান্তনুর হাসি পেলেও সে হাসি চেপে মনে মনে সে বিচার করে দেখে সেই প্রস্তাবটিকে। একথাও সে ভালো করেই জানে, আসলে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এবং তার পরামর্শ জানবার জন্যেই আজ পঞ্চাননের আসা।

বাঃ বেশতো খাসা প্রস্তাব। ঠিকই বলেছে ফুল্লরা হাসপাতাল থেকে মুক্তির পর সমাজে আর কোনো স্থান নেই

তায়। রোগ-মুক্ত হয়ে টি-বি রোগীরা যদি তাদের নিজেদের একটা সমাজ সৃষ্টি করে নেয় তাহলেও তাদের একটা মেলামেশার সুযোগ হতে পারে। আর তা না হলে বিচ্ছিন্ন জীবনই তাদের ললাট-লিখন। এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই বাঁচতে চায় ফুল্লরা। পঞ্চাননকে স্বামীরূপে পেতে চায় সে। একে অপরের আশ্রয় হয়ে বাঁচতে চায়।

বেশ তো ভালো কথা। এ যদি ফুল্লরার আন্তরিক কথা হয়ে থাকে, আপত্তি করবার তো কিছু নেই এতে!—প্রসন্ন মনেই ফুল্লরার প্রস্তাবে সমর্থন জানায় শান্তনু।

কিন্তু একটা কথা শান্ত। তুমি তো দিনরাত পড়াশুনো নিয়েই আছো, অনেকে যে বলে ক্ষয় রোগীদের বিয়ে-থা করা ঠিক নয়, এ কথার কি কোনো যুক্তি আছে?

সে যুক্তি নির্ভর করে রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থার ওপর। ফুল্লরা মোটামুটি সুস্থ হয়েই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তুমিও ছুটি পাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেই। তখন তোমাদের বিয়েতে কোনো বাধা থাকবে বলে মনে করি না।—এই বলে এ সম্পর্কে নানা দেশের বিশেষজ্ঞদের অভিমত বর্ণনা করে শান্তনু। সে বলে, আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে অনেক উদার। তাঁরা সুস্থ টি-বি রোগীকে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতোই মনে করে থাকেন। একজন সুস্থ মানুষের যেমন বিয়ের প্রয়োজন আছে, সে রকম একজন সুস্থ টি-বি রোগীরও বিয়ের প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন।

এ প্রসংগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে 'ট্রু লাইফ স্টোরি'

সিরিজের একখানি বুকলেট তার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আসে শান্তনু। সেখানি সে পড়তে দেয় পঞ্চাননকে।

পড়ে দেখো কি সুন্দর গল্প।

তুমি তো পড়েছো, তুমিই বলো শুনি।—পঞ্চাননের অনুরোধে শান্তনু শুরু করে :

এ একটি তরুণ-তরুণীর করুণ-মধুর কাহিনী। একটি মেয়ে ভালোবাসতো একটি ছেলেকে। ছেলেটিরও মেয়েটির প্রতি ছিলো গভীর অনুরাগ। প্রতিদিনই তারা সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোয় একসঙ্গে। সেদিনও তেমনি বেরিয়েছে। হঠাৎ পথে এক জায়গায় একটি এক্স-রে পরীক্ষার কেন্দ্র চোখে পড়লো তাদের। কি খেয়াল হলো দুজনে দুটো বুকের এক্স-রে ফটো তুলে নিলে।

সে কি কথা, এমনি খামোকা ফটো তোলার মানে?—পঞ্চানন আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করে।

হ্যাঁ, সে দেশে সুস্থ সবল লোকরাও মাঝে মাঝে এমনি এক্স-রে ফটো নেয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে থাকে। যাই হোক, এরপর ছেলেটি এবং মেয়েটি তাদের এক্স-রে ফটো নেবার কথা একেবারে ভুলে যায়। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পর সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে হঠাৎ একটা অশুভ খবর আসে মেয়েটির কাছে। তার টি-বি হয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে তার কোনো যক্ষ্মা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যাওয়া প্রয়োজন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো মেয়েটির সমস্ত রঙিন স্বপ্নকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এ সংবাদ। তার মনের মধ্যে

কেবলই ঘুরতে থাকে এই একটি সংকিত চিন্তা: ছেলেটি আর কি তাকে ভালোবাসবে? আর কি তার জন্যে চিকিৎসার এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করবে সে?

-কি দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত?—পুরো গল্পটা তাড়াতাড়ি জেনে নেবার জন্যে উন্মুখ পঞ্চানন। তার আর ফুল্লরার সঙ্গে সে ভালো করে মিলিয়ে নিতে চায় এ কাহিনী।

আর এক দিকে ঐ ছেলেটির মনেও প্রায় একই ধরণের প্রশ্ন: সেরে ওঠবার পর আর কি মেয়েটি তাকে এমনি ভালোবাসবে,—তাকেই বিয়ে করতে চাইবে? চিকিৎসার সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরো কতো লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হবে, কতো জনের সঙ্গে হয়তো ভাবও হবে। তারপরেও তাকে পাবার আশা করা কি দুরাশা নয়?

দু তরফেই এমনি চিন্তার আলোড়ন চলে কদিন ধরে। মনের কথা আর চেপে রাখতে পারে না ছেলেটি। এক নির্জন সন্ধ্যায় অনেক কিন্তু কিন্তু করে সে জিগ্যেসই করে ফেলে মেয়েটিকে, 'লক্ষ্মীটি, তুমি তো অনেকদিন হাসপাতালে থাকবে—তাই না?'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি শুধু বলে—'হ্যাঁ।'

কিন্তু সেরে ওঠবার পরেও আমায় এমনি ভালোবাসবে তো—আমাকেই বিয়ে করবে তো?—ছেলেটির এই আবেগ জড়ানো প্রশ্নে মেয়েটিও আর সংযত রাখতে পারে না নিজেকে। একই রকমের চিন্তায় তারও মন যে আগে থেকেই একান্তভাবে ক্লিষ্ট। ঝরঝর করে একেবারে কেঁদে

ফেলে সে। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে।.......কিন্তু কী মধুর সে কান্না!

তারপর কি হলো?—শেষ পরিণতি জানবার জন্যে অধীর আগ্রহ পঞ্চাননের।

তারপর মেয়েটি কোনো এক স্যানাটোরিয়ামে বছর খানেক থেকে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ফিরে আসে। এবং এই ভালো হওয়ার বছরখানেক পর ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে যায়।

বাঃ, এতো দেখছি আমেরিকায় কোনো রকম ঘৃণা বা বিরূপতাই নেই টি-বি রোগী সম্বন্ধে। তা থাকলে কি জেনে শুনে গায়ে পড়ে কেউ বিয়ে করে টি-বি-রোগ গ্রস্ত মেয়েকে? —পঞ্চানন অবাক হয়ে যায় এ কাহিনী শুনে। দীর্ঘকাল সে টি-বি-তে ভুগছে। তার রোগের কথা আর জানতে বাকি নেই কারো। সাধারণ কোনো গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারবে তেমন আশা সে করে না। তাই শান্তনুর আশ্বাসে সত্য সত্যই আশ্বস্ত হয়েছে পঞ্চানন। ব্রাহ্মণ হয়েও ফুল্লরা সাহাকে সে বিয়ে করবে, মনে মনে সে তাই স্থিরও করে ফেলেছে। সংসার-বন্ধন তেমন কিছুই নেই তার। একালে সামাজিক অনুশাসনও একরূপ অর্থহীন। অসবর্ণ বিবাহ ব্যপারে আইনগত বাধাও অপসারিত। কোনোদিক থেকেই চিন্তার কিছু নেই পঞ্চাননের। বাল্যে পিতৃহারা, মা-ও তার কাশীবাসিনী। একমাত্র পুত্রের কুশল সংবাদটুকু ছাড়া আর কোনো খবরই জানতে চান না তার মা। পঞ্চাননও

প্রতি মাসে মাকে একখানি করে পত্র দিয়ে তার কর্তব্য করে যায়, অন্য কোনো খবরাখবর জানিয়ে তাঁর ঈশ্বরচিন্তার পথে বিঘ্নসৃষ্টি করা সংগত মনে করে না।

হ্যাঁ, একটা দুর্ভাবনা পঞ্চাননের মগজে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিলো কদিন ধরে। বিয়ের পর যে আর্থিক ঝুঁকি এসে পড়বে তা সে সামলাবে কি করে, সেই চিন্তা।

সে চিন্তা থেকেও তাকে মুক্তি দেয় শান্তনু।

আরে বাঃ, সে সব ভাবনা তো পুরোটাই ফুল্লরার। আনন্দের জোয়ারে এমনি ভাসিয়ে দিয়েছো নিজেকে, যে ভালো করে পড়েও দেখো নি চিঠিখানা। এই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে, ফুল্লরার গনেশ এ্যাভিনুর নিজস্ব বাড়িতে থাকবে তোমরা। ব্যাংক থেকে মাসে মাসে যে সুদ আসবে তা দিয়ে মোটামুটি বেশ ভালোভাবেই চলে যাবে তোমাদের। এর পরেও আবার কি চাই বলো।

কোথায়, কোথায় লেখা রয়েছে এসব ?—বলেই শান্তনুর হাত থেকে পঞ্চানন টেনে নেয় ফুল্লরার চিঠিখানা। তারপর শান্তনুর কথায় চিঠির উল্টো পিঠে পুনশ্চমার্কা লেখাটুকু পড়ে দেখে, সত্যি! সে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাসির ঔজ্জ্বল্য যেন পঞ্চাননের মুখ থেকে মুছে ফেলে টি-বি রোগের সমস্ত কালিমা। চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল্ করে ওঠে। নানা কারণে কৃতজ্ঞতায় সারা অন্তর তার ভরে ওঠে শান্তনুর প্রতি। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই প্রশান্ত মনে সে বিদায় নেয় শান্তনুদের ঘর থেকে।

শান্তনুও বেরোয় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বেশ চলো। ফুল্লরার কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা তোমার ওপর, সে কথা জানো শান্ত? আমার কাছে কথায় কথায় একদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলো সে তোমার।—সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে আসতে পঞ্চানন বলছিলো শান্তনুকে।

হ্যাঁ, ফুল্লরা আমায় শ্রদ্ধা করে সে আমি জানি। শ্রদ্ধা করে বলেই এক কথায় 'নবারুণ'-এর প্রতিটি সংখ্যা ছাপানোর খরচ সে দিয়ে আসছে এ অবধি। টি-বি রোগীদের মুখপত্র বলে শ্রীলক্ষ্মী প্রেস নাম-মাত্র মূল্যে 'নবারুণ' ছেপে দেয় বটে, তবু প্রতি সংখ্যার জন্যে পঞ্চাশটি করে টাকা দিতে হয় প্রেসকে। এতোগুলো টাকার দায়িত্ব বহন করা একজনের পক্ষে বড়ো কম কথা নয়। এতোদিন ধরে ফুল্লরা সে টাকা অকুণ্ঠভাবেই দিয়ে আসছে।

তাই নাকি? এসব আমি কিছুই জানি না!

ফুল্লরার ইচ্ছে নয় যে, কেউ তা জানে। তাই কাউকেই একথা জানতে দেওয়া হয় নি। শুনে আরো অবাক হবে, 'নবারুণ'-এর আসন্ন সংখ্যা ছাপানোর খরচও সে হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার আগে গোপনে একখানা চেক পাঠিয়ে আমায় দিয়ে গেছে। এসবই তার উদারতার পরিচয়। কিন্তু হঠাৎ তোমার কাছে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার তো কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না!

বাঃ, একি অদ্ভুত কথা বলছো তুমি? তোমার মধ্যে

প্রশংসনীয় অনেক কিছু লক্ষ্য করেছে বলেই তো তোমার প্রতি তার এতো শ্রদ্ধা, তোমার মহৎ কাজে তার আন্তরিক সহযোগিতা। 'নবারুণ' প্রকাশে ফুল্লরার যে আর্থিক সাহায্য তা আমার মনে হয় আর কিছুই নয়, তোমার প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সামান্য প্রণামী।

এ কথায় হেসে ফেলে শান্তনু। হাসতে হাসতেই বলে, ফুল্লরা অত্যন্ত গভীরভাবে তোমায় ভালোবাসে, তাই তার কোনো প্রসংগ নিয়ে আলোচনায় তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠো। আমার প্রতি ফুল্লরার শ্রদ্ধার বিষয়টিও সেই উচ্ছ্বাসের রূপ নিয়েই প্রকাশ পায় তোমার মুখে।

এমনি সব বলতে বলতে পঞ্চানন আর শান্তনু হাস-পাতালের লনে এক কোণায় বসে পড়ে নিরিবিলিতে।

॥ আট ॥

আগের প্রসংগেরই জের টেনে পঞ্চাননই নতুন করে আবার শুরু করে আলোচনা। ফুল্লরা যে তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফুল্লরা ভালো হয়ে বাড়িতে ফিরে গেছে, আর তাকে যদি দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকতে হয় তাহলে ফুল্লরার সেই ভালোবাসা কতোটা স্থায়ী হবে তাই হলো চিন্তার কথা। প্রিয় বান্ধবীর কাছ থেকে ঐ রকম পত্র পেয়েও কোনো

কিছুই তাই ঠিক করে উঠতে পারছিলো না পঞ্চানন। তার জন্যেই তো সে শান্তনুর কাছে পরামর্শ প্রার্থী।

আচ্ছা ভাই শান্তনু, তোমার কি মনে হয় না, তাড়াতাড়ি আমি যদি ছাড়া না পাই তাহলে আমার ছবি মুছেও যেতে পারে ফুল্লরার মন থেকে।

না, তা হতেই পারে না। অন্তত ফুল্লরার যে চিঠিখানা তুমি আমায় দেখালে তার ভাব ও ভাষা থেকে এমন অনুমান করা সংগত হবে না।—বেশ জোরের সঙ্গেই শান্তনু এ আশ্বাস দেয় পঞ্চাননকে।

কিন্তু এমনও তো স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বোধ করার পর একজন পুরনো রোগীর প্রতি ফুল্লরার আর আসক্তি না-ও থাকতে পারে।

তোমার একথাও আমি মেনে নিতে পারছি না পঞ্চানন। তোমার একথা শুনেই আমাদের এই হাসপাতালেরই একটা বেশ মজার ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

দীননাথ হাসপাতালের মজার ঘটনা! কবেকার কথা, বলতো?—খুব উদগ্রীব হয়েই জিগ্যেস করে পঞ্চানন।

সেই যে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া ছাত্র সুকৃতি পালের কথা। মনে পড়ে তোমার?

না, এ নাম আমার একেবারেই অপরিচিত। তা হোক, তবু বলো গল্পটা শোনা যাক।—পঞ্চাননের তাগিদে হাসপাতালের ঐ পুরনো কাহিনীটি শেষপর্যন্ত বলতেই হয় শান্তনুকে। বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়েই সে বলে।

আমার কয়েকমাস পরেই একটি ছাত্র এসে ভর্তি হলো আমাদের ওয়ার্ডে। কালো, লম্বা, রোগা চেহারা। সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে সে চেহারার মধ্যে আকর্ষণ করার মতো কিছুই নেই। শুধু বড়ো বড়ো দুটি চোখে কেমন একটা স্বপ্নের মায়া-জড়ানো। চোখ দুটির দিকে তাকাতেই আমার হারিয়ে-যাওয়া ছোট ভাইটির ছবি ভেসে উঠলো আমার সামনে। দুজন মানুষের চোখের মধ্যে যে এমন মিল থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি নি। আজও তা আমার কাছে এক পরম বিস্ময়!—বলতে বলতে জল-টলটল হয়ে ওঠে শান্তনুর চোখ দুটি।

দেখা হতেই তাকে তুমি ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবেসে ফেললে তো, যেমন তুমি করে থাকো?

অনেকটা তাই। সাধারণত যা হয়ে থাকে, নতুন রোগী এলেই ওয়ার্ডের পুরোনো রোগীরা তাঁকে ঘিরে ধরে। তিনি কি করতেন, কতোদিন অসুখ হয়েছে, কতোদিনের চেষ্টা-তদ্বিরে বেড পাওয়া গেলো এমনি সব বিষয়ে নানা জনের নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় নবাগতকে। সুকৃতিকে কাছে পেয়ে আমরাও একদিন সকাল বেলায় প্রায় আট-দশ জন মিলে তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

তারপর?

তারপর? কথায় কথায় তার কাছ থেকে জানা গেলো, মাত্র মাস ছয় হলো তার অসুখ করেছে। অসুখ নিয়েই সে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তখনো রেজাল্ট আউট হয় নি।

বয়েস কত হবে ছেলেটির ?—গভীর সহানুভূতিপূর্ণ ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে পঞ্চানন। টি-বি হাসপাতালে অল্প বয়েসের ছেলেমেয়েদেরই তো ভিড় বেশি। বিশেষ করে সে জন্যেই এ রোগটা এতো বেশি দুঃখের কারণ। রোগীর বয়েসের প্রশ্নটাও তাই সব চেয়ে আগে মনে আসে।

তার বয়স আর তেমন কি বেশি হবে, এই ধরো কুড়ি কি একুশ। তাকে আমরা যথারীতি সাহস দিলাম, সান্ত্বনা দিলাম, ভরসা দিলাম। বললাম, 'কোনো ভয় নেই, মাস ছয়েকের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে। এ রকম তো কতো হচ্ছে।'

তোমাদের কথায় খুব আশান্বিত হয়ে উঠলো ছেলেটি, তাই না ?

অনেকটা তাই। তবে আমাদের আশ্বাস পেয়ে আশার সঙ্গে একটু সন্দেহের ছোয়া লাগিয়েই সুকৃতি বললে, 'সত্যি বলছেন, ভালো হয়ে যাবো ছ'মাসের মধ্যে ?'

কী উত্তর দিলে তোমরা সুকৃতির এ প্রশ্নে ?

এ প্রশ্নের কীইবা আর উত্তর দেবার আছে ? আমি মনে মনেই শুধু বললাম, 'সে কথা কে বলতে পারে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' তবে মুখে জোরের সঙ্গেই বলতে হলো, 'নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। আলবৎ ছ'মাসের মধ্যেই ভালো হবে।'

কিন্তু আমার যে রক্ত উঠছে! আগেও অনেক রক্ত উঠেছে!—সুকৃতি খুব ভয়ে ভয়ে বললে।

ও, তার বোধ হয় ধারণা হয়েছিলো, কাশির সঙ্গে যখন বেশি রক্ত উঠেছে তখন তার বুকের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ।—সুকৃতির কথার ওপর নিজের অনুমান প্রকাশ করে পঞ্চানন।

হ্যাঁ তাই। আমরা তখন তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, রক্ত-ওঠার পরিমাণ দেখে রোগের অবস্থা ঠিক ধরা যায় না। এমন হয়, অল্প অসুখেও অনেক সময় প্রচুর রক্ত এসে পড়ে আবার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি অবস্থাতেও রক্ত একেবারে না-ও উঠতে পারে। একমাত্র এক্স-রে ফটোতেই রোগের অবস্থা ঠিক মতো ধরা পড়ে।

সুকৃতি বললে, 'আমার এক্স-রে ফটোটা একটু দেখবেন। এইমাত্র ওয়ার্ড অফিসে জমা দিয়ে এলাম।'

আমি জানালাম, 'ও সব দেখা আমাদের নিষেধ। তা ছাড়া দেখে বুঝতেও তেমন কিছু পারবো না। এক্সরে রিডিং খুবই শক্ত ব্যাপার। ডাক্তারবাবুরাও অনেকে ভালোমতো পারেন না।'

তোমার কথায় বেচারা বোধহয় খুব ঘাবড়ে গেলো?—পঞ্চানন তার অনুমান প্রকাশ করে।

ঠিক ঘাবড়ে না গেলেও সুকৃতি এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকালে যার মধ্যে একটা হতাশার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো ভবানী রায়। তারও পড়তে পড়তেই অসুখ করেছে এবং বেশ কিছুদিন হলো সে হাসপাতালে এসেছে। সুকৃতির হতাশ দৃষ্টি দেখে

তার বোধ হয় খুব করুণা হলো। 'আচ্ছা দাড়ান, আমি এক্সরে রিপোর্টের খবরটা নিয়েই আসছি'—বলেই ওয়ার্ড অফিসের দিকে সে ছুটে গেলো।

তারপর ?

একটু পরেই ভবানী ফিরে এসে বললে, 'কোনো ভয় নেই। ডাঃ গুপ্ত বললেন, কেভিটি হয় নি—শুধুই ইনফিলট্রেশন। এক কোর্স এ্যান্টিবায়োটিক দিলেই ভালো হয়ে যাবেন।'

এ শুনে নিশ্চয়ই সে একটু আশ্বস্ত হলো। তাই না ?—স্বকৃতির কাহিনী শুনতে শুনতে পঞ্চানন নিজের প্রসংগই যেন ভুলে গেছে। তাই সে স্বকৃতি সম্বন্ধেই বার বার প্রশ্ন তোলে।

হ্যাঁ, ভবানীর কথা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই স্বকৃতি বিদায় নিলে। আর বাস্তবিক পক্ষে সে সেরেও উঠলো বেশ তাড়াতাড়ি। অবশ্য এ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে সঙ্গে পি. পি.-ও করা হচ্ছিলো তাকে। পি. পি. মানে তো বুঝতেই পাচ্ছো—ঐ নিউমোপেরিটোনিয়াম অর্থাৎ পেটের ক্যাভিটিতে বাতাস দিয়ে ফুসফুসকে বিশ্রাম দেবার আধুনিক ব্যবস্থা। তাতেই কয়েকমাসের মধ্যে স্বকৃতির প্রায় সব রোগলক্ষণই দূর হয়ে গেলো।

বাঃ বেশ সহজেই তো তাহলে ছেলেটি মুক্তি পেলে! উচ্চ শিক্ষিত এমন একটি মূল্যবান জীবন এই কাল-রোগের কবল থেকে এতো অল্পদিনের মধ্যেই যে রেহাই পেয়ে গেলো, এ সত্যি খুব আনন্দের কথা। কিন্তু এর সঙ্গে আমি যে

বিষয় নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তার কি সম্পর্ক ?—এতোক্ষণে ফের আবার পঞ্চাননের মনে পড়ে তার নিজের আর ফুল্লরার কথা।

আগে শোনোই না সবটুকু। সম্পর্ক আছে বৈ কি। আমি কি আর মিছামিছিই সুকৃতির ব্যাপারটাকে মজার ঘটনা বলে উল্লেখ করেছি। সেই মজার ঘটনার কিছুই তো আসলে এখনো বলা হয় নি।

বেশ, বলো বলো।—শান্তনুর তাড়া খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যায় পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং মজার ঘটনাটি ভালো করে বলতে বন্ধুকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানায়।

শান্তনু বলে চলে :

সুকৃতি কেমন যেন একটু অমিশুক প্রকৃতির ছেলে। মাস তিনেকের মধ্যেও হাসপাতালে কারো সঙ্গেই তার তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি। সে কেবল শুয়ে শুয়ে আপন মনে বই পড়ে, শুধু মাত্র বিকেল বেলাটায় একটু বাইরে গিয়ে হয় মাঠের এধার ওধারে সামান্য ঘোরাফেরা করে আর নয়তো এক কোণায় ঘাসের পরে একা একা চুপটি করে বসে থাকে। সে সময়েও সঙ্গে তার বই থাকে একখানা। বসে বসে কখনো বই পড়ে, কখনো কখনো আকাশের দিকে চেয়ে থাকে আর কি যেন ভাবে। এই আকাশমুখী সুকৃতিকে দেখলেই মায়া হতো—ভারি বিষণ্ণ দেখায় তাকে সে সময়। সে ভালো হয়ে উঠছে, তা সত্ত্বেও তার এই অকারণ বিষাদ যে কেন তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু ভাই, এ রকম বিষণ্ণতা তো অনেক কারণেই হতে পারে। টি-বি রোগীর দুশ্চিন্তার দুর্ভাবনার কারণের কি আর অন্ত আছে?—শান্তনুর কথা শুনে পঞ্চানন বলে।

ও নিয়ে আমিও অবশ্য তেমন কিছু মাথা ঘামাতুম না প্রথম প্রথম। সুকৃতি সম্বন্ধে এক একজন এসে এক-একরকম কথা বলতো, আমি সে সব এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা ছুটতে ছুটতে অনিল এসে যা বললে তা আর উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

কি বললে অনিল?

সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—'ভালোদা, দেখবে এসো সুকৃতি কেন জানি কাঁদছে।'

'কাঁদছে!'—আমি খুবই বিস্মিত হলাম অনিলের কথা শুনে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর টবর আসে নি তো—কেউ আবার মারাটারা গেলেন কি না কে জানে!

তারপর কি হলো?—পঞ্চানন একটু বিস্তারিত ভাবেই ঘটনাটি জানতে চায়।

তারপর যা স্বাভাবিকভাবে হতে পারে তাই হলো। আমি গেলাম সুকৃতিকে দেখতে। গিয়ে দেখলাম বালিসে মুখ গুঁজে সে শুয়ে আছে। এবং সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে।

সুকৃতিকে বললে না কিছু? না, এ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ

কয়াটা ভালো বোধ করলে না বুঝি!—আবার প্রশ্ন তোলে পঞ্চানন।

না, আমি কোনো রকম ইতস্তত না করেই তার একেবারে কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলাম—বলো না ভাই সুকৃতি কি হয়েছে তোমার, বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর আসে নি তো?

না, না—ওসব কিছু নয়।—সুকৃতি তাড়াতাড়ি উঠে বসে দুহাতে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সলজ্জ ভাবে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে। পরে ধীরে ধীরে জানা গেলো সব। তার পরীক্ষার ফল বার হয়েছে। সে থার্ড ক্লাস পেয়েছে, তাই তার এতো দুঃখ।

সে কি হে, টি. বি রোগী পাশ করে যে বেরিয়ে এসেছে তাইতো ঢের। তার ওপর আবার কথা!—পঞ্চানন মন্তব্য করে।

হ্যাঁ, সে বিষয়টি জানবার পর অনিলও ঠিক এমনি ধরণের কথাই বলেছিলো। বিকেল বেলা সুকৃতির ভগ্নীপতি এসে তাকে পাশের সুখবরটা জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি তাঁর এই খবর দেবার পরিণাম এমন দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর থেকেই যখন সুকৃতি কান্না শুরু করলো তখন তার ঘরের অন্য রোগীরা সব হতভম্ব। অনিলও তার ঘরেরই রোগী। সুকৃতির কান্নার আসল কারণটা সে যখন শুনলে সে তার সামনে এসে

বললে—ও এই কথা। অসুখ নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন, পাশ করেছেন। তবু কান্না! আশ্চর্য ছেলে তো!

আর তুমি কি করলে?

আমিও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ইংরেজিতে কজনই বা আর ফার্স্ট ক্লাস পায়। অসুখের জন্যে নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে ভালো ভাবে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি। এ অবস্থায় পাশ যে করেছো তাইতো কৃতিত্বের কথা। বি-এতে কোন ক্লাস পেয়েছিলে ভাই?

বি-এ পরীক্ষাটাও নানা রকম অসুবিধের মধ্যেই দিয়েছিলাম। তবু একটা সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিলাম ইংলিশ অনার্সে। এটা শেষ পরীক্ষা। তাই ফার্স্ট ক্লাস পাবার জন্যে অনেক খেটেছিলাম। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেলো। অবশ্যি পরীক্ষা দিয়েই আমি বুঝেছিলাম, পরীক্ষা ভালো হয় নি। তবু বোকার মতোই হয়তো ভালো ফলের জন্যে একটা মিথ্যে আশা পোষণ করছিলাম এতোদিন ধরে।—নতমুখে সুকৃতি এই উত্তর দিলে আমার প্রশ্নের। তারপর একটু ম্লান হাসি হাসলো। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যেই আমি একটা প্রস্তাব দিলাম। বললাম—বেশতো, ভালো হয়েই আবার না হয় অন্য আর একটা বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। তাতে নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাবে। এ জন্যে আর এতো দুঃখ করার কি আছে!

সুকৃতির কাছ থেকে কি জবাব পেলে?

সে ভাই এমনই এক মন-মরা উত্তর যে কি আর বলবো!

হতাশ ভাবে সুকৃতি বললে : আবার নতুন করে -নতুন বিষয়ে পরীক্ষা দেবার আর কথাই ওঠে না। তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এতো দিন ধরে অনেক কষ্টে পড়াশুনো চালিয়ে এসেছি। আর নয়। থার্ড ক্লাস এম-এর যা ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত সেই আশি টাকা মাইনের ইস্কুল মাষ্টারি করে সারা জীবন কাটাতে হবে। তা-ও এই অসুখের পর ছ'ঘণ্টা বকবক করতে পারবো কিনা কে জানে?—পঞ্চাননের আগ্রহ মেটাতে সুকৃতির জবাব প্রায় যথাযথই শুনিয়ে দিলে শান্তনু। তারপর আবার নিজের কথায় ফিরে এলো। বললে, সুকৃতি যা বলেছে তা মোটেই উড়িয়ে দেবার নয়। তবুও তাকে আমরা নানা-ভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। ভবিষ্যতের অনেক রঙিন ছবিও তার সামনে তুলে ধরলাম। শেষ অবধি এই থার্ড ক্লাস পেয়ে পাশ করার জন্যেই চা-সিঙাড়া খাওয়াবার দাবি জানিয়ে তাকে খানিকটা চাঙা করে তুললাম।

কিন্তু সে তো হলো, তবে এ ব্যাপারে আমার আশ্বাস পাওয়ার মতো কি আছে তাতো বুঝতে পারছি না।—পঞ্চাননের কথায় আবার নৈরাশ্যের সুর ফুটে ওঠে।

আরে ভাই এতো অস্থির হলে কি চলে? আসল কাহিনীটি এবার বলছি। ঘটনাটা একেবারে প্রত্যক্ষ বলেই তো তোমায় অমন জোরের সঙ্গে ভরসা দিতে পারছি যে, ফুল্লরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও তোমায় সে ভুলবে না—তোমায় পেতে চাইবে।

বেশ, তাহলে বলো সেই আসল গল্প।

হ্যাঁ, এ হলো সুকৃতির ঐ কান্নাকাটির মাসখানেক পরের ঘটনা। দুপুর বেলা বেশ মোটামুটি একটা লম্বা ঘুম দিয়ে তিনটের পর ওয়ার্ডের বাইরে একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। বসে বসে ভাবছি পিয়ন আসতে আজ এতো দেরি করছে কেন। এরকম দেরি তো অন্যদিন করে না। বাস্তবিক পক্ষে পিয়নের পথের দিকেই আমি তাকিয়ে-ছিলাম।—এমনিভাবে ভূমিকা করে শান্তনু বলে চলে সুকৃতির জীবনের অনুপম প্রেমের বর্ণনা। পঞ্চানন নির্বাক হয়ে শোনে। শুধু নির্বাক নয়, নির্বাক এবং নিশ্চল হয়ে। একবার কেবল জিজ্ঞেস করে, তারপরে কি হলো?

তাই বলছি, পিয়নের আশায় পথ চেয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে আসতে দেখলাম। এ সময়ে সাধারণত রোগীদের ভিজিটররা এসে থাকেন। বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ভিজিটিং আওয়ার্স। ধরে নিলাম, কোনো রোগীর আত্মীয়া হবে মেয়েটি। কিন্তু তাহলেও এমনিভাবে সে একা একা আসবে কেন? আবার মনে হলো হাসপাতালের আশেপাশেই কোথাও বাড়ি হবে হয়তো। এমনি ধারায় ভেবে চলেছি, মেয়েটিও এগিয়ে আসছে। ভালো ভাবে লক্ষ্য করে আন্দাজ করা গেলো, আঠারো উনিশ বয়েস হবে মেয়েটির। দেখতে বেশ সুন্দরী। এবং স্বাস্থ্যবতীও। এর আগে আর কোনো দিন আমি এই মেয়েটিকে এই হাসপাতালে আসতে দেখেছি এমন কথা মনে করতে পারলাম না।

মেয়েটি সোজাসুজি আমার কাছেই এসে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলে—এটা কি স্যার রিচার্ড বি-ও ওয়ার্ড ?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ।

আচ্ছা, এখানে সুকৃতি পাল নামে কোনো পেশেণ্ট আছেন ?

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ আছেন, আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটিকে সুকৃতির কাছেই নিয়ে গেলাম।

সুকৃতি কি একটা বই পড়ছিলো। মেয়েটিকে দেখে তড়াক করে উঠে বসে বললে—একি তুমি এখানে ? তোমার বাবা জানতে পারলে যে ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। যাও, তুমি এক্ষুণি চলে যাও।

মেয়েটি ব্যাকুল ভাবে বললে—তুমি এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁকে বলেই আমি এসেছি।—এ পর্যন্ত বলেই মেয়েটি থেমে গেলো।

আমার সামনে আর কথাবার্তা হয় মেয়েটি বোধহয় তা চাইছিলো না। সুকৃতির ও নিশ্চয়ই তা অভিপ্রেত ছিলো না। থাকার কথাও নয়। যেটুকু কথাবার্তা ঝড়ের বেগে হয়ে গেলো তা নেহাৎ-ই উত্তেজনার মুহূর্তে। সে মুহূর্তটি শেষ হয়ে যেতেই দুজনের চোখে মুখে কেমন একটা সলজ্জভাব ফুটে ওঠে। তা বুঝতে পেরেই আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম। সুকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দাঁড়ান,

আমরাও যাচ্ছি। তারপর তাড়াতাড়ি মশারির স্ট্যাণ্ড থেকে জামাটা তুলে নিয়ে পরতে পরতে নিচু গলায় মেয়েটিকে ডাকলে—এসো, বাইরে এসো। বাইরেই কথা হবে।

সুকৃতির ঐ নিচু গলার কথা কয়টি শুনেও আমি না শোনারই ভাব দেখালাম। আমার পিছন পিছনই তারা ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। চলতে চলতে আরো শুনলাম, সুকৃতি বলছে—তোমায় কতোবার বলেছি টি-বি রোগীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সত্যি নেই। তবু তুমি এসেছো, আশ্চর্য!

তার পরেই আমি এক দিকে, ওরা আর এক দিকে।

কিন্তু শান্তনু ভাই, এতো বলা সত্ত্বেও তোমার সেই আসল ব্যাপারটি তো এখনো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে না। —পঞ্চানন এবার যেন অস্থির হয়েই একথাটুকু বলে ফেলে। শান্তনুর কথায় আন্দাজ করে এতোক্ষণ ধরে সে সুকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করে আসছে। তার জীবনে যেমন ফুল্লরা এসেছে, সুকৃতির জীবনে এই মেয়েটিও হয়তো তেমনি। কিন্তু শান্তনু সে কথা স্পষ্ট করে বলছে কোথায় এবং ফুল্লরা যে ভালো হয়ে উঠেও তার কথা মনে রাখবে—তাকে একান্ত আপন করে পেতে চাইবে সে আশ্বাসই বা কই? এ পর্যন্ত তার কোনো হদিস করতে না পেরে পঞ্চাননের এই অস্থিরতা।

শান্তনু আর একটু ধৈর্য ধরতে বলে পঞ্চাননকে।

আরে ব্রাদার 'ধীরে রজনী ধীরে'। এতো অস্থির হলে

কি চলে ? নিরাশার অন্ধকারে যে-মন তোমার ডুবে গিয়েছিলো সে মনকে আবার ঘোলো আনা আশার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে কিছুটা সময় লাগবে বৈকি ! অমাবস্যার পরের রাতেই কি আর পূর্ণচন্দ্রের দেখা পাওয়া যায় ভাই। একটু একটু করেই তার দেখা মেলে—পক্ষকাল পরে তার পূর্ণদর্শন।

ঠিক আছে ভাই, উপমা-অলংকারের গুহা-গহ্বরে একবার গিয়ে ঢুকে পড়লে তোমাকে যে সেখান থেকে টেনে বার করে আনা আমার কর্ম নয় সে আমি বেশ ভালো করেই জানি। কাজেই সে দিকে আর বেশিদূর যাবার দরকার নেই। আমি আর একটি কথাও বলবো না, শুধু এটুকুই বলছি, সুকৃতির যে দৃষ্টান্তটি তুমি আমার সামনে তুলে ধরছো তা থেকে পুরোপুরি আশ্বাসই আমি পেতে চাই আমার ফুল্লরা সম্পর্কে।—পঞ্চানন চুপ করে যায় এই বলে।'

নিশ্চয়ই, তুমি সে আশ্বাস পাবে পঞ্চানন এই কাহিনী শুনে। আমি বলছি, তুমি শুনে যাও একমনে।—সুকৃতির প্রেম কাহিনীর বর্ণনা আবার শুরু করে শান্তনু।

তারপর থেকে মেয়েটি প্রতি সপ্তাহেই আসতে থাকে সুকৃতির কাছে। সে এলেই সুকৃতি তাকে নিয়ে বাইরের মাঠে গিয়ে বসে। সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে তবু তাদের গল্প শেষ হয় না। কী যে এতো কথা তাদের তা ভগবানই জানেন ? দিনের পর দিন আমরা দূর থেকে শুধু দেখতাম, দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে তারা কেবল কথার মালা গেঁথে চলেছে।

ক্রমে ক্রমে ভেতরের ঘটনাটা জানা গেলো। প্রাইভেট

পড়িয়ে নিজের কলেজের পড়া-খরচ চালাতো সুকৃতি। এই মেয়েটিরই প্রাইভেট টিউটর ছিলো সে। তার গোটা স্কুল-জীবনটি কেটেছে সুকৃতির গৃহ-শিক্ষকতায়। সে সময়ই তাদের মন জানা-জানি, মন দেয়া-নেয়া। মেয়েটির নাম মণিকা। ক্রমে মণিকার বাপ-মায়ের কানে এলেও এ বিষয়ে কোনো কিছু না জানারই ভান করে রয়েছেন তাঁরা। মেয়েকে কখনো কোনো রকম বাধা দেন নি, সুকৃতিকেও কিছু বলেন নি। ভেবেছেন, ছেলেটি এম-এ পাশ করে বেরোলে নেহাৎ একেবারে খারাপ পাত্র হবে না। একটু কালো, দেখতেও তেমন যে একটা কিছু ভালো তাও নয়। তাহলেও মেয়ের যদি তাকে ভালো লেগে থাকে তবে তাঁদের আর আপত্তি করার কী দরকার, এই ভাব।

কিন্তু আপত্তি সত্যি দেখা দিলো সুকৃতির টি-বি হয়েছে এ কথা জানার পর। মণিকা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সময়ে এই টি-বি-র খবর চঞ্চল করে তোলে মণিকাকে। পালিয়ে পালিয়ে সে সুকৃতিদের বাড়িতে চলে যায় তাকে দেখতে। কিন্তু বেশিদিন আর লুকোনো থাকে না সে কথা। মণিকার বাবা সব টের পেয়ে তাকে তো বকাবকি করেনই, একদিন সুকৃতিকেও এসে বেশ কিছু নরম গরম কথা শুনিয়ে যান। এই অপমানের বেদনা অসহ্য হয়ে বেঁধে তাকে। তারপর দিনই মণিকা সুকৃতিকে দেখতে এলে যা-তা বলে সে তাড়িয়ে দেয় তাকে।

এরপর মান-অভিমানের পালা চলে কিছুদিন ধরে।

মণিকার আর আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হয় না। সুকৃতি এম-এ পরীক্ষাটা দেয় বটে, তবে অনেক জানা প্রশ্নেরও সে ভুল উত্তর দিয়ে আসে। ফলে তার রেজাল্টও দাঁড়ায় তেমনি। সুকৃতি হাসপাতালে আসার পর থেকে অবস্থা সত্যি সত্যি নাকি ক্রমশই শোচনীয় হয়ে ওঠে মণিকার। তার বাবা-মাও খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন তাই দেখে। আর কোনো উপায় না দেখে এবং একটা বিপর্যয়কর কিছু ঘটে যেতে পারে এই আশংকায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটা বোঝাপড়ায় আসতে হয় মেয়ের সঙ্গে। সেই সুযোগ নিয়েই মণিকা প্রথম দিন হাসপাতালে এসেছিলো সুকৃতির সঙ্গে দেখা করতে। পরে যে প্রতি সপ্তাহেই অন্তত একবার করে তার হাসপাতালে আসা সে হয়তো পালিয়ে পালিয়ে আসাও হতে পারে, তার বাবা-মাকে জানিয়ে আসাটাও খুব বিচিত্র নয়। কারণ, তার প্রেমের নিষ্ঠার কাছে, তার মনের দৃঢ়তার কাছে তার বাবা-মাকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়েছিলো বলেই তো মণিকা প্রথমদিন দীননাথ হাসপাতালে ছুটে আসবার সুযোগ পেয়েছিলো।

এই তোমার গল্পের শেষ কথা! ফুল্লরাও তাহলে আমার কাছে ছুটে আসবে মণিকার মতো বলতে চাও?—পঞ্চানন আর চুপ করে থাকতে পারে না, হঠাৎ প্রশ্ন তুলে বসে।

না বন্ধু, এই আমার গল্পের শেষ কথা নয়। তবে শেষ অধ্যায়ের যেটুকু আমি জানি তা খুবই সংক্ষিপ্ত।

বলো, বলো।—সবটুকু বলার জন্যে পঞ্চানন তাড়া দেয়

শান্তনুকে। শান্তনুও খুব সংক্ষেপেই উপসংহার টানে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ঘরে ফেরবারও যে তাড়া।

হ্যাঁ প্রতি রবিবারই মণিকা হাসপাতালে সুকৃতিকে দেখতে আসতো। তাদের মধ্যে কী এতো কথাবার্তা হয় তা জানবার জন্যে প্রায় সব পেশেন্টেরই কৌতূহল ছিলো অন্তহীন। কিন্তু বিশেষ কিছু জানার তেমন কোনো উপায় ছিলো না। সুকৃতি তার প্রেমচর্চা সম্বন্ধে কারো সঙ্গেই তেমন কোনো আলাপ-আলোচনা করতো না। বয়েসে সুকৃতি ছিলো আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই যতোই তাকে ভালোবাসি না কেন আমার পক্ষে এ সব বিষয়ে কিছু তাকে জিজ্ঞেস করা সম্ভব ছিলো না। আরো অনেকের মতো সেও আমাকে 'ভালোদা' বলেই ডাকতো—আমিও দাদার সম্ভ্রম রক্ষা করেই চলতাম তাদের কাছে। সুকৃতি ও মণিকার ভেতরকার যা কিছু খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে তার সবটাই আমরা পেয়েছি অনিলের মাধ্যমে। অনিলও আমাকে 'ভালোদা' বলেই ডাকে। তবে সে আমার প্রায় সমবয়সী, আবার সুকৃতিরও খুব অন্তরংগ এবং একই রুমে তাদের বাস। একমাত্র তারই কাছে সুকৃতি তাদের প্রেমলীলার ছিটেফোঁটা প্রকাশ করতো। একদিন অনিলের মুখ থেকেই শোনা গেলো, সুকৃতি ভালো হয়ে যাবার দুবছর পর মণিকার সঙ্গে তার বিয়ে হবে ওদের দুজনের মধ্যে পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে।

আটমাস কাল হাসপাতালে কাটিয়ে সুকৃতি একরকম পুরোপুরি সুস্থ হয়েই একদিন বাড়ি চলে গেলো। আরো

কয়েক মাস পরে হঠাৎ অনিল একখানা চিঠি পেলো তার কাছ থেকে। তাতে সে জানিয়েছে, বাইরে এসে স্বাস্থ্য তার আরো ভালো হয়েছে। মণিকার সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হয়। তার বাবা-মা এসেও খোঁজ-খবর করেন, খরচাপত্রও করেন তার জন্যে। বিয়ের জন্যে সুকৃতি ও মণিকাকে ছুবছর হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না, এমন আশার কথাও রয়েছে ঐ চিঠিতে।

বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাহলে মণিকার সঙ্গে সুকৃতির!—সংশয়ের অন্ধকার থেকে হঠাৎ যেন আলোর মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে ফেলে পঞ্চানন। এখানেও শান্তনু একটু সংযত হবার পরামর্শ দেয় বন্ধুকে, অনুল্লাস অপেক্ষার উপদেশ দেয়।

পঞ্চাননের কথার উত্তরে শান্তনু বলেঃ সে আমি ঠিক বলতে পারি না ভাই শেষ পর্যন্ত মণিকার সঙ্গে সুকৃতির বিয়ে হয়েছিলো কিনা। তবে যখনি কোনো প্রেমের প্রসংগ নিয়ে কথা ওঠে তখনি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মণিকার সেই সুন্দর নির্মল মুখখানি। অনিলের কাছ থেকেই শুনেছি, সুকৃতি অন্য কোনো সুপাত্রে মণিকাকে প্রেম নিবেদন করতে বলায় সে নাকি আহত ফণিণীর মতো রেগে উঠেছিলো। বলেছিলো, একটি প্রদীপই একখানি কুটিরকে প্রশান্ত আলোয় উজ্জ্বল করে তোলে—সেখানে অনেক প্রদীপ জ্বালাতে গেলে আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তুমি কি তেমনি আগুনেই জ্বলেপুড়ে মরতে বলছো আমাকে? কী সুন্দর কথা!

স্বকৃতি নাকি মণিকার এ প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিতে পারে নি, তার সঙ্গে একটা পাকাপাকি কথায় আসতে হয়েছে। তাই মনে হয়, প্রেম আজো সত্যিই আছে—এই সন্দেহ সংশয়ের যুগেও আছে! যে প্রেম মানুষকে মাতাল করে, পাগল করে, তার সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি ভুলিয়ে দেয় সেই প্রেম!

এখানেই বক্তব্য শেষ শান্তনুর। পঞ্চাননের মুখ দিয়েও আর কোনো কথা বেরোয় না। সে অভিভূত। তুজনেই অন্ধকার ভেদ করে নীরবে চলে যায় যে যার ঘরে। বাইরের মাঠ তার আগে থেকেই জনশূন্য।

॥ নয় ॥

দিনগুলো যেন বড্ড তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে শান্তনুর। কাজ যে তার জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। কার হাতে 'নবজীবন সমিতি'র ভার সে ছেড়ে দেবে, কে নেবে 'নবারুণ' ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানা পরিচালনার দায়িত্ব সে সব নিয়ে শান্তনু ভাবনায় আকুল। 'নবারুণ'-এর একটি সংখ্যার প্রকাশ আসন্ন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখার্জির একটি লেখা দেবার কথা। সে লেখাটি এখনো হাতে আসে নি, তার জন্যেই যা একটু দেরি। তবে সেদিন এ বিষয়ে হরষিতের প্রস্তাবটি খুবই কাজে লাগিয়েছে শান্তনু।

হরষিৎ বলেছিলো, সুপারের লেখার জন্যে তোমার

আবার কিসের এতো দুশ্চিন্তা—তোমার তো দিদিই রয়েছেন ভাইফোঁটার দিন তো এসে গেলো, সেদিন দিদিকে শক্ত করে ধরে বসবে—দেখবে, তিনিই তোমার জামাইবাবুর কাছ থেকে লেখাটি কেমন তাড়াতাড়ি আদায় করে তোমায় পাঠিয়ে দেবেন।

ক্যাপ্টেন মুখার্জিকে 'জামাইবাবু' তো দূরের কথা 'স্যার' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনেই ডাকার মতো সাহস কোনোদিন হয় নি শান্তনুর। তাহলেও সুপারের গৃহিনীর সঙ্গে তার যেন সত্যিকারের দিদি-ভাই সম্পর্কই দাঁড়িয়ে গেছে এই এক বছরের মধ্যে। সমাজসেবার কাজে ভারি আগ্রহ মিসেস মুখার্জির এবং তাঁর এ কাজে সব সময়ই তিনি সায় পান ক্যাপ্টেন মুখার্জির কাছে। মিসেস মুখার্জির যতো সব জনসেবার কাজ তার প্রায় সবটাই দীননাথ হাসপাতালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর কিছুটা কাজ চলে তাঁর এই হাসপাতালেরই রোগীদের ও কর্মীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। এই কাজের মধ্য দিয়েই শান্তনুর সঙ্গে মিসেস মুখার্জির পরিচয়। শুধু পরিচয় মাত্রই নয়, সেবাব্রতের প্রতি শান্তনুর অকৃত্রিম অনুরাগের জন্যে তার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা যেন অনুভব করে আসছেন মিসেস মুখার্জি। দিদি-ভাই সম্পর্কটাও তাই একরকম প্রথম থেকেই শুরু।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের খাসমহলে যখন তখন রোগীদের যাবার কথা ভাবাও একরূপ অসম্ভব। আর সেই অবস্থায় শান্তনুর গলার স্বর কোনোরকমে একবার শুনতে পেলেই হলো অমনি

দিদি জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে ডাকতে শুরু করবেন—শান্তভাই, তোমায় বেশ কদিন দেখি নি। আমাদের কোয়ার্টারের পাশ দিয়েই যাচ্ছ তবু আসবে না একটিবার? এসো ভাই।

এমন ডাকের পর কি আর না গিয়ে পারে কেউ? শান্তনুও যায়। প্রায়ই যায়। মাঝে ক্যাপ্টেন মুখার্জির সঙ্গেও দেখা হয়। কিন্তু তাঁর মেজাজ ঘরে বাইরে প্রায় সব সময়ই অফিসিয়াল। প্রয়োজনের বাইরে আলাপ-সালাপ বা কথা-বার্তার বড়ো একটা ধার ধারেন না তিনি। তাই শান্তনুকে প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়েও তিনি চুপচাপ। অগত্যা শান্তনুকেই গায়ে পড়ে আলাপ করতে হয় বাড়ির কর্তার অর্থাৎ হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে। ভয় এবং সংকোচকে অগ্রাহ্য করেই সে আলাপ করে। এমনি আলাপ করতে করতেই সুপারের সঙ্গেও শান্তনুর বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে।

তাহলেও শান্তনুর যা কিছু আব্দার, যা কিছু দাবি-দাওয়া সবই তার দিদির কাছে। ক্যাপ্টেন মুখার্জির কাছে কোনো দাবির কথা তুলতে তার আগেও যেমন ভয় ছিলো এখনো তেমনি।

কাজেই 'নবারুণ'-এর লেখাটার জন্যে তাগিদ দিতেও শান্তনুর তেমন সাহস হচ্ছিলো না। শেষে হরবিৎ ভায়াই তাকে বেশ একটা পথ বাতলে দিলে। বাস্তবিকই তার খেয়ালই ছিলো না যে, মাঝে একটা দিন বাদেই ভাইফোঁটা।

হয়রিৎ মনে করিয়ে না দিলে এমনি একটা সুযোগ নিছক মাঠেই মারা যেতো।

যাই দিদির কাছ থেকে ফোঁটাটা নিয়ে আসি গিয়ে।—সকাল বেলায় কোথায় যাচ্ছেন এমন ফিটফাট হয়ে? অরিজিতের এই প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেয় শান্তনু। অরিজিৎ পাঁজা নতুন এসেছে হাসপাতালে, শান্তনুর নতুন রুমমেট। অধিকাংশ সময়েই শান্তনুকে নানা রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে তার সম্বন্ধে গভীর একটা শ্রদ্ধার ভাব এক-মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই পোষণ করতে শুরু করেছে অরিজিৎ। এতো সকালে এমনভাবে সেজেগুজে তাকে সে এর আগে একদিনও বেরুতে দেখে নি। সকালবেলাটা একান্তভাবে লেখাপড়া নিয়েই তাকে কাটাতে দেখে আসছে। 'নবারুণ'-এর গাদাগাদা লেখা পড়া, তার প্রুফ কাটা এবং ঐ পত্রিকার জন্যে নিজের একটি প্রবন্ধ রচনা—তার এতো কাজ। ঐ রচনাটি নাকি শেষ হয়ে আসছে, শান্তনু নিজেই সেকথা প্রকাশ করেছিলো আগের দিন রাত্রি বেলা। কাজেই সেই প্রায়-শেষকে পূর্ণ-শেষ করার তাগিদকে চাপা দিয়ে শান্তনুকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে সবিস্ময়েই প্রশ্ন করেছিলো অরিজিৎ। কিন্তু শান্তনুর এ উত্তর আরো নতুন নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে দেয় তার মনে।

ও আজ ভাইফোঁটার দিন! কাছেপিঠেই বুঝি আপনার দিদির বাড়ি?—বলেই চুপ করে যায় অরিজিৎ। বর্ধমানের বাড়িতে থাকলে সেও তো ফোঁটা পেতো তার ছোট বোনের

হাতে। তার অন্ত সব ভাইরা পাবে। এবারই প্রথম সে বোনের ফোঁটা থেকে বঞ্চিত হলো। মনটা সত্যি সত্যি তার মুহূর্তের মধ্যে যেন কেমন ভারি হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, খুব কাছেই থাকেন আমার দিদি। এইতো এইখানেই।—দরজার দিকে ডান হাতের তর্জনীকে তুলে ধরে একরকম স্থান নির্দেশ করেই বলে শান্তনু। কিন্তু তাতে কিছুই বুঝে ওঠা সম্ভব নয় অরিজিতের পক্ষে। তখন পর্যন্ত তার যে অনেক কিছুই অজানা। সে তাই একটা অনুমান করে নিয়েই আরো বেশি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে :

তাহলে এই হাসপাতালেই রয়েছেন আপনার দিদি। ভাই-বোন দুজনেরই এই রোগ!—গভীর সহানুভূতি ফোটে অরিজিতের কথায়।

ঠিকই বলেছেন, এই হাসপাতালেই থাকেন দিদি। তবে এখানকার রোগী নন তিনি, হাসপাতাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্ত্রী, মিসেস মুখার্জি।

একথা শোনবার পর কীইবা আর বলার থাকতে পারে? অরিজিৎ শুধু ভাবে সুপারের শ্যালকের সঙ্গে একত্র থাকার বিশেষ সুযোগ সুবিধা তার ভাগ্যেও হয়তো জুটে যেতে পারে। অরিজিৎকে এই সুখকর ভাবনার মধ্যে ফেলে রেখেই বেরিয়ে যায় সগুস্নাত সুসজ্জিত শান্তনু সমাদ্দার সুপারের কোয়ার্টারের দিকে। এ সময়ে তাকে সেদিনে যেতে দেখে রোগীদের এক এক জনের মনে এক এক রকম প্রশ্ন

জাগে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। তার চলার মধ্যে একটা ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করে সবাই চুপ করে যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিজয়ী সম্রাটের মতো ফিরে আসে শান্তনু। এক হিসেবে সত্যি সত্যি বিজয়ী বলা যায় তাকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে ভাইফোঁটা নিতে গিয়েছিলো সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। দিদিই দায়িত্ব নিয়েছেন 'নবারুণ'-এর জন্যে ক্যাপ্টেন মুখার্জির লেখা দুদিনের মধ্যে আদায় করে দেবার। শান্তনু তাই এতো হাসি খুশি।

মিসেস মুখার্জি তাহলে সত্যি সত্যি ভাইফোঁটা দিলেন দেখছি।—শান্তনুর কপালে কাজল-চন্দনের ফোঁটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো অরিজিৎ।

হ্যাঁ দিলেন বৈকি! এই দেখুন না।—কপালের দিকে অংগুলি নির্দেশ করেই ক্ষ্যান্ত হলো না শান্তনু, নিজের মাথা থেকে এক গোছা ধান-দুর্বা তুলে নিয়ে সে দেখালো অরিজিৎকে।

সত্যি সত্যি আপনি মহাভাগ্যবান শান্তবাবু। আপনি সকলের ভালো চান, এ আমি অল্প কদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সকলের আশীর্বাদও আপনার জন্যে থাকবে, তাই স্বাভাবিক। কিন্তু মিসেস মুখার্জিকে আপনি গিয়ে কী করে বললেন ফোঁটা দেবার কথা, সে কথাই আমি ভাবছি। এতো রোগী থাকতে তিনি কি শুধু আপনাকেই ফোঁটা নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?—অরিজিৎ ভেতরের ব্যাপারটাও এই-ভাবে একটু পরিষ্কার করে নিতে চাইলো।

না, নেমন্তন্ন দিদি আমায় মোটেই করেন নি। আর আমিও আবার দিদির এমন ভাই নই যে তাঁর নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকবো। হরষিৎ ভাইফোঁটার কথা মনে করিয়ে দিলে, আর আমিও সময় মতোই সরাসরি গিয়ে হাজির হলাম দিদির বাড়িতে।

তারপর কী করলেন ?

কী আর করবো, বাড়িতে ঢুকেই দিদিকে একটা প্রণাম দিয়ে বলে ফেললাম—দিন, একটা ফোঁটা দিন দিদি। ফোঁটা নিতেই এলাম।

মিসেস মুখার্জি কী বললেন উত্তরে ? একটুও বিরক্তি দেখালেন না ?—অরিজিতের মনে সত্যি সত্যি একটা সংশয়ের ভাব জেগে ওঠে শান্তনুর কথা শুনে।

একি কথা বলছেন ? বিরক্তি তো দূরের কথা, দিদি আমার কথা শুনেই হাসতে হাসতে বললেন, বেশতো ভাই, বসো ! আর একটু আগে এলেইতো ভারি সুন্দর হতো। ঐ দেখো, ঐ দু ভাইকে এইমাত্র ফোঁটা দিয়ে এলাম। এখন তারা দিদির হাতের তৈরি খাবার খাচ্ছে। আর খানিক আগে এলেই তিন ভাইয়ের ফোঁটা একই সঙ্গে হয়ে যেতো। হাওড়া থেকে ওরা দু ভাই কোন সকালে এসে গেছে, আর তোমারই বা এতো দেরি হলো কেন এখান থেকে এখানে আসতে !

বারে, উল্টো অভিযোগ করলেন মিসেস মুখার্জি আপনার বিরুদ্ধে ! তা হলে সত্যি সত্যি তিনি খুশি হতেন আর

নিজের দু ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে বসিয়ে আপনাকে ফোঁটা দিতে পারলে?—অরিজিৎ যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না মিসেস মুখার্জির আন্তরিকতাকে। টি-বি রোগীদের সম্বন্ধে সমাজে সাধারণ মানুষের যে মনোভাব তাতে এমন ঘটনা বিশ্বাস করা সত্যি সত্যি কঠিন। কিন্তু তাহলেও শান্তনুর কথায় তাকে বিশ্বাস করতে হয়। শান্তনু খুব জোর দিয়েই বলে :

বাস্তবিকই দিদি খুব খুশি হতেন আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে বসিয়ে ফোঁটা দিতে পারলে। অরিজিৎ বাবু, আজ হয়তো আপনি এ বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না। কিন্তু যদি আপনি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন তাহলেই দেখতে পাবেন হাসপাতালের সমস্ত রোগীকেই কতো ভালোবাসেন মিসেস মুখার্জি। আমাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই মাপকাঠিতে মিসেস মুখার্জিকে বিচার করতে যাবেন না অরিজিৎবাবু, তিনি সত্যি সত্যি করুণাময়ী।—বলতে বলতে দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসে শান্তনুর।

এরপর আর কোনো কথা তুলতে ভরসা পায় না অরিজিৎ। তবে নিজে থেকেই শান্তনু আরো অনেক কথা বলে যায়। দিদি কি ভাবে তাকে ফোঁটা দিলেন, ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, কেমন করে নিজের হাতে প্লেট ভরতি খাবার সাজিয়ে তাকে খেতে দিলেন, সে সব কথাই শান্তনু বিশদ ভাবে খুলে বলে অরিজিৎকে। বলে সে যেন প্রচুর

শান্তিবোধ করে। টি-বি রোগীরা সমাজের আর সকলের কাছ থেকে ঠিক এমনি ব্যবহার যদি আশা করতে পারতো তাহলে দুঃখের অনেকখানি বোঝাই লাঘব হয়ে যেতো তাদের, এই ধারায় ভাবে বলেই মিসেস মুখার্জির কথা বলতে গিয়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অনেকদিন তাঁদের বাড়িতে যাই না, সে কথাও বেশ অভিযোগের সুরেই শুনিয়ে দিলেন দিদি। আর যে ক'টা দিন হাসপাতালে আছি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে ভালোমন্দ খেয়ে আসতে বল্লেন। তাঁর ভালোবাসা, তাঁর স্নেহ যদি খাঁটিই না হবে তাহলে এমন কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোত না কখনো।—শান্তনু এই বলে থামতেই হরবিৎ ঝড়ের বেগে এসে তাদের ঘরে উপস্থিত।

কিন্তু তাতো হলো ভালোদা, ভাই ফোঁটার সুযোগ নিয়ে বেশ এক পেট চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সেরে এলে, আবার ভবিষ্যতেরও ব্যবস্থা করে এলে। কিন্তু আসল কাজের কতোটা কি হলো তাই বলো।

সে সম্বন্ধেও দিদির কাছ থেকে পাকা কথা আদায় করে নিয়ে এসেছি বৈকি!—এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে শান্তনুর মুখে।

কিন্তু শুধু কথা আদায়েই তো কাজ হবে না ভালোদা, ক্যাপ্টেন মুখার্জির লেখাটি দু-এক দিনের মধ্যেই চাই। আমার লেখার প্রুফটা এই আমি দেখে দিয়ে গেলাম। তুমি তো এ লেখাটা আগে পড়ে উঠতে পারোনি। প্রুফটাই

একবার দেখে দিও। তোমার লেখার প্রুফটাও কালই পেয়ে যাব, প্রেসের লোক জানিয়ে গেছে। তাহলেই এদিকের সব কাজ শেষ। কিন্তু প্রথম ফর্মাটাই যে আটকে থাকলো কাপ্টেন মুখার্জির লেখার জন্যে। ভদ্রলোক কথা দিয়ে যে কথার এমন খেলাপ করবেন তা ভাবিনি। তবে বড়োলোকদের যে এ একটা বৈশিষ্ট্য তাও ঠিক। এজন্যেই সুপারের কাছে লেখা চাওয়ার কোনোরকম ইচ্ছে ছিলো না আমার। ছাখো এখন কি করবে!—এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো কথা শুনিয়ে চুপ করে হরবিৎ।

তুমি তো জানো ভাই, 'নবারুণে'র এ একটা বিশেষ সংখ্যা। তারই জন্যে এ সংখ্যায় সুপারের একটা লেখা থাকা সত্যি বাঞ্ছনীয়। কী বলেন অরিজিৎ বাবু?

হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু 'নবারুণে'র আবার কিসের বিশেষ সংখ্যা? ছুখানা পুরোনো সংখ্যা পড়ে আমার তো এই ধারণা হয়েছে, সাহিত্য রচনায় রোগীদের উৎসাহিত করার জন্যেই 'নবারুণে'র প্রকাশ। যাদের সাহিত্যপ্রীতি ও রচনা-ক্ষমতা রয়েছে তাদের পক্ষে অবসর বিনোদনের এ সত্যি এক সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু কি কি বিষয় নিয়ে আপনারা 'নবারুণে'র বিশেষ সংখ্যা বার করেন তাই আমার জানার ইচ্ছে। বর্ধমানে আমাদের প্রেস থেকেও একখানা 'সাপ্তাহিক' কাগজ প্রকাশ করা হয়, তার যে সব বিশেষ সংখ্যা ছাপা হয় তার মূল উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ মুনাফা লাভ। কিন্তু 'নবারুণে'র বেলায় তো আর তা হতে পারে না।

• নতুন পেশেণ্ট অরিজিৎ এতোক্ষণ ধরে হরষিৎ এবং শান্তনুর কথাই একমনে শুনছিলো। হঠাৎ বিশেষ সংখ্যায় সুপারের লেখা ছাপানোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাওয়ায় তার নিজেরই যেন অনেক কিছু জেনে নেবার একটা সুযোগ হয়ে গেলো। আর মোটামুটি বেশ তথ্যবহুল উত্তরই দেয় শান্তনু। সে বলে:

ঠিক বলেছেন অরিজিৎ বাবু, মুনাফা লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমাদের 'নবারুণ' সম্পর্কে। তবে দেশের অন্যান্য সবার মতো বিশেষ বিশেষ কতোগুলো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে আমরাই বা কেন ভাবতে পারবো না, বলুন? সারা বছরে 'নবারুণে'র অবশ্য মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে—তার মধ্যে বৈশাখে নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা আর আশ্বিনে শারদীয় বিশেষ সংখ্যা। বাকি দুটি সংখ্যা সাধারণ সংখ্যা। সেই হিসেবে আমাদের আলোচ্য সংখ্যাটিকে বলা যায় একটি সবিশেষ সংখ্যা।

কেন, তা কেন বলছেন?—আবার জিগ্যেস করে অরিজিৎ।

তার কারণ আসন্ন-প্রকাশ 'নবারুণে'র এই সংখ্যাখানি নির্দিষ্ট দুটি বিশেষ এবং দুটি সাধারণ সংখ্যার বাইরে। এটি আমাদের স্বর্গত আনন্দদার স্মরণী-সংখ্যা। হ্যাঁ অরিজিৎ বাবু, একটি কথা আপনি ভুল বলেছেন। সে অবশ্য আপনার ইচ্ছেকৃত ভুল নয়, জানেন না বলেই বলেছেন। আমাদের 'নবারুণ' শুধু রোগীদের নয়, দীননাথ হাসপাতালের সকলের—হাসপাতালের অফিসার এবং সাধারণ কর্মচারীদের

লেখাও থাকে এ পত্রিকায়। সব টি-বি হাসপাতালেই একটা আত্মীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় সবাইকে নিয়ে। যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে এরই মধ্যে হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন, এখানকার রোগী-ডাক্তার-কর্মচারী সবাই আমরা যেন এক পরিবারভুক্ত।

হ্যাঁ শান্তনুবাবু, আমারও তাই মনে হয়েছে।—অরিজিৎ পুরোপুরিই মেনে নেয় টি-বি হাসপাতালের এই বৈশিষ্ট্যের কথা। দু-দুবার তাকে দুটি জেনারেল হাসপাতালে প্রায় মাসেক করে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সত্যিইতো এখানকার মতো একটা হৃদ্যতার আবহাওয়া আর কোনো হাসপাতালে তার নজরে পড়েনি। জেনারেল হাসপাতালে তা হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, অরিজিতেরও তাই ধারণা।

বিশেষ করে আমাদের হাসপাতালে এই আত্মীয়তার ভাবটি যে কতো গভীর তা আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন 'নবারুণে'র আনন্দদা স্মরণী-সংখ্যাটি প্রকাশ হলে। তা পড়ে দেখবেন আমাদের আনন্দদা কতো ভালোবাসতেন হাসপাতালের প্রত্যেকটি মানুষকে, আর এখানকার সবাই কতো শ্রদ্ধা করতো, কতো ভালোবাসতো তাঁকে।

ঠিক কথা, ঠিক বলেছো হরষিৎ।—সহকারীর উত্তরের তারিফ করে শান্তনু। 'নবারুণ' সম্পাদনায় হরষিৎ যে তার যোগ্য সহকারী অকুণ্ঠ ভাবেই শান্তনু সব সময় সে কথা বলে থাকে এবং তাকে প্রশংসা করার কোনো সুযোগ পেলে তা সে কখনো নষ্ট করে না।

কিন্তু সবই তো ঠিক হচ্ছে ভালোদা, আজ বা কাল সুপারের লেখাটি না পাওয়া গেলে আবার এক হপ্তার পাল্লায় পড়ে যেতে হবে, একথা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। হাতে এমন একটি লেখাও নেই যা দিয়ে প্রথম ফর্মার বাকি জায়গা-টুকু ভরতি করা যেতে পারে। আচ্ছা ভালোদা, সকালে যখন ভাইফোঁটা নিতে গেলে ক্যাপ্টেন মুখার্জি বাড়িতে ছিলেন তখন, দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে ?

নাঃ আমি যাবার একটু আগেই তিনি অফিসে চলে এসেছিলেন। সকাল আটটা থেকে ঘণ্টা তুই তো রোজই অফিস করেন তিনি। আমি যখন দিদির কাছে গিয়েছি তখন প্রায় সাড়ে আটটা। দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে। আমার প্রত্যক্ষ তাগিদের চেয়ে দিদির হুকুমে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কাজ হবে। দেখবে তুমি, কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই লেখাটি হাতে এসে যাবে।—আশ্চর্য, শান্তনুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সত্যি সত্যি হাতে হাতেই ফল মিলে যায় একেবারে।

কোথায় হে, সম্পাদক মশাই আছো নাকি !—কার গলা, সুপারের বলে মনে হচ্ছে। সবাই কান খাড়া করে। হরষিৎ ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করতেই দেখে সত্যি তাই।

আসুন স্যার, আসুন।—সুপারকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানায় হরষিৎ।

না ভাই, এখন আর আসা-টাসা নয়। তোমাদের সম্পাদক কোথায় ? তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে হবে।

ঘরে আছে শান্তনু?—নিজের নামোচ্চারণ শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসে শান্তনু।

এই যে স্যার আপনি, এই অসময়ে আমাদের এখানে?—শান্তনুর প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিস্ময়।

তা আর কি করবো ভায়া! তুমি তো দিব্যি শুভ দিনে দিদির হাতে কপালে একটা ফোঁটা নিয়ে আমার সঙ্গেও সম্পর্কটা পাকা করে নিলে। তা বেশ করেছো। সম্পর্কটা নিতান্তই মধুর, তাই তাতে আমার কোনো আপত্তিও নেই। কিন্তু সামান্য একটা নালিশ তুমি ভাই একেবারে সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে গেলে? এটা কেমন হলো?

আমি তো দিদিকে তেমন কিছু বলিনি স্যার, আপনাকে শুধু লেখাটার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছি। অবশ্যি কালকের মধ্যে লেখাটা পেলে খুব ভালো হয় সে কথাও আপনাকে বলতে বলেছি।—শান্তনু সবিনয়ে উত্তর দেয়।

হ্যাঁ, তোমার দিদি সেই লেখার কথা এমন ভাবেই একটু আগে আমায় মনে করিয়ে দিলেন যে, অফিস ফিরতি ঘরে ঢুকতেই ছুটতে ছুটতে আবার ফিরে আসতে হলো তোমাদের এখানে। যাই হোক, ও নিয়ে এখন আর বেশি কিছু বলতে চাইনে আমি। আসল কথাটা শুধু জানিয়ে যাই। কাল রাত জেগে 'নবারুণে'র লেখাটি শেষ করেছি। তবে একটু পালিশ দরকার। আজ দুপুরেই তা সেরে ফেলবো। বিকেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।—এই বলেই সুপার বিদায় নেন সেখান থেকে। হরবিৎও বেরিয়ে যায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

আপনার দিদি তাহলে সত্যি সত্যি একজন জাঁদরেল গৃহিণী। তাঁর তাগিদে স্যারকে একেবারে ছুটতে ছুটতে আসতে হলো এখানে!—কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই শুধায় অরিজিৎ।

হ্যাঁ ঠিক তাই। অফিসে বা হাসপাতালে ক্যাপ্টেন মুখার্জি যতোই একরোখামি করুন না কেন, বাড়িতে দিদির কথার ওপর কথা নেই, তাঁর কথার এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সে সব যাক ভাই, স্যারের লেখাটি যে আজই পেয়ে যাচ্ছি তাই বড়ো কথা। 'নবারুণে'র আনন্দদা স্মরণী-সংখ্যা সম্বন্ধে এবার নিশ্চিন্ত।—এই নিশ্চিন্ততার ভাব নিয়েই হরষিতের লেখার প্রুফটা পড়তে শুরু করে শান্তনু।

খট খট খট। এদিকে দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ। কে, দেখুন তো একটু অরিজিৎবাবু।—শান্তনু একটু বিরক্তির সুরেই অনুরোধ জানায়।

না, শান্তনুর বিরক্ত হবার কারণ নেই। অরিজিতের মনিঅর্ডার এসেছে বর্ধমান থেকে। ডাকপিওন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সেই খবরটাই দিতে এসেছিলো অফিস বেয়ারা। অরিজিৎ শান্তনুকে জানিয়ে সে দিকেই পা বাড়ায়। টাকার খবরে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তহবিল যে শূন্য হয়ে এসেছে তার!

॥ দশ ॥

বাঃ বেশ লিখেছে হরষিং! হরষিতের 'আনন্দদা স্মরণে' লেখাটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ে শান্তনু এবং মনে মনে লেখককে বাহবা দেয়। মাঝে মাঝে তুচারটি কথাও সে যোগ করে দেয়। হরষিং তাতে খুশিই হবে, এ কথা ভালো করেই জানে শান্তনু।

বাস্তবিকই কী অদ্ভুত মানুষই না ছিলেন আনন্দদা। ভদ্রলোকের পেশা ছিলো স্কুল মাস্টারি। কীইবা আর সঞ্চয় করা সম্ভব এ পেশায়। তবু টি-বি হয়েছে টের পাবার পর থেকেই যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়েছেন বাড়িতে বসে। কিন্তু এ চিকিৎসার খরচ কতোদিন আর চালাতে পারে একজন সাধারণ মানুষ। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়,—কয়েক মাসের মধ্যেই একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন আনন্দ রায়। তিন মাস পর্যন্ত পুরো বেতন দিয়ে বেতন দেওয়া বন্ধ করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের বিধান রয়েছে বলেই যে এরূপ করা হয়েছে তা নয়, তাঁর জায়গায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে তুজনের মাইনে গুণে যাওয়া সম্ভব নয় স্কুল কমিটির পক্ষে। কমিটির সভায় এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সদস্যরাই উদ্যোগ করে চাঁদা তুলে কিছু কিছু সাহায্য করেছেন আনন্দদাকে কমাস ধরে। কিন্তু এও তো

অনেকটা কলের জলের মতো। একটা সময় আসে যখন কলের মুখ থেকে আর জল পড়ে না। চাঁদার খাতাগুলো যখন সব দিক থেকেই খালি খালি ফেরৎ আসতে লাগলো স্কুল কমিটি তখন চাঁদা তোলার চেষ্টা বন্ধ রাখলেন। কিন্তু কী করা যাবে আনন্দদার চিকিৎসার? সংসারে কেউ নেই তাঁর, তিনি অকৃতদার। স্বভাব-চরিত্রও তাঁর কালিমাশূন্য। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলেন চণ্ডীপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতার জন্যে। সাত বছর ধরে ইংরেজির শিক্ষকতায় অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আনন্দদা। তারই জন্যে ছাত্র-শিক্ষক-গ্রামবাসী সকলের কাছেই ছিলো তাঁর শ্রদ্ধার আসন। গ্রামেই একা এক বাড়িতে থাকতেন তিনি। ছেলে-বুড়োদের আড্ডা বসতো তার বাড়িতে। কিন্তু অসুখের খবর জানাজানি হবার পর আর কেউ বড়ো একটা আসতো না। এমন কি যে ঝি তাঁকে রান্নাবান্না করে খাওয়াতো দেখাশোনা করতো সেও যেন না আসতে পারলে বাঁচে। এমন অবস্থায় কি করা উচিত তা ঠিক করার জন্যে স্কুলের সেক্রেটারী গ্রামের প্রবীণদের এবং শিক্ষকমহাশয়দের এক সভা ডাকলেন। সভায় স্থির হলো, চাঁদা তুলে মাস্টার মশায়কে বাঁচানো যাবে না—যেমন করেই হোক টি-বি হাসপাতালে একটা বেড যোগাড় করতেই হবে। সে ভার পড়লো সেক্রেটারী আর হেডমাস্টার মশায়ের ওপর। কোলকাতায় এসে অনেক ছুটোছুটি করলেন তাঁরা। অনেক লেখা-লেখি চললো তাঁদের যাদবপুর হাসপাতাল, কাঁচড়া

পাড়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু প্রায়রিটির দীর্ঘ তালিকায় কবে যে নিচের নামটি ওপরে স্থানলাভ করতে পারবে তা অনুমান করাও যে শক্ত। স্পেশাল কেস হিসেবে গণ্য করার অনুরোধ করতে যেয়ে একদিন তো এক কর্তার কড়া ধমকই খেতে হয়েছিলো সেক্রেটারীকে। উত্তর এসেছিলো, 'সংসারে আপন বলতে যার কেউ নেই, একটি জীবনও যার উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল নয় তাঁর বিষয় স্পেশাল কেস হিসেবে গণ্য করতে হবে আর এক একটা সংসার—বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-পুলেরা যাদের মুখাপেক্ষী—সে সব কেস দূরে ঠেলে রাখতে হবে, এ নিছক আব্দারের কথা, এতে যুক্তির কোনো স্থান নেই।' এ উত্তরে অপমানিত বোধ করেছিলেন হেডমাস্টার মশায়। শিক্ষকের ক্ষোভ তুবড়ীর মতো ফেটে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। তিনিও বল্লেন, 'যুক্তি আছে স্যার, আপনি যে সব সংসারের কথা বলছেন তেমনি হাজার হাজার অন্ধকার-আচ্ছন্ন সংসারে আলো জ্বালাবার ব্রত নিয়েছিলেন আনন্দ রায়। সে কাজে যাতে কোনোদিক থেকে কোনোরকম বাধা না আসে তারই জন্যে নিজে তিনি সংসারী হননি। এ কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়? স্কুলের সময়ের বাইরে প্রতিটি মুহূর্ত যিনি ব্যয় করতেন গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার কাজে, সেই মহৎ জীবনকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ দাবী পেশ করা কি অন্যায়?' এই প্রশ্ন রেখেই হেডমাস্টার মহাশয় আর সেক্রেটারী নিরাশ হয়ে চলে

এসেছিলেন সেখান থেকে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে এবং কিছুটা ধরাধরি করেই একটা ফ্রী বেড তাঁরা পেয়ে গেলেন এই দীননাথ হাসপাতালে।

সেই থেকেই আনন্দদা এখানে। চণ্ডীপুর স্কুলের সেক্রেটারী এবং হেডমাস্টার তুজনেই মাঝে মাঝে আসতেন তাঁকে দেখতে। অন্যান্য শিক্ষকরাও আসতেন কখনো কখনো এবং সময় সময় ছাত্ররাও ছোট ছোট দল বেঁধে। গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকলে কোনো টি-বি রোগীকে দেখবার জন্যে এমন আকর্ষণবোধ হতে পারে না কখনো। সেক্রেটারী এবং মাস্টার মহাশয়রা আনন্দদার কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন এক এক সময়। শুধু মাত্র একজন আদর্শ শিক্ষকই নন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের নিঃস্বার্থ নীরব কর্মী। গ্রামোন্নয়নে ছেলেদের মাতিয়ে রাখতেন তিনি। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ চণ্ডীপুর আজ সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া-মুক্ত—সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একটি গ্রাম, এ তাঁরই চেষ্টার ফল। যিনিই যখন আসতেন তিনিই অকুণ্ঠ-ভাবে বলতেন, চণ্ডীপুরে আনন্দদার দানের স্বাক্ষর সর্বত্র। সেই কৃতজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গেছে আনন্দদার চির-বিদায়ের দিন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সারা চণ্ডীপুর গ্রামখানি যেন ভেঙে পড়েছিলো দীননাথ হাসপাতালের সামনে। মানুষের কতো আপন হতে পারলে এমনি হয়।

আনন্দদার অর্থ ছিলো না, কিন্তু প্রাণ ছিলো। ভারি উদার-হৃদয় মানুষ ছিলেন তিনি। একা কখনো কিছু খেতে

পারতেন না ভদ্রলোক। চণ্ডীপুরের কেউ কখনো কিছু নিয়ে এলে, অমনি ডাক পড়তো আশেপাশে কে কোথায় আছে সকলের। বিন্দুমাত্র কেউ আপত্তি বা কুণ্ঠা প্রকাশ করলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠতেন, 'এ আপত্তির অর্থ কবিগুরুকে অপমান করা।' 'মানে ?'—অবাক হয়ে যেতে হতো সবাইকে তাঁর এ কথায়। তিনি তখন 'ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান'—এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে দেশের মানুষের প্রতি কবিগুরুর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিতেন সবাইকে।

শুধু প্রাণবানই ছিলেন না আনন্দদা, বিদ্যেও ছিলো তাঁর যথেষ্ট। সাধারণ স্কুল মাস্টারের পক্ষে বেশ বেশিই বলা যায় তাকে। ইংরেজি তিনি লিখতেনও যেমন চমৎকার, বলতেও পারতেন তেমনি চমৎকার। এই হাসপাতালে যখন এলেন তখন বছর পঁয়ত্রিশ হবে তাঁর বয়েস। পরিচয়ের প্রায় শুরু থেকেই তিনি আনন্দদা হয়ে ওঠেন সবার। প্রথম প্রথম সবাই অবাক হতো তাঁর খোঁজ খবরে তাঁর কোনো বাড়ির লোককে আসতে না দেখে। আর এ এমনই একটা বিষয় যে আসল লোককে এর কারণটা জিগ্যেসও করা চলে না। তবে ভক্তজনদের হাবভাব দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিতে খুব বেশি দিন সময় দরকার হয়নি আনন্দদার। তিনি নিজেই হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'আমায় নিয়ে একটা বিষয়ে নিশ্চয় তোমরা ভেবে চিন্তে কোনো কূলকিনারা করতে পারছো না। সত্যি করে বলো দেখি আমি ঠিক ধরতে পেরেছি কি না।

আমার নিজের লোক, বাড়ির লোক কেউ আমায় দেখতে আসে না কেন, এ প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তাই না? কিন্তু এর উত্তরে আমি কি বলবো জানো? আমিও পাল্টা প্রশ্নই করবো। জিগ্যেস করবো, কেন, তোমরা কি আমার আপনার নও, নিজের লোক নও?'—এমনি করেই হাসপাতালের প্রত্যেকটি মানুষকে আপন করে নিয়েছিলেন আনন্দদা। রোগী-নার্স-ডাক্তার সকলেই সমানভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

এ-পি চিকিৎসা করতে হয়েছিলো আনন্দদার। এই এ-পি দেওয়ার ফলে তাঁর বুকে ফ্লুইড অর্থাৎ জল জমে যায়। এ থেকে তাঁর রোজ জ্বর হতে লাগলো। প্রথম দিকে জ্বরের মাত্রা কম থাকলেও ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। সময় সময় জ্বর খুব বেশি উঠে যেতো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি জ্বরে ভুগে চলেছেন। এতো ভুগলে স্বভাবতই মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কিন্তু আনন্দদাকে কোনোদিন কোনো ব্যাপারে মেজাজ খারাপ করতে দেখা যায় নি। নার্স, ওয়ার্ড বয়, জমাদার কারো ওপরেই তিনি কখনো খারাপ ব্যবহার করতেন না। অথচ ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনো-সখনো তাদের হতো বৈকি। কিন্তু এইসব ভুল-ভ্রান্তির জন্যে আনন্দদা নিজে তো তাদের কিছু বলতেনই না, অন্যেরা বলতে গেলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। বলতেন, 'গালমন্দ করে কি হবে ভাই। কাজের লোকদের ভুলচুক হয়েই থাকে। একটু ভালো ব্যবহার পেলে দেখবে এরা ভুল-

ভ্রান্তিও কম করবে।' মিথ্যে নয় আনন্দদার এ কথা। তাঁর কাজ যথাসম্ভব নিখুঁতভাবেই করার চেষ্টা করতো সবাই।

অস্থিচর্মসার চেহারা, জ্বরে ধুঁকছেন, কিন্তু যখনই কোনো রোগী, নার্স বা যে-কেউ আনন্দদার কাছে দরখাস্ত লেখাতে এসেছে তখনই তিনি টুকটুক করে সুন্দর ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখে দিয়েছেন। নিজের যতোই কষ্ট হোক না কেন সে কষ্টকে চেপে রেখে প্রার্থীকে খুশি করেছেন এবং তাকে খুশি করে নিজে আনন্দ পেয়েছেন।

ভালো ইংরেজি এবং বাংলা লিখতে পারতেন বলেই তাঁর কাছে দরখাস্ত আর চিঠি লেখানোর জন্যে রোজ হাসপাতালের লোকদের ভিড় জমতো। অসুখের বেশি বাড়াবাড়ি হলে সময় সময় আনন্দদার বন্ধুরাই তাঁর হয়ে চিঠিপত্রাদি লিখে দিতেন; কখনো-সখনো ভাগিয়ে দিতেন কাউকে কাউকে। পরে কোনো সময় সে কথা জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হতেন আনন্দদা। বলতেন, 'মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার মতো, তাদের কোনো কাজে আসার মতো কোনো ক্ষমতাই তো আর আমার নেই। একটু লিখে দিয়েও যদি মানুষের কোনো উপকারে না আসতে পারি তা হলে শুধু শুধু আর বেঁচে থেকেই বা আমি কি করবো!'

যৌবনে একজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে বহুর ভালোবাসা লাভের ব্যগ্রতায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন আনন্দদা। তাঁর অকৃতদার থাকার রহস্যও এইখানে। বহুর ভালোবাসা দিয়ে একের ভালোবাসার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন

তিনি। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এসব তাঁর নিজের কথার মধ্যে থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। সকলকে সন্তুষ্ট করবার আপ্রাণ প্রয়াসের ফলেই যে এই নিদারুণ রোগে তিনি আক্রান্ত হননি, এমন কথাও বলা চলে না।

আনন্দদা অনেকদিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর। বুকে জল হবার পর থেকে ক্রমশই তাঁর শরীর খারাপের দিকেই গেছে। তাঁর বুকের ফ্লুইড শেষ অবধি এমপাইমা অর্থাৎ পুঁজ হয়ে যায়। শেষের তিন মাস শুধু অক্সিজেন দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে মৃত্যুই একদিন এসে তাঁকে মুক্তি দিলো।

নার্সরা নানা রঙের ফুল ছড়িয়ে দিলেন আনন্দদার শয্যায়। রোগীরা চাঁদা তুলে দুটি পুষ্পস্তবক এবং সাদা ফুলের সুন্দর একটি মালা আনিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন স্বর্গত বন্ধুর উদ্দেশে। আনন্দদার লোকান্তরের সংবাদ চণ্ডীপুর স্কুলে পাঠানো হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। খবর পাওয়া মাত্রই দলে দলে লোক ছুটে এসেছে চণ্ডীপুর থেকে—মালা নিয়ে এসেছেন শিক্ষক, এসেছে ছাত্রদল, এসেছে সাধারণ গ্রামবাসীদের ছোটবড়ো অনেকেই। সকলের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে এঁদের সকলকেই আনন্দদা গভীরভাবেই ভালোবাসতেন যে!

হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি ডেকে পাঠানো হলো। তাই রীতি। কয়েকজন মেল নার্সও শবযাত্রায় সঙ্গী হলেন।

নিজেদের খরচে তাঁরা আনন্দদার শেষশয্যার ফটোও তোলালেন একখানা।

শ্মশানে আনন্দদার আত্মীয় পরিজন কাউকে দেখা যায় নি। ছিলেন শুধু তাঁর গুণমুগ্ধ প্রীতিমুগ্ধ লোকদের একটি বিরাট দল।

আনন্দদা সত্যি সত্যি বহু মানুষের ভালোবাসা লাভ করেছিলেন, কিন্তু এতো লোকের হৃদয় জয় করেও ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মেটে নি। এই দুঃখ নিয়েই তিনি চির-বিদায় নিয়েছেন।

রচনাটি খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মানুষ আনন্দদা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছেন হরষিতের এই লেখাটির মধ্যে। পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে পড়ে শান্তনু। তার গণ্ড বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে প্রুফ গ্যালির ওপর।

ঠিক তখনই পিয়নের কাছ থেকে মণি-অর্ডারের টাকা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকেই অরিজিৎ দেখতে পায় শান্তনুর এ অবস্থা।

কি হয়েছে শান্তবাবু?—দাঁড়িয়ে পড়ে খুবই শান্তভাবে জিগ্যেস করে অরিজিৎ।

কিছুই হয়নি ভাই, একটি মহৎ জীবনের কথা ভাবছিলাম। 'নবারুণে'র জন্যে আনন্দদা সম্বন্ধে লেখা হরষিতের রচনাটি পড়ছিলাম। ভারি সুন্দর লিখেছে হরষিৎ।—বলেই প্রুফ গ্যালিগুলো টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখে শান্তনু। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে দুচোখ মুছে নিয়ে চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে থাকে।

অরিজিৎও আর কোনো কথা তোলে না। সে বেশ বুঝতে পারে তার অ-দেখা আনন্দদার অভাব এ হাসপাতালের পুরনো লোকেরা সবাই কতো গভীরভাবে অনুভব করে। কোনো সাধারণ হাসপাতালে এমনটি কিন্তু কখনো হয় না। মনে মনে ভাবে অরিজিৎ।

॥ এগারো ॥

কি খবর শান্তু ভায়া, কদিন ধরে তোমার যে আর দেখাই নেই। ছুটির নোটিশ পাবার পর 'দাদুর আসরে'র কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছ একেবারে। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অনেক-দিন পর আমার দিদিকে কাছে পাবে সেই সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে আছো। কিন্তু এই বুড়ো দাদুকেও তো একেবারে ভুলে যাওয়া চলবে না ভাই!—দাদু দুপুরের খাওয়ার পর কলতলা থেকে ফেরবার মুখে শান্তনুকে দেখতে পেয়েই বেশ একটি রসালো বাক্য-বোমায় তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতো সহজে ঘায়েল হবার ছেলে নয় শান্তনু।

আপনাকে তো সব কথা খুলেই বলেছি দাদু! বাড়ি যেতে হবে, সে যে মোটেই আনন্দের কথা নয়, বরং একটা দুশ্চিন্তা তা আপনি বেশ জানেন। তবু আপনি আমায় এমনিভাবে আক্রমণ করছেন? আপনি এতো নির্মম? —শান্তনু পাল্টা আক্রমণ করে দাদুকে।

আরে দূর পাগল, তুমি বাপু বড্ড সিরিয়াস। আসল

কথা আমাদের সান্ধ্য আসরে তোমায় মাঝে মাঝে পেতে চাই। জানি তুমি নানা কাজের মানুষ। তাহলেও দু'এক দিন বাদ দিয়েও তো আসতে পারো। প্রায় এক হপ্তা হলো, তোমার দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, তোমার টিকিরও দেখা নেই।—দাদু এই বলে একটু সামলে নিয়ে সম্মুখ সমর থেকে সরে পড়ার ব্যবস্থা করেন।

দেখা আর কি করে পাবেন দাদু, 'নবারুণে'র আনন্দদা সংখ্যাটি প্রকাশ করার ব্যাপার নিয়ে এ কয়টা দিন কোথা দিয়ে কি ভাবে যে কেটে গেলো আমি নিজেই তা টের পাই নি। আনন্দদা সম্বন্ধে আপনার কবিতাটি কিন্তু বেশ হয়েছে।

কীই যে বলো, বুড়ো মানুষের লেখা, তা আবার বেশ হয়েছে! কিন্তু এ যে অনেক দিন আগের কথা হে! মাস চার আগে আনন্দের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমি লিখে ফেলেছিলাম কবিতাটা। সত্যি ভারি খাসা ছেলে ছিলো আনন্দ। কিন্তু অকালে চলে গেলো!—বলতে বলতে চোখ দুটো গোল হয়ে ওঠে দাদুর। লাল জবা ফুলের মতো হয়ে ওঠে দেখতে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিগ্যেস করেন দাদু, কিন্তু এই বিশেষ সংখ্যাটি বের করতে এতোটা দেরি করে ফেল্লে কেন ভায়া?

দেরি হবে না তো কি, আপনার মতো তো সবাই আর স্বভাব-কবি নন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে এক এক জনের কাছ থেকে লেখা আদায় করতে হয়েছে। এখনো শেষ

লেখাটি হাতে আসেনি। আজ বিকেলে পাবো, লেখক কথা দিয়েছেন। আর এই কথাটুকু পাবার জন্যেই কি কম সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছে!

যার একটু কথা পাবার জন্যে এতো সাধ্যসাধনা করতে হয় কে সেই মহাপুরুষ বলতো ভায়া!

তিনি স্বয়ং আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

উরে বাপস্, একেবারে খোদ কর্তার ব্যাপার! নো কমেণ্ট দেন। কিন্তু ও ভদ্রলোক তো শুনেছি তোমার নাকি আবার ভগ্নীপতি! শালা-ভগ্নীপতির ব্যাপারে আমি বুড়ো মানুষ মাথা গলাতে চাইনে। তাই আজ আর কোনো কথা বলবো না, তবে কালকের আসরে তোমায় কিন্তু উপস্থিত থাকতেই হবে। খুব ইণ্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে কাল আলোচনা করবো—এই শালা-ভগ্নীপতি সম্পর্কিতই একটা মজার বিষয়। নিশ্চয় আসবে কিন্তু ভায়া, ভুল হয় না যেন। —এই বলে পাশ কাটিয়ে যেই এগোতে যাবেন দাদু অমনি পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে থালা বাজাতে বাজাতে হাঁক শুরু করে প্রকাশচন্দ্র:

ওসব কি হচ্ছে দাদু? সব বুঝে ফেলেছি। ভালোদার মুখ দিয়ে দিদির কাছে দুচারটে গোপন বাণী পাঠাবার পাকা-পাকি ব্যবস্থা হচ্ছে, তাই না?

তাছাড়া আবার কি? দিদির কথা ছাড়া দাদু আর কারো কথা থোরাই ভাবেন! ভালোদার ছুটি হচ্ছে জানবার পর থেকে রোজই কেবল তাঁর খোঁজ। দিদির কাছে গোপন

বাণী পাঠানো ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে তার ?—ভবানী এসে উঁচু গলায় সমর্থন করে প্রকাশকে।

সুপ্রতুলের আজ খাওয়ায় দেরি। কলতলার দিকেও সে তাই সবার শেষে। সে দিকে যেতেই দাদুকে এ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় তাকে। দাদুও যে তাকেই ডেকে মধ্যস্থ মানেন।

এই যে শোনো সুপ্রতুল, শোনো—এরা যে কী সব মাথা-মুণ্ডু বলছে, তার কোনো মানে হয় বলো দেখি! যেমন ফেল-করা হবু উকীল প্রকাশ, তেমন তার লেজুড় ভবানীচরণ!—দাদু যোগীন মজুমদারের রসিকতার মধ্যেও সময় সময় এমনি হুল থাকে। তবে কোনো বিতর্কের বিষয়কে বেশিদূর টেনে না নেওয়াই তাঁর বৈশিষ্ট্য।· অল্প কথায় কাটা কাটা জবাব দেওয়া তাঁর স্বভাব।

আরে ভাই ছেড়ে দাও দাদুর কথা। আজও তোমরা চিনতে পারলে না দাদুকে ? এতোকাল পরে তাঁকে আবার নতুন করে চিনতে হবে ? দাদু আমাদের নিয়ে রঙ্গরস করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর মনের কোনো বিন্দুতে আমাদের কারুর জন্যে কোনো স্থান নেই—সেখানে শুধু দিদি, তিনি একা, একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্! আমাদের কথা ভাববার তাঁর অবসরই নেই।

ঠিক বলেছো সুপ্রতুল ভায়া, ঠিক বলেছো, একেবারে মোক্ষম কথা বলেছো। তোমাদের দিদিতো আর আরশুলা-টিকটিকির মতো এইটুকু জীব নন, দেহে তিনি 'ব্যাপ্তং যেন

চরাচরম্', কাজেই তাঁকে আসন বিছিয়ে দেবার পর আমার হৃদয়ে কোথায় আর আমি জায়গা পাবো তোমাদের জন্যে! আর এও সত্যি কথা, তোমাদের কথা ভাবতে গেলে দেবীর ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটে। তা আমি বাস্তবিকই ঘটতে দিতে চাইনে। দেবীর আদেশও যে অন্যরকম।

কিন্তু দাছু, দেহে যিনি ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ শুধুমাত্র একটি হৃদয়ে তো তাঁর আসন পড়তে পারে না। বহু হৃদয় জুড়ে যে তাঁর আসন! বহু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের যে তিনি ধ্যানবস্তু! তা হলেই তিনি বহুবল্লভা, সে কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।—বলেই স্থানত্যাগের উদ্যোগ করে শান্তনু।

সুযোগ বুঝে দাছুকে এক হাত নেবার চেষ্টা করছিলো শান্তনু। পূর্ব আক্রমণের উত্তরে আর এক দফা পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু এতো চট করে সে যাবে কোথায়? মোড় ফিরতেই খপ করে তার হাতে ধরে ফেলেন যোগীন মজুমদার। যৌবনে যুযুৎসুর প্যাঁচে বহু শালপ্রাংশু ব্যক্তিকে তিনি কাবু করেছেন, এ কথা বহুবার বহু উপলক্ষে তিনি ব্যক্তও করেছেন। তবে দিদির সঙ্গে কোনো প্যাঁচেই যে কোনো দিন সুবিধে করে উঠতে পারেন নি, সে কথা প্রকাশ করতেও দাছুর কখনো কোনোরকম কুণ্ঠা বা সংকোচ দেখা যায় নি। আর বাস্তবিক পক্ষে নিজের চাইতে তিনি নিজে যাঁর প্রাতরূপ তাঁর কৃতিত্ব গাইতেই তিনি অভ্যস্ত।

দাছু আগাগোড়াই বলে আসছেন, 'আত্মপ্রচার করা ঠিক নয়। তাতে শত্রু বৃদ্ধি হয়ে থাকে এবং অনাবশ্যক যন্ত্রণার

সম্ভাবনা দেখা দেয়।' এ বিষয়ে দাদুর সাম্প্রতিক ঘোষণা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। এইতো মাত্র কদিন আগে তাঁর আসরে তিনি বলেছিলেন, 'আপন আত্মার প্রচারই কালবিধি। কিন্তু আত্মা কি, তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর মতভেদের ফলে এই যুগধর্মটি ঠিক মতো প্রচারিত হচ্ছে না। যাতে আত্মস্থ হওয়া যায় তাইতো আত্মা। এই বিচারকেই আমি যথার্থ বিচার বলে মনে করি এবং সেই হিসেবে আমার গৃহিণীই আমার আত্মা।'

দাদুর এ যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেয়েছে তাঁরই কোনো কোনো ভক্ত। তাদের মধ্যে কেউ বলেছে, 'তা কি করে হয় দাদু, আত্মার আবার আকার আছে নাকি?' আর একজন দাদুকে একেবারে সরাসরি আঘাত করেই বলেছে, 'এসব কি বলছেন দাদু, এ যে একদম নিছক একজন স্ত্রৈণ স্বামীর কথা!' আবার কেউ জিগ্যেস করেছে, 'আচ্ছা, দিদিই যদি আপনার আত্মা তা হলে দিদির আত্মা কোথায়? আসল কথা দিদির কাছে আপনি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন তাই এসব ধানাইপানাই গাইছেন।'

পরপর এমনি ধরণের এক একটি কড়া কড়া প্রশ্নের সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়ে সকলকেই কাবু করেছেন দাদু। এও যেন অনেকটা তাঁর ফেলে-আসা যৌবনকালের যুযুৎসু প্যাঁচেরই মতো।

তিনি উত্তরে বলেছেন, 'হ্যাঁ আমি বলছি, আত্মা অবাস্তব কিছু নয়। কাজেই তা নিরাকার নয়। যার অবয়ব নেই তেমন বস্তুতে কোনো কালেই আমার কোনো রকম আস্থা

নেই। কবির বন্দনা বা দার্শনিক তত্ত্ব তা যতোই সুন্দর হোক না কেন, দৃষ্টিতে শ্রবণে স্পর্শে স্বাদে বা গন্ধে যা অনুভব করা যায় না তার অস্তিত্বে আমার মতো বাস্তববাদী কোনো লোক কখনোই বিশ্বাস করতে পারে না। এতে আমাকে তোমরা হয়তো অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি মানুষ বলে ধরে নেবে, কিন্তু তাহলেও আমি তাতে নাচার। হ্যাঁ, কে যেন আমায় স্ত্রৈণ স্বামী বলে বেশ একটু ঠুকলে! বুড়ো মানুষ বলে ভিড়ের মধ্যে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারিনি কোন দিক থেকে কথাটা এলো, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার উত্তর তো শুধু প্রশ্নকর্তার জন্যে নয়, সকলের জন্যে। ছেলেদের সকলকেই আমি একথাটা জেনে রাখতে বলছি যে, স্বামিত্বের আসল স্বাদ যে কি তা যদি আস্বাদন করতে হয়, তাহলে মনে-প্রাণে স্ত্রৈণ হতে হবে। তা না হলে স্বামী হওয়ার প্রকৃত সুখ কোনো কালেই উপলব্ধি করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, সত্যিকারের স্ত্রৈণ হতে পারলে গৃহে কখনো অশান্তি দেখা দেয় না। সকলে তা হতে পারে না বলেই নানা রকম অশান্তিতে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত তাবিজ-কবজ গ্রহ-শান্তি ইত্যাদি যতো সব বুজরুকি ব্যাপারে টাকা পয়সা নষ্ট করতে শুরু করে। নিরুপায় হয়েই মানুষ এসব অবৈজ্ঞানিক পথে শান্তির সন্ধান করে। কিন্তু অনর্থক অর্থদণ্ড ছাড়া তাতে কোনো ফলই হয় না। কাজেই তোমরাই বলো স্ত্রৈণ হয়ে আমি জিতেছি না হেরেছি, স্ত্রৈণ হওয়া ভালো না মন্দ।'

দাদু তার হাতটি ধরে ফেলতেই শান্তনু বেশ বুঝতে পারে

যে এবার খুব সহজে ছাড়া পাওয়া মুস্কিল। তার মনে পড়ে যায় সেদিনকার আসরে দাত্নর সেই আত্মা বিষয়ক অপূর্ব গবেষণার কথা। দাত্নর গিন্নীকে নিয়ে কথা উঠেছে, সেই গবেষণা নিয়ে আর এক দফা আলোচনা শুরু হয়ে যাওয়াটা মোটেই কিছু বিচিত্র নয়। হাতে একটুও সময় নেই, অথচ অকারণে এতোক্ষণ ধরে একটা বাজে ব্যাপারে আটকে যাওয়া নিতান্তই অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছে শান্তনুর। কিন্তু কীইবা আর করবে সে। নীতিবোধও যে তার আবার প্রবল। তাদের নিয়ে সব সময় রঙ্গ-ব্যঙ্গ করলেও যোগীন মজুমদারের বয়েসের একটা সম্মান আছে তো! তা ছাড়া দাত্ন বলে ডাকা মানেই তাঁকে গুরুজনদের আসন দেওয়া। সেই লোক হাত টেনে ধরলে সে হাত আর ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। অন্য কেউ পারলেও শান্তনু তা কখনোই পারবে না। তার পারি-বারিক ঐতিহ্য তাকে বহু কাজে বহু ব্যাপারেই এমনিভাবে বাধা দেয়, বহু অন্যায় থেকে তাকে রক্ষা করে।

তবে এতো ভাবনা সত্ত্বেও আজ রীতিমতো অবাকই হতে হয় শান্তনুকে। দাত্ন মাত্র দুটি কথায় তার মন্তব্যের জবাব দিয়ে যখন তার হাতটি ছেড়ে দিলেন, শান্তনু দাত্নর দিকে চেয়ে থেকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। একী সাংঘাতিক কথা বলছেন দাত্ন? বলছেন, 'সাবাস ব্রাদার, ঠিক বলেছো! গিন্নী আমার বহুবল্লভা এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তোমাদের মতো শেয়ান ছেলেদের দৃষ্টিকে তিনি কি কম আনন্দ বিলিয়েছেন এককালে! আজ এই

বুড়ো বয়সে সত্যি সত্যি তাঁর মতো ভারি-ভারিক্কী গিন্নীকে একটি মাত্র হৃদয়ে বয়ে বেড়ানো কঠিন ব্যাপার। তাই তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যদি তাঁর জন্যে একটি করে আসনের ব্যবস্থা করো তা হলে আমি বুড়ো আরো কিছু দিন বেঁচে যাই, আমার এই লাভ। যাও, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি চিন্তা করে দেখো গিয়ে।'

এরপর আর কি কথাই বা বলবে শান্তনু। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে তাই নিজের ঘরের দিকেই চলতে শুরু করে।

দুপা এগুতেই আবার পিছু ডাকেন দাদু।

আরে শান্ত ভায়া, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। ভারি জরুরী একটা কথা রয়েছে বলার।—বলেই সবাইকে বিদায় দিয়ে দাদু পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন শান্তনুর। একেবারে শান্তনুর কাঁধে হাতটি তুলে দিয়েই তাঁর জরুরী কথা আরম্ভ করেন।

আচ্ছা, তুমি নাকি আজই সকালে সুপারের ডেরায় গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কেন বলুন তো।

সুপার অনাদির কথা বল্লেন কিছু?

না তো! কেন, কি হয়েছে অনাদির? হঠাৎ তার কোনো রকম বাড়াবাড়ি হয়েছে বুঝি।

বারে, তুমি কিছুই জানো না দেখছি। কেন, কাল তার স্পেশাল পরীক্ষা হলো, কিছুই জানতে না তুমি? অনাদি আমাদের এতো লোককে পাঁচ সাত দিন আগে থাকতে

জানিয়ে রেখেছে আর তার বেষ্ট ফ্রেণ্ডকেই কিছু বলেনি। এও তো কম আশ্চর্যের কথা নয়।—সুযোগ বুঝে দাছু বেশ একটি খোঁচা দিয়ে নেন শান্তনুকে।

এখন ও-সব হেঁয়ালি রাখুন দাছু। দয়া করে বলুন ডাক্তাররা কি রিপোর্ট দিয়েছে অনাদি সম্বন্ধে। আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে দেখে আসছি গিয়ে।—অনাদির স্পেশাল পরীক্ষার কথা তার যে সম্পূর্ণই অজ্ঞাত সেকথা একদমই চেপে যায় শান্তনু। তবে দাছু মোটেই তা বুঝতে পারেননি। তাইতো তিনি একটু রসিয়ে রসিয়েই বলেন: ভায়া হে, তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি। সব ব্যাটাই ডুবে ডুবে জল খায়, গিন্নীর চিন্তায় সবাই মশগুল—যতো দোষ আমার বেলা। যে কথাটা আমি আগেই বলেছি, ছুটির নোটিশ পাবার পর থেকে তুমিও ভায়া একেবারে অন্য মানুষ।

আবার আপনার সেই ঠাট্টা ঠিসারা! না, আমায় এখন দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি যাই।—শান্তনুর এবারের কথার মধ্যে একটু বেশি করেই প্রকাশ পায় বিরক্তির ডোজটা।

আরে অতো চটলে কি চলে ভায়া। একটু আস্তে চলো, সব কথা ধীরে সুস্থে খুলে বলছি।—দাছুর কথা মতো আস্তে আস্তে চলতে চলতে নিজেদের ওয়ার্ডের প্রায় কাছাকাছিই এসে পড়েছেন তাঁরা। সামনে পথের ওপর একটা নেড়ে কুকুর অনেক দিনের পুরনো কোনো মরা জন্তুর শুকনো একখানি হাড়কে কামড়ে আঁচড়ে হয়রান হয়ে পড়েছে, তবু ছাড়াছাড়ি নেই। ঐ দিকে শান্তনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দাছু।

ঐ দেখছো তো ভায়া, একটা শুকনো হাড় থেকে একটু রসবস্তু আহরণের জন্যে কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কুকুরটা। আর এমন জলজ্যান্ত দাদুকে কাছে পেয়েও তাঁর রসাস্বাদনে তুমি বিমুখ, আশ্চর্যই বলতে হয় একে। বেশ ভালোই হয়েছে, বারান্দায় ঐতো পঞ্চানন দাঁড়িয়ে। এই পঞ্চাননের পরেইতো অনাদি তোমার সব চেয়ে বেশি পেয়ারের, তারপরে হরবিৎ ইত্যাদি ছেলে ছোকরারা। পঞ্চুভায়ার কাছ থেকেই বিস্তারিত শুনতে পাবে অনাদির কথা। আমি শুধু শুনেছি, ডাক্তাররা নাকি বলেছেন, তার লাঙ অপারেশন করতে হবে।—এ পর্যন্ত বলেই স্যার রিচার্ড বি-ওয়ার্ডের নিচ তলায় সর্ব দক্ষিণের ঘরটির দিকে পা বাড়ান দাদু। সে ঘরেই থাকেন তিনি। আর সর্ব উত্তরের ঘরে থাকে পঞ্চানন চক্রবর্তী। উপরতলার বাসিন্দে শান্তনু সমাদ্দার।

অনাদির লাঙ অপারেশনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, এই আচমকা খবরে মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায় শান্তনুর। লাঙ অপারেশনে একটু গোলমাল হলে কি ভীষণ পরিণাম যে দাঁড়াতে পারে তা ভেবে শিউরে ওঠে সে। নবলপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায় তার। ধনী মাড়োয়ারীর ছেলে সে। অবাঙালী হলেও বাংলায় সুন্দর বলতে কইতে এবং লিখতে পারতো। তাই নবলকে খুবই ভালো লাগতো শান্তনুর; অপারেশনের ক্রুটির ফলে শ্বাসনালীতে একটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল তার। আট দশ বছর ধরে অজস্র অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও এর কোনো প্রতিকার সম্ভব হয়নি। বেশ কিছুকাল এই

দীননাথ হাসপাতালেও কাটিয়ে গেলো নবলপ্রসাদ। এই তো কয়েক মাস আগে সে কাশ্মীর রওনা হয়ে গেলো এখান থেকে। ডাল লেকে তাকে বোটে বোটে কিছুদিন রেখে দেখতে চান তার বাবা যদি কোনো সুফল পাওয়া যায় তাতে। এখানে থাকতে নবলপ্রসাদ এক একদিন কতো দুঃখই না করতো তার কাছে। এতো দিন ধরে ভুগতে ভুগতে জীবনের ওপর একরকম বীতশ্রদ্ধই হয়ে উঠেছিলো সে। একদিন সে গল্প করতে করতে বলেছিলো, 'জানেন না বোধ হয় ডাক্তাররা তাঁদের অপারেশনের ত্রুটির কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা এটাকে একটা মূল অসুখ ধরে নিয়ে এর নাম দিয়েছেন ব্রনকো প্লুরাল ফিসচুলা। যেখানে সিঙ্গল ফিসচুলা থেকেই কেউ বড়ো একটা রেহাই পায় না, সেখানে 'বহুবচনে'র মালিকের যে কী অবস্থা দাঁড়াবে সে তো পরিষ্কারই বুঝতে পারেন।' সবাই ভেবেছিলো, কাশ্মীরের আবহাওয়ায় তার নিশ্চয়ই কিছু উপকার হবে। উপকার হয়েও ছিলো সত্যি সত্যি। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। মাত্র কয়েকদিন আগে একখানাই মাত্র চিঠি সে লিখেছে শান্তনুকে। তাতে সে লিখছে, 'আপনার হয়তো মনে আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, অপারেশনের ফলে আমার শ্বাসনালীতে একটা ফুটো হয়ে আছে। সেই ফুটো নালী হয়ে একেবারে পিঠ পর্যন্ত এসে পড়েছিলো। এখানে আসবার পর আস্তে আস্তে পিঠের ফুটোটা বন্ধ হয়ে যায়। ভেবেছিলাম ভালো হয়ে উঠবো।

কিন্তু তা আর হলো না। কয়েকদিন হলো সেই পিঠের ফুটোটা আবার খুলে গেছে। আবার শ্বাসের বাতাস পিঠ দিয়ে বার হচ্ছে—পুঁজ আসছে। বুঝতে পারছি ইহজীবনে এ থেকে আমার আর মুক্তি নেই। মনটা তাই নৈরাশ্যে ভরে আছে।'

মুহূর্তের মধ্যে নবলপ্রসাদের এই সমস্ত কথা আলোড়িত করে তোলে শান্তনুর মনকে। বারান্দায় পা দিয়েই পঞ্চাননকে সে জিগ্যেস করে অনাদি সম্বন্ধে।

দাদু যে বল্লেন অনাদির লাঙ অপারেশন হবে, কথাটা কি ঠিক, তুমি শুনেছো কিছু ?

হ্যাঁ, এ খবর তো হাসপাতাল শুদ্ধু সবাই জানে। তুমি আজকাল সারাদিন যেভাবে বই আর কাগজপত্রের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকো তাতে তো পুরনো অনেক খবরই তোমার কাছে নতুন বলে মনে হবে।—পঞ্চাননও বেশ একটু সমালোচনার সুরেই কথা বলে।

ছুটো তিনটে দিন সত্যি তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। অনাদিও যে কেন এ কয়দিন আমার কাছে আসেনি তা বুঝে উঠতে পারছি না। তাকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করবেন, একথা তোমাদের সবাইকে সে জানিয়েছে অথচ আমাকে বাদ দিয়েছে, এতে সত্যি আমি অবাক হয়েছি।—শান্তনুর মুখের রঙটাই যেন বদলে যায় এটুকু বলতে বলতে।

বারে, এতো ভারি মজার ব্যাপার দেখছি। তুমি নাকি অনাদির ওপর ভীষণ রেগে আছো। তাকে নাকি খুব

গালমন্দও করেছো কোন এক অজ্ঞাত কারণে। তাইতো ভয়ে ভয়ে সে কদিন ধরে আসছে না তোমার কাছে।— শান্তনুর বিস্ময় আরো বেড়ে যায় পঞ্চাননের মুখে একথা শুনে। কবে সে গালাগাল করলো অনাদিকে ? ভাবতে ভাবতে সে দোতলায় উঠে যায়। পঞ্চাননও চলে যায় তার ঘরে।

॥ বারো ॥

এরই মধ্যে অরিজিৎ নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, কী ব্যাপার ! শান্তনু একটু আশ্চর্যই হয়ে যায় তা দেখে। ভালোই হয়েছে। নিরিবিলি বসে তার একটু ভেবে দেখা দরকার, কবে সে অনাদিকে গালমন্দ করেছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক তার মনে পড়েছে। কয়েকদিন আগেই সে অনাদিকে দু-একটা কড়া কথা বলেছে। ফুল্লরা শান্তনুর দিকেই প্রথম ঝুঁকেছিলো, একথা ঠিক কিনা অনাদি তা জিগ্যেস করেছিলো ফুল্লরার বন্ধু পদ্মাকে। পদ্মা 'জানি না' বলে সে প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে গেলেও কথায় কথায় কখন তাই আবার একদিন প্রকাশ করে ফেলেছে শান্তনুর কাছে। পদ্মা শান্তনুর সহকারিণী, 'নবারুণে'র মহিলা বিভাগের পরিচালিকা। অপরিসীম শ্রদ্ধা তার 'নবারুণ' সম্পাদকের ওপর। শান্তনুর অর্থাৎ তাদের ভালোদার সুনজরে না পড়লে কোনোদিনই ছাপার অক্ষরে সে তার নাম দেখতে পেতো না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

তার লেখা ভালো লাগে বলেই শান্তনু তাকে বিভাগীয় পরিচালিকা করে নিয়েছে, তাকেও পদ্মা পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করে।

কিন্তু অনাদি তো কোনো মিথ্যে প্রশ্ন করেনি। তার কথার সবটুকুই সত্যি। শান্তনুর দিকেই প্রথম নজর পড়েছিলো ফুল্লরার। অমন সুন্দর চেহারার পুরুষ আর দ্বিতীয় কোথায় এই হাসপাতালে? শুধু চেহারায় নয় তার চালচলন ও কথাবার্তায় এমন একটা আভিজাত্য ও রুচিশীলতা প্রকাশ পায় যা খুব উঁচু ঘরের লোকদের মধ্যেই আশা করা যেতে পারে। এসব কারণেই সর্বপ্রথম শান্তনুর দিকেই তার শিকারী দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলো ফুল্লরা। পদ্মার সঙ্গে তারও আগে থেকেই ফুল্লরার খুব ভাব। ফুল্লরার হাবভাব বুঝতে আর কিছুই বাকি থাকে না পদ্মার। সে অনেকটা গায়ে পড়েই একদিন চুপি চুপি সাবধান করে দেয় ফুল্লরাকে শান্তনু সম্বন্ধে। একান্ত গোপনে পদ্মা জানায়, সেও প্রথম ভালোদার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলো। অনেক তপস্যা তার ব্যর্থ হয়েছে, শুধু দুঃখ ও বেদনাই সে পেয়েছে তার সমস্ত নীরব সাধনার বিনিময়ে। শেষ পর্যন্ত ভালোদার দৃঢ়তায় তাকে হটে আসতে হয়েছে, ভালোদার কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে।

পদ্মার কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ফুল্লরা তা দিনের পর দিন লক্ষ্য করে বুঝেছে। সে দেখেছে, শান্তনুকে পদ্মা দেবতার মতো পূজো করে, কিন্তু হৃদয়ের যে আকুতির প্রকাশ

ভালোবাসায় সেই ভালোবাসা সে নিবেদন করছে আর একজনকে—সে দেবতা নয়, রক্তমাংসের মানুষ—সে সত্যনাথ। সত্যনাথ পদ্মার ডাকে যে শুধু সাড়া দিয়েছে তা নয়, সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে পদ্মার কাছে—তাইতো দুকূল ছাপানো এমনি দুর্দম জোয়ার বয়ে চলেছে এখন যৌবনময়ী পদ্মায়।

পদ্মা খুবই মনের কাছের বন্ধু ফুল্লরার। কিন্তু তবু ফুল্লরার ভারি হিংসে পদ্মাকে। সত্যনাথকে পেয়ে পদ্মা এতো খুশি। সেও কি পেতে পারে না সত্যনাথের মতো আর কাউকে! অকিঞ্চন ঘোষ পয়সাওয়ালা লোক, কেবিনের পেশেণ্ট। অনেকের মুখেই তার প্রশংসা। শান্তনুকে জালে জড়ানো যখন অসম্ভব, তখন কী দরকার সে চেষ্টায় সময় ও শক্তি নষ্ট করার। তাই অকিঞ্চন শিকারেই দেহমনের সাধনায় ব্রতী হতে উদ্যোগী হয় ফুল্লরা।

মন স্থির করে নিয়েই পদ্মাকে একদিন ফুল্লরা ডেকে আনে তার কেবিনে। তারপর পরিষ্কার ভাবেই তাকে বলে, 'তোমাদের ভালোদা কড়া লোক বলে নয়, ফ্রি বেডের রোগীরা যে শ্রেণীর মানুষ তাতে তাদের কারোর দিকেই লোভদৃষ্টি রাখার কোনো মানে হয় না। কাজেই সে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা অকারণ। তোমাদের শান্তবাবুর দিকে একটুও মন নেই আমার।'

সেদিন ফ্রি বেডের রোগী বলে ভালোদার প্রতি যে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে ফুল্লরা তাতে স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হয়েছে

পদ্মা। তবে তখনই তার জবাব না দিলেও খুব ভালোভাবেই তার জবাব দেবার সুযোগ সে পেয়েছে অল্প কয়েকদিন পরেই। অকিঞ্চন ঘোষের পাষাণ হৃদয়ে চিড় ধরাতে না পেরে ফুল্লরাকে যখন ফ্রি বেডেরই এক পেশেন্টের মনের দুয়ারে হানা দিতে দেখা গেলো তখন আর পদ্মাকে রোখে কে। যখন তখন খোঁচা দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুলেছিলো সে ফুল্লরাকে। খুব বেশিদিন অবশ্য পাওয়া যায় নি, তাহলেও ঐ সামান্য কয়দিনের মধ্যেই ভালোদাকে অপমানের তিনগুণ শোধ তুলে নিয়েছে পদ্মা। একদিক থেকে ফুল্লরার ভাগ্যি ভালোই বলতে হবে, পঞ্চাননের সঙ্গে তার একটা কেলেংকারির ঘটনা জানাজানি হতেই ছুটি পেয়ে গেছে ফুল্লরা। তা না হলে বন্ধু পদ্মার মুখে দু-একটা মিঠেকড়া বুলি না শুনে কোনোদিনই তার নিস্তার পাওয়া সম্ভব হতো না। কি অশুভ মুহূর্তেই না ফুল্লরা তার বন্ধুকে ডেকে এনে শান্তনু সম্বন্ধে ঐ অশ্রদ্ধেয় কথা কয়টি বলেছিলো।

কিন্তু শান্তনুর প্রতি ফুল্লরার আকর্ষণবোধের খবরটা অনাদির কানে গেলো কি করে এবং পদ্মাকেই বা সে কেন সে বিষয়ে গিয়ে প্রশ্ন করবে, এটাই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে শান্তনুর কাছে। গায়ে পড়ে পদ্মাকে এ ধরণের কোনো প্রশ্ন করা অনাদির পক্ষে অন্যায় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমনি কোনো ব্যাপারে সে যেন আর কখনো মাথা না গলায়, সে কথাটাই তাকে একটু জোরের সঙ্গে বলে দিয়েছিলো শান্তনু।

তার জন্যে এতোটা দুঃখ পেয়েছে অনাদি! ভেবে একটু

বিস্ময়ই বোধ করে শান্তনু। অনাদি দীননাথ হাসপাতালে তার সমসাময়িক। বয়েসও প্রায় সমান সমান। প্রায় বছর দুই ধরে তাকে যতোটা সে বুঝতে পেরেছে তাতে অনাদিকে একটু অভিমানী মানুষ বলেই শান্তনুর ধারণা হয়েছে। যে লোক ভালোমন্দ সব ব্যাপারে শান্তনুর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, সে লোকই যে শান্তনুর একটা অযাচিত পরামর্শে এতোটা আহত বোধ করবে তা অনুমান করা সত্যি কঠিন।

অনাদির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত থেকে সমস্ত কিছুই মনে পড়ে যায় শান্তনুর। খুবই সংকটাপন্ন অবস্থা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলো অনাদি। অনেকদিন পর্যন্ত শুয়ে শুয়েই কাটাতে হয়েছে তাকে। প্রথম যেদিন বাথরুমে যাবার অনুমতি পেলো সে দিন তার কী আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গে খাবার সময় উঠে বসারও হুকুম হয়েছে বিছানার ওপর। আনন্দের পরিমাণ তাতে চতুর্গুণ। কিন্তু বাকি সময়টা যে কেবলি শুয়ে থাকা। শুয়ে থেকে থেকে একেবারে অস্থিরই হয়ে উঠেছিলো অনাদি। কবে যে ছাড়া পাবে হাসপাতাল থেকে সেই ভাবনা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিলো। ডাক্তারদের জিগ্যেস করলে তার নির্দিষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তাঁরা ভাসা ভাসা উত্তর দেন।

ডাঃ সোম একদিন বলেছিলেন, ‘আপনার তো ডান-দিকের লাঙটা হিল-আপ হয়ে এসেছে। আর বেশিদিন আপনাকে ধরে রাখবো না।’

অনাদি জিগ্যেস করেছিলো, 'শীগ্‌গিরই তা হলে ওয়াকিং পাবো নাকি ?'

ডাঃ সোম আমতা আমতা করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, ঠিক যাকে বলে—সে সময় আসতে এখনো কিছুটা দেরি আছে। তাহলেও ক্রমশই এবং বেশ দ্রুতই আপনি ভালোর দিকে এগিয়ে চলেছেন।'

ছ্মাস অন্তর প্রত্যেক রোগীকে এক্স-রে করা হয়ে থাকে। সেই প্লেট এবং আগের সমস্ত প্লেট নিয়ে ডাক্তারদের কনফারেন্স বসে। সেগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন রোগীর উন্নতি-অবনতির অবস্থা। সেই সময় রোগীদেরও একে একে ডাক পড়ে। এক এক করে তাদের বুক-পিঠও স্টেথো দিয়ে ভালো করে বিচার করে দেখা হয়। তারপর ডাক্তাররা একমত হয়ে কাউকে বাড়ি যেতে বলেন, কাউকে ওয়াকিং দেন, কাউকে আবার পূর্ণবিশ্রামের অর্থাৎ শুয়ে থাকার নির্দেশ দেন।

এই শেষোক্ত অবস্থাকে কিছুতেই অতিক্রম করে উঠতে পারছিলো না অনাদি। অবশ্য এটা ঠিক, সে যদি হাসপাতালে বেড না পেতো, তা হলে এতোদিনে কবেই হয়তো তাকে মৃত্যুর হিমশীতল বুকে আশ্রয় নিতে হতো। প্রায় মরতেই তো সে বসেছিলো। রোজ সন্ধ্যের দিকে জ্বর উঠতো একশো তিন চার। কয়েকটা স্ট্রেপটোমাইসিন নিলেই জ্বরটা প্রথম দিকে কমে যেতো। কিন্তু বিশ্রামের বালাইতো ছিলো না। স্থায়ীভাবে জ্বরের রেমিশন হবে কি করে? সেলসম্যানের

চাকরি। না বেরোলেই নয়। ছুটি নেওয়া মানেই রুজি রোজগার বন্ধ অর্থাৎ সংসার অচল। কাজেই জ্বর নিয়েই বেরোতে হতো। তবে জ্বরকে ঠেকা দেবার জন্যে পারফিউমারি কোম্পানীর জিনিসের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে এক কৌটো প্যাসও সে রাখতো। কিন্তু এভাবে জোড়াতালি দিয়ে বেশিদিন চালানো কি সম্ভব? হঠাৎ একদিন শয্যাশায়ী হয়েই পড়তে হলো অনাদিকে।

স্ট্রেপটোমাইসিনও আর নিয়মিত নেবার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ পয়সা জুটতো না। আর ও নিয়েই বা কি হবে! এমন একটা সময় এলো যখন স্ট্রেপটোমাইসিন নিয়েও জ্বর কমে না। কাশির মাত্রাটাও বাড়তে বাড়তে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে এলো এবং মাঝে মাঝে রক্তও উঠতে লাগলো।

অনাদি নিজেই এ সমস্ত কথা বলেছে শান্তনুকে। তার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে অনাদির একমাত্র ছোট ভাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা বলতে বলতে অনাদির দুটি চোখ যে কেমন অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিলো প্রায় দেড় বছর পর অবিকল সেই দৃশ্যটিই যেন ভেসে উঠছে শান্তনুর চোখের সামনে।

অরিজিৎ তখনো ঘুমুচ্ছে। পাশ ফিরে সে শুলো বটে, চোখে তখনো তার গভীর ঘুম। সেদিকটা একবার দেখে নিয়ে আবার অনাদির প্রসংগ ভাবতে শুরু করে শান্তনু।

একদম বকাটে হয়ে গিয়েছিলো বলে অনাদির ছোট

ভাইটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের বাবা-মা। তাঁরা বেঁচে থাকতে সে আর বাড়িতে ঢোকেনি। ছোট ভাই অনুপম কোথায় যে চলে গিয়েছিলো বাপের তাড়ায় অনেক চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান করতে পারেনি কেউ। এই অনাদিই কি কম ছুটোছুটি করেছে ভাইটিকে খুঁজে বার করার জন্যে! বাবা-মায়ের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে অনুপমের হয়ে। তাকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে। তারপর ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছে আর ফিরেছে কোনোদিন সন্ধ্যায় কোনোদিন অনেক রাত্রিতে। এক এক সময় আবার দু-তিন দিনের জন্যেও সে বেরিয়ে গেছে ভাইয়ের খোঁজে। কিন্তু সব খোঁজাখুঁজিই তার ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তার নয়, সকলের। শেষ পর্যন্ত অনুপমকে ফিরে পাবার সমস্ত আশা ছেড়েই দিয়েছিলো সবাই। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে অনুপম নিজেই যখন ভয়ে ভয়ে একদিন বাড়িতে এসে হঠাৎ উপস্থিত হলো তখন তার মাও নেই বাবাও নেই। পরপর তারা দুজনেই গত হয়েছেন দুবছরে। অনাদিও শুধু ভগ্নস্বাস্থ্য নয়, টি-বি রোগে শয্যাগত।

বাড়ির আবহাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ে অনুপম। কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরে চলে এসে খোলা আকাশের নিচে ছোট্ট মাঠটায় গিয়ে একটু দাঁড়ায়। শ্বাস নেওয়া যেন অনেক সহজ বোধ হয় সেখানে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতো কথাই না জানি সে ভেবেছে। হয়তো ভেবেছে, বাবা-মা তার কথা ভাবতে ভাবতে তার দুঃখেই প্রাণ

হারিয়েছেন ; দাদাও চলার পথে, কিন্তু দাদাকে যেতে দেওয়া হবে না—এ সংকল্পই হয়তো সে গ্রহণ করেছে আকাশ সাক্ষী করে। তা না হলে কী করে সে অসম্ভবকে সম্ভব করলো—কী সে আশ্চর্য উপায় !

রানাঘাট থেকে সে দিনই অনুপম কোলকাতায় চলে এসেছে। চারদিনের মধ্যে এই দীননাথ হাসপাতালে একটা বেড জোগাড় করেছে। অথচ অনাদি নিজে এর আগে কতো চেষ্টাই না করেছে এর জন্যে। বড়ো বড়ো হোমরাচোমরাদের অনেক ধরাধরি করেও কোনোই সুবিধে সে করতে পারেনি। তাই চারদিন পর আবার ফিরে এসে অনুপম যখন জানালো দীননাথ হাসপাতালে বেড পাওয়ার সংবাদ, অনাদি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলো সে কথা। কিন্তু সে যখন পকেট থেকে বার করে হামশা তালের চিঠিখানা দাদার সামনে এনে ধরলো, অনাদির দুচোখ জলে ভিজে গেলো—বড়ো বড়ো দুবিন্দু কৃতজ্ঞতায় যেন জ্বলে উঠলো দুটো চোখ।

নির্দিষ্ট দিনে অনুপম দাদাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে। যাবার সময় বলেছে, 'দাদা, ভাবনা চিন্তা তুমি একেবারেই করবে না। এ অসুখে মানসিক শান্তি আগে দরকার। শুধু দেহকে বিশ্রাম দিলেই হয় না, এ রোগের উপশমের জন্যে মনেরও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। চিরটাকাল তোমার ছত্রছায়ায় কাটিয়েছি। লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি তা তোমারি জন্যে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে আমার সমস্ত অন্যায়কেও তুমি অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতে,

দেখেও কিছু দেখতে না। তার প্রায়শ্চিত্ত এমনি ভাবে আমাদের আজ ভুগতে হচ্ছে। যাক সে সব কথা। আজ সমস্ত সংসারের দায়িত্ব আমার। সব কিছুর ভাবনা আমার একার। যখন যা কিছু তোমার দরকার আমায় তুলাইন লিখে জানিও। তা ছাড়া প্রতি শনিবার রবিবারতো আমি আসবোই।

অনাদিই তাদের সংসারের এ সব কাহিনী বলেছে শান্তনুকে। এছাড়াও আরো অনেক কথা বলেছে। নিজে লেখা পড়া খুব বেশি শেখেনি। কিন্তু ভাইকে বি-এ পাশ করানোর জন্যে সে প্রাণপাত করেছে। বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েওছিলো সে অনুপমকে। কিন্তু কলেজে পড়তে পড়তেই দলে পড়ে সে এমনি বিগড়ে গিয়েছিলো যে তার নিন্দেয় টি-টি পড়ে গিয়েছিলো চারদিকে। বাপ-মায়ের অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। অসহনীয় অপমানে বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বলেছিলেন তাঁরা তাঁদের আদরের ছোট সন্তানকে। এ অবস্থায় অনুপম পালিয়ে চলে যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে বড়ো একটা চা-বাগানে কি করে একটা চাকরিও জুটিয়ে নেয়। চার বছরে বেশ কিছু সঞ্চয় করে এবং বাগানের মালিকের চোখে পড়ে যায়। এক ইংরেজ চা-করের কাছ থেকে এ বাগানটি হালেই কিনে নিয়েছেন এই দেশী মালিক। আগে থেকেই কোলকাতায় তার মস্ত কারবার। সেই কারবারেই একটি বিভাগ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে অনুপমকে মালিক

কোলকাতায় নিয়ে এসেছেন। এমনি করেই বুঝি অদৃশ্য শক্তি সব কিছুর ব্যবস্থা করে থাকেন! অনুপম কোলকাতায় না এলে অনাদির কী হতো?—ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে শান্তনু। টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বইয়ের পাতা উল্টে গেলেও তাতে মন বসাতে পারছে না শান্তনু। অনাদি এবং তার পরিবারের নানা কথাই তার মনকে বার বার কেবলি নাড়া দেয়।

অনুপম প্রতি শনিবারই অফিসের পর সরাসরি একেবারে হাসপাতালে চলে আসে। এক একদিন এক এক রকমের ফল আনে সঙ্গে করে। পুরো দুঘণ্টা দাদার সঙ্গে গল্পগুজব করে তারপর ট্রেনে চেপে একেবারে রানাঘাট। রবিবার ছুটির দিন, সেদিন আর অনুপম একা আসে না—সঙ্গে বৌদিকেও নিয়ে আসে। শুধু বৌদিকেই নয়, দাদা যে সব জিনিস ভালোবাসেন এবং যে সব খাওয়ায় ডাক্তারদের কোনো বারণ নেই, বৌদিকে দিয়ে তার কিছু কিছু তৈরি করিয়েও সঙ্গে করে আনে।

ছেলেমেয়েদের আনতে অনাদিই মানা করেছে। রোগটা যে মারাত্মক। ওদের এখানে না আসাই ভালো। এমন কি সপ্তাহে দুদিন করে অনুপমের আসাটাও পছন্দ নয় অনাদির। অনাদি বারণও করছে। কিন্তু এ ব্যাপারে দাদার নিষেধ অনুপম শুনলে তো!

ছোট মেয়েটাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে অনাদির।

প্রায়ই অনাদি বলে ঐ মেয়েটার কথা। ওর মা কি নামে যেন ডাকে ওকে? বুবলি। অনাদির কিন্তু ও নামটা তেমন ভালো লাগে না। ও আবার কোন দেশী নাম! সে তাই মেয়েকে ডাকে রত্না বলে। তাহলেও গিন্নী তাপসী এবং আর সবাইর মুখে বুবলি নামটাই চালু। ছেলে টুকুনকেও অনাদি ডাক নাম ধরে ডাকে না, ডাকে তার পোষাকী নামে সুবাস বলে।

রত্না নামটি ভারি সুন্দর, তাই না?—অনাদি একদিন জিগ্যেস করেছিলো শান্তনুকে। শান্তনু উত্তরে বলেছিলো, 'হ্যাঁ'। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো তার মেয়ের বর্ণনা।

কি যে ছটফটে মেয়ে তা আর কি বলবো ভালোদা! একদণ্ড কোথাও স্থির থাকতে পারে না। একবার এটা টানছে, একবার ওটা টানছে। হয় ফেলছে নয় ভাঙছে—তার কাজ কিছু না কিছু চলছেই। আর না হয় বকর বকর। এখানে এলে কি আর চুপচাপ সে টুলের ওপর বসে থাকতে পারতো। হাতের কাছে আর কিছু না পেলে অন্তত লকারের জিনিসপত্তরগুলো বার করে নিয়ে এদিক ওদিক টানাটানি করতো। —বলতে বলতে অনাদির সে কি উচ্ছ্বাস!

এই অপূর্ব সন্তান-বাৎসল্য, আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম এবং বাড়ির প্রতি তার গভীর একটি আকর্ষণ লক্ষ্য করেই অনাদিকে এতোটা ভালো লেগেছে শান্তনুর। এবং তারই জন্যে পদ্মার কথায় মনে মনে একটু বিরক্তই হয়েছিলো সে অনাদির ওপর। সে বিরক্তিটা শান্তনু মনের কপাট বন্ধ করে আটকে রাখেনি,

সামনাসামনি অনাদির মুখের ওপরই প্রকাশ করেছে। শান্তনু এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সে ভালোই করেছে। অনাদির সঙ্গে দেখা হলেই সে কথাটা তাকে সে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারবে, এও তার নিশ্চিত ধারণা।

বেচারা অনাদি!

দিনরাত শুয়ে থাকতে প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগতো অনাদির। গোড়ার দিকে আবার বাথরুমে যাবারও অনুমতি ছিলো না। বিছানায়ই থাকতো সে সর্বক্ষণ। ওয়ার্ড বয় এসে মাথা ধুইয়ে দিয়ে যেতো। সব কিছুই করতে হতো তাকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। এ অবস্থায় যে কোনো মানুষের পক্ষেই জীবন সম্পর্কে একটা গভীর নৈরাশ্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। অনাদিরও তাই হয়েছিলো। তবে একটা সুখের কথা, হতাশায় একদম ভেঙে পড়ার মুখেই সে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি উপলব্ধি করতে শুরু করে। কোনো এক অজ্ঞাত শিল্পী যেন সুন্দর একটি আশার জাল এতোদিন ধরে তার চোখের সামনে বুনে চলতে চলতে তা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে গেলো। এই তো কদিন আগেই সে শান্তনুকে বলছিলো, তার শরীর এখন এমন সুন্দর হয়েছে, ইচ্ছে করলেই ডাক্তাররা এবার তাকে ছেড়ে দিতে পারেন। আর ছাড়া পাওয়ার হুকুম হলেই সেও গৃহযাত্রায় উদ্যোগী হতে পারতো শান্তনুর মতো।

সত্যি তাই। জ্বর নেই, শরীরের ওজনও বেশ ভালো। গত কয়েক'মাস অনাদিকে দেখে বাইরের কেউ মনেই করতে

পারতো না যে সেও এ হাসপাতালেরই একজন রোগী। অথচ এমনি সুস্থ সবল রোগীদেরই লাঙ অপারেশন করা হয়ে থাকে, তাই নাকি নিয়ম। তার কারণ, এমন রোগী খুব কমই পাওয়া যায় যে অপারেশনের কথা শুনে ভয় পায় না। আর ভয় তারা না-ইবা পাবে কেন? এখনো যে বহু লোক মারা যায় এই অপারেশনে!

এই ভয়ের কথা মনে আসতেই শিউরে ওঠে শান্তনু।

না, অনাদির অপারেশন না হওয়া অবধি হাসপাতাল ছেড়ে সে যাবে না—কিছুতেই যাবে না। এতো আর নিজের জন্যে নয়, দিদিকে দিয়ে সে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অনুরোধ পেশ করবে ক্যাপ্টেন মুখার্জির কাছে। মনে মনে স্থির করে ফেলে শান্তনু।

এবার বইটা পড়া যাক খানিক। সত্যি সত্যি এবার সিরিয়াসলি শান্তনু পড়তে শুরু করে হাতের বইখানা। এতোক্ষণ ধরে বইয়ের পাতা উল্টে গেলেও কিছুই পড়া হয়নি তার।

অরিজিৎ তখনো ঘুমুচ্ছে। খুব নিবিড় গভীর ভাবেই ঘুমুচ্ছে। ঘুমাক। শান্তনু আর একবার অরিজিৎকে দেখে নিয়ে পড়ায় নতুন করে মনোনিবেশ করে।

কিন্তু কে যেন ডাকছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। খটা-খট-খট!

কে?

আমি ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

আপনি? কী ব্যাপার স্যার?—দরজা খুলেই অবাক হয়ে যায় শান্তনু।

বাঃ তোমার 'নবারুণে'র লেখাটা যে আজই দেবার কথা। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে?—বলেই ঘরে ঢুকে একেবারে শান্তনুর বিছানার ওপরই বসে পড়েন মুখার্জি সাহেব।

না, মোটেই ভুলিনি স্যার, তবে এতো তাড়াতাড়ি যে আপনি নিয়ে আসবেন তা সত্যি আমি ভাবতে পারিনি।

ও তো একরকম সবটাই লিখে রেখেছিলাম। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে দেবার জন্যে যা একটু দেরি হচ্ছিলো। কিন্তু ভাই, তুমি সইলেও আমার সোয়াস্তি তো তোমার দিদি সইবেন না। তাই লেখাটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিশ্চিন্ত হতে চাই। কী তাড়াটাই না আজ খেতে হয়েছে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে। ভাইফোঁটার নাম করে ভাই-বোনে বেশ করে যুক্তি করেছিলে আমাকে ঘায়েল করার জন্যে, তাই না!—বলেই পকেট থেকে দুপৃষ্ঠার ছোট্ট একটি লেখা বার করে শান্তনুর হাতে তুলে দেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি। তারপর উঠে পড়েন। তাঁকে যে তিনটের মধ্যেই আবার গিয়ে বসতে হবে অফিসে।

কিন্তু স্যার আপনি এখুনি যাচ্ছেন?—শান্তনু অত্যন্ত ধীরভাবে জিগ্যেস করে। তার কথার সুরের মধ্যে খুব গুরুতর কোনো প্রশ্ন যেন লুক্কায়িত।

তা বুঝতে পেরেই হয়তো কথার মোড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে চান সুপার। তিনি একেবারে সোজাসুজিই

উত্তর দেন। বলেন—হ্যাঁ, আজ আবার একটা জরুরী কাজের তাগিদ রয়েছে যে। একটু আগে আগেই অফিসে যেতে হবে। আর গল্প করার চেয়ে তুমি তো গল্প পড়ে সময় কাটাতেই বেশি ভালোবাসো। কি বই পড়ছিলে, ওখানা কি বই?

দি হিউম্যান কমিডি।—শান্তনু জানায়।

ও দ্যাটস এ ওয়াণ্ডারফুল বুক। আমি ভাই একেবারে খাস প্যারিতে বসেই অরিজিন্যাল ফরাসী ভাষায় বালজাকের এ বইখানা পড়েছি। আমার ভাই একটা কথা কি মনে হয় জানো, এ্যাটমসফিয়ার অনুযায়ী বইয়ের স্বাদও বদলায়। সতেরো বছর আগে প্যারিতে বসে এ বইয়ের যে স্বাদ পেয়েছিলাম, সে স্বাদ আর এই হাসপাতালে বসে নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারি না। কিন্তু আমি ভাবছি, তুমি ফ্রাঁশোয়া সাগার যুগের ছেলে হয়ে কী করে একশো বছর আগের বালজাককে নিয়ে মেতে রইলে!—নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েন স্থপার। একবার কোনো বিদেশী প্রসংগ এসে গেলে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন মুখার্জির পক্ষে।

তবে শান্তনুর উত্তরে নিজের তৈরি জাল থেকে কোনো-রকমে বেরিয়ে আসার একটা পথ পেয়ে যান মুখার্জি সাহেব, তাই রক্ষে।

শান্তনুর উত্তর মানে আর একটি বিনীত প্রশ্ন। সে বলে—বালজাককে আমার খুব ভালো লাগে, সে বিষয় নিয়ে আপনার

সঙ্গে বরং আর একদিন আলাপ করা যাবে। আজ শুধু একটি কথা আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই।

কি, বলো?

আচ্ছা, অনাদির নাকি লাঙ অপারেশন করা হবে? সে কথাটা কি ঠিক?

হ্যাঁ, তাইতো ঠিক হয়েছে। লাঙ অপারেশন ছাড়া ওর ভালো হবার কোনো আশা নেই।—সুপারের মুখে এ কথা শুনেই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায় শান্তনু।

আমি কিন্তু স্যার, অনাদির অপারেশনের আগে হাসপাতাল ছাড়ছি না। আরো কয়েকটা দিন আমায় হাসপাতালে থাকতে দিতেই হবে।—অনুরোধ হলেও শান্তনুর এই মিনতির মধ্যে আর এক রোগী-বন্ধুর প্রতি তার যে অকৃত্রিম প্রীতিবোধ ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে যান ক্যাপ্টেন মুখার্জি। তাঁর মুখ দিয়ে অন্য আর কোনো কথা বেরোয় না। শান্তনুর দিকে একবার গভীর দৃষ্টিপাত করে তিনি শুধু বলে যান, 'বেশ তাই হবে, তাই হবে।'

অরিজিৎ জেগে উঠেছে। শান্তনুর কথায়ই তার ঘুম ভেঙেছে।

'আমি……হাসপাতাল ছাড়ছি না।……আমায় হাসপাতালে থাকতে দিতেই হবে।'—এ সব আপনি কি বলছেন শান্তবাবু? কার সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি?—চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে জিগ্যেস করে অরিজিৎ।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি এসেছিলেন।

শান্তনুর এই ছোট্ট উত্তরটুকু অরিজেতের বোধহয় কানেই যায় না। সে যে তখনো বিস্ময়-স্তব্ধ। অবিমিশ্রভাবে একটি মাত্র কথাই সে শুধু ভেবে চলেছে: যক্ষ্মা হাসপাতালের ওপরেও তাহলে মানুষের মায়া ধরে, মানুষ তাহলে টি-বি হাসপাতালেও জোর করে থাকতে চায়।

॥ তেরো ॥

সন্ধ্যায় অনাদির সঙ্গে দেখা করতে যায় শান্তনু। সঙ্গী তার হরবিৎ। অনাদির মুখ থেকেই সব কথা শুনে নেয় সরাসরি। আগে তাকে সংবাদ না দেওয়ায় শান্তনু দুঃখ প্রকাশ করতেই সে প্রসংগ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে অনাদি। বলে, আমি তো জানি তুমি এখন কি ব্যস্ত, তাই তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি। তবে আজই যেতাম তোমার কাছে। কিন্তু তুমিই আগে থেকে এসে পড়ে আমার প্ল্যান বানচাল করে দিলে।

কবে অপারেশন হবে তা বোধ হয় জানো না কিছু।— জিগ্যেস করে শান্তনু।

না, এখনো পর্যন্ত কিছু জানি না। তবে দু-তিনদিনের মধ্যেই আমাকে নোটিশ দেওয়া হবে, সুপার আমায় বলে দিয়েছেন।

সে খবরটি কিন্তু আবার চেপে রেখো না আমার কাছে।

কী যে বলো ভালোদা! একবার একটা খুঁৎ পেয়েছো,

ব্যাপ তা আর ভুলতে পারছো না। আমি আরো ভাবছি, তোমার ছুটি হবার আগেই যদি আমার অপারেশনের তারিখটা পড়তো তাহলে ভারি ভালো হতো। তুমি কাছে থাকলে···।—বলতে বলতে থেমে যায় অনাদি। কিন্তু সেই না বলা কথা বুঝতে মোটেই বাকি থাকে না শান্তনুর। অনাদির চোখে সে স্পষ্ট লক্ষ্য করে একটা অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া, কণ্ঠে তার আর সেই দরাজ ভাব নেই—কেমন একটা আতংকের বন্ধুরতায় তার স্বরপথ শ্লথ-মন্থর। না, ভয় পেলে তো চলবে না, অনাদিকে সাহসী হতে হবে। সেই জন্যে সব দিক থেকে ভরসা পাওয়া উচিত অনাদির।

আজকাল লাঙ অপারেশন তো হরদম হচ্ছে। এখন আর ও একটা ভাবনার ব্যাপারই নয়। কি বলো হরষিৎ? —শান্তনু এই বলে খুব হাল্কা করে দেখাতে চায় ব্যাপারটা এবং হরষিতের সমর্থনে তার যুক্তিকে আরো জোরদার করে তোলে।

চলো ভাই অনাদি, লনের দিকটায় একটু ঘুরে আসা যাক।—হরষিতের কথায় অনাদি ফতুয়ার ওপর তার খদ্দরের চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বলে, চলো তাই যাই।

লনের নির্ধারিত কোণটিতে যথারীতি দাদুর আসর বসেছে। কিন্তু আসরে এতো উত্তেজনা কিসের আজ? কাসর-কণ্ঠী একটি গলার স্বর ছাপিয়ে উঠেছে আর সকলের সব কথাকে। সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চরবা একটি মহিলা বলছেন, না দাদু, এও আপনার মনগড়া গল্প। রোজই

আপনি এমনি এক একটি বানানো কাহিনীকে আমাদের সত্যি বলে বিশ্বাস করতে বলেন। আপনার আসল উদ্দেশ্য মেয়েদের ডাউন করা। সেদিনও আপনাকে আমি একথা বলেছি। সত্যি দাহু, এমনি হলে আমরা মেয়েরা আর আপনার আসরে কেউ আসবো না।

ও, এ নিশ্চয়ই আমাদের ব্রজরাণী। দেখলে না বক্তৃতা শেষ করেই ডিবে খুলে কেমন একগুচ্ছ পানের খিলি মুখে গুজে দিলে।—মহিলার তাম্বুল-চর্চা লক্ষ্য করে অতি সহজেই তাকে ঠাহর করে নেয় শান্তনু। কাছে এসে দেখে সত্যি তাই। মহিলা আর কেউ নয়, পুরুলিয়ার ব্রজরাণী মাহাতো—শশিকান্ত মাহাতো এম-এল-এ'র স্ত্রী।

নিজেকে খুব উচিতবক্তা বলে মনে করে ব্রজরাণী। এম-এল-এ গৃহিণী বলে বক্তৃতা দেবার একটা স্বাভাবিক অধিকারও সে লাভ করেছে, এমন একটা ধারণাও তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কিন্তু তার চাষী স্বামী রাজ্য আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হবার পর কিছুদিন না যেতেই তাকে হাসপাতালে আসতে হয়েছে। কাজেই বক্তৃতা দেবার সুযোগ আর তার হলো কোথায়। জনতার সামনে মুখ খোলার একমাত্র স্থান এখন তার কাছে এই দাহুর আসর। রোজই এ আসরে তার যোগ দেওয়া চাই এবং ভালো-মন্দ সংগত-অসংগত দু-চারটে কথাও রোজই তার বলা চাই।

কিন্তু আজ দাহুর কাছ থেকে একেবারে মোক্ষম জবাব পেয়ে যায় ব্রজরাণী।

বেশ, কাল থেকে তাহলে বন্ধই করে দেয়া যাক দাদুর আসর। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই যখন উঠেছে আর ব্রজরাণী যখন বলেছে মেয়েদের ডাউন করার জন্যেই আমি এক একটি গল্প ফেঁদে বসি—এসবই আমার কারসাজি, তখন আমি আর বাবা এর মধ্যে নেই। মাথায় থাক আমার দাদুর আসর, কাল থেকে আমি আর আসছি না।—দাদুর এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে থমথমে হয়ে ওঠে আসরের আবহাওয়া। কিন্তু সে নিস্তব্ধতা মুহূর্তের জন্যে।

কাল থেকে আপনি আসবেন না বল্লেই হলো! যার তার কথায় আপনি এমন একটা সিরিয়াস সিদ্ধান্ত করে ফেলতে পারেন এ ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে।—চেঁচিয়ে ওঠে একজন পেছন থেকে।

আরে, এযে দাদুর একান্ত ভক্ত সুপ্রতুল।—দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে শুরু করতেই সুপ্রতুলের দিকে নজর পড়ে অকিঞ্চনের।

কি নিয়ে এই হট্টগোল, এতো উত্তেজনা তা জিগ্যেস করতে উদ্যত হয় হরষিৎ। একেবারে সুপ্রতুলের প্রায় গায়ে গায়েই যে তারা দাঁড়িয়ে। তাকে ডাকতে গিয়েই থেমে যেতে হয় হরষিৎকে। না থেমে উপায়ইবা কি, আর একজন রোগিণীও যে দাঁড়িয়ে উঠে হল্লা শুরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে।

এ আপনি কেমন বে-আক্কেলে কথা বলছেন দাদু! ব্রজরাণী পুরুলিয়ার টুসু-নেত্রী হতে পারে, কিন্তু দাদুর

আসরে সে তো আর আমাদের চেয়ে বড়ো কেউ নয়। তার কথায় আমরা আসরে আসা বন্ধ করবো কেন ?

কে, রাসু না ? রাসু ছাড়া কার আর এমন বুকের পাটা যে এমনি করে সোজাসুজি কথা কইতে পারে ?—দাছু একমনে বিড়ি ফুকতে ফুকতেই রাসুর কথার জবাব দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু মুখের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা চমকে ওঠেন দাছু। বিড়ি পুড়ে পুড়ে বিড়ির আগুন কখন যে এসে আঙুল ধরো-ধরো হয়েছে সেদিকে খেয়ালই নেই। আঙুলে আগুনের সেঁকা লাগতেই তিড়িং করে নেচে উঠতে হয় দাছুকে। হাত ঝাড়া দিয়ে বিড়ির টুকরো ফেলে দিয়ে তবে সোয়াস্তি।

আচ্ছা দাছু, রাতদিন একনাগাড়ে বিড়ি না টানলেই কি নয়। এই বুড়ো বয়েসে কখন হাতমুখ পুড়ে বসেন তার কি ঠিক আছে কিছু। আর ভগবান না করুন যদি তেমনি কোনো ঘটনা ঘটে যায় তাহলে দিদির কাছেই বা পোড়া মুখ নিয়ে কী করে আপনি উপস্থিত হবেন বলুন তো ?—প্রকাশ বেশ একটু জোর দিয়েই এ কয়টি কথা বলে ফেলে।

এই যে প্রকাশ ভায়া এসেছো, বেশ হয়েছে। আর কথা কয়টিও তুমি বেশ খাসা বলেছো। কিন্তু ভায়া, আসল কথা কি জানো, জীবনে আমি মাত্র ছুটি জিনিসকে ভালোবেসেছি, আর এই ভালোবাসা ছাড়া অন্য যা কিছু করেছি সবই কর্তব্যের খাতিরে। তবে আমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে

বুঝতেই তো পারো আমার কাছে কর্তব্যের চেয়ে ভালো-বাসার দাম অনেক বেশি।—

এবার বক্তৃতা ছেড়ে দিয়ে আপনার ভালোবাসার জিনিস ছুটোর কথাই একটু বলুন, আমরা শুনি।—দাতুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে দাতুকে দিয়েই আসল পয়েন্টের সরাসরি উত্তর বার করে নিতে চান অকিঞ্চন ঘোষ।

হ্যাঁ, সে কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তোমাদের বোধ হয় আর সবুর সইছে না। যাই হোক, আযৌবন যে ছুটি জিনিসকে আমি ভালোবেসে এসেছি তার একটি হলেন তোমাদের দিদি এবং আর একটি এই বিড়ি। এ ছুই ভালোবাসার সামগ্রী নিয়ে কীইবা আর বলবো ভায়া, এ ছুই-ই সমান অভিমানী। আর অভিমানী বলেই ওদের এতো বেশি ভালো লাগে। মুখোমুখী হয়ে না থাকলে অর্থাৎ বুঝলে কিনা একেবারে মুখে করে না রাখলে মুহূর্তেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় ওরা। এ অবস্থায় এতোদিনের অদর্শনে তোমাদের দিদির হাল যে কী দাঁড়িয়েছে তা তো সহজেই অনুমান করতে পারছো। আর আমিও যে তাঁকে কাছে না পেয়ে কতো কাতর তাও নিশ্চয় তোমাদের বলে দিতে হবে না।

না না দাতু, তা আর কি বলার অপেক্ষা রাখে কিছু। আপনার ঐ চুপসে যাওয়া মুখখানিই বিরহ-কাতরতার মস্ত বড়ো বিজ্ঞাপন।—আসরের মাঝখান থেকে কে একজন জোর গলায় এ ছুটি কথা বলেই চট করে থেমে যায়।

কে, কে বললে এই কথা ?—দাহু জিগ্যেস করেন, কিন্তু আত্ম-পরিচয় দিতে বক্তা অনিচ্ছুক।

যেই বলে থাকো তার সোনার বদন মুখখানি দেখতে পেলে ভারি খুশি হতাম। কারণ বাছাধনের কথা ছুটি খাঁটি সত্যি। তবে কি জানো ভায়া, ভালোবাসার একটিকে কাছে না পেয়ে আর একটিকে সারাক্ষণ মুখে মুখে রেখে জ্বালা জুড়ই, একটু আনন্দ পাই—এই আর কি। তাতে হাতমুখ পোড়ে পুড়ুক, কী আর করা যাবে! এবার পরিষ্কার হলো তো সব ব্যাপারটা ?—আপন বিশ্লেষণে আপনি মুগ্ধ যোগেন মজুমদার।

কিন্তু আপনি যে দাহু হঠাৎ অন্য প্রসংগে চলে এলেন। এতোক্ষণ ধরে আপনি তো কেবল 'দিদি নিয়ে দিলাদিলি' আর 'বিড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করলেন। আসল সমস্যাটি দেখছি দিব্যি চেপে গেলেন।—সেটি কিছুতেই হতে দেবে না সুপ্রতুল।

তুমি আবার কোন সমস্যার কথা তুলছো সুপ্রতুল। সব সমস্যাই তো তোমরা একেবারে জল করে দিয়েছো।

না, না এ ঠাট্টার কথা নয় দাহু, আমাদের এ সান্ধ্য আসর নিত্য বসবে, এতে কোনোরকম ব্যাঘাত বরদাস্ত করা হবে না।

ঠিক বলেছেন সুপ্রতুলবাবু, এই হাসপাতালে দাহুর আসরই হলো মূল আনন্দ-কেন্দ্র। সেটি বন্ধ হয়ে গেলে কি নিয়ে থাকবো আমরা? আর তা আমরা বন্ধ হতেই বা দেবো কেন?—রাসমণির কণ্ঠে উত্তেজনা।

আরে অতো চটে গেলে কি চলে রাম্নু। ব্রজরাণী বলছিলো, আমি মেয়েদের ডাউন করে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি, তাই মেয়েরা আর এ আসরে আসবে না। তোমরাই যদি না আসবে তো আসর বসবে কাদের নিয়ে। আপনা থেকেই আসর ভেঙে যাবে। তাই আমি তোমাদের 'দাত্বর আসর' বন্ধ করে দেবার কথা বলছিলাম। মেয়ে হয়েও তুমি বলছো ব্রজরাণীর ঠিক উল্টো কথা। আর সব মেয়েরা তোমার দিকে না ব্রজরাণীর দিকে তাই বা কি করে এখন বুঝবো বলো।

আমরা ওসব কিছু বুঝি না দাত্ব। আসল কথা আমরা এ আসর বন্ধ হতে দেবো না। কেউ যদি না আসতে চায়, না আসবে, আমরা সবাই আসবো।—একই সঙ্গে কয়েকটি নারীকণ্ঠ চিৎকার করে ওঠে একপাশ থেকে।

দাত্ব, আপনি কোনো দিন আসা বন্ধ করবেন না, তাহলেই দেখবেন আসর ঠিক চালু থাকবে। ও নিয়ে আর অন্য কারো মাথা ঘামাতে হবে না।—আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাতে শুরু করে আর একদিক থেকে।

ঠিক কথা, এই হলো আসল কথা। দাত্ব এখানে উপস্থিত থাকলে আপনা থেকেই আসর চলবে। দাত্বর আসর দাত্বকে নিয়েই। মিশ্রির টুকরো ফেললে আপনা আপনিই পিঁপড়েরা সব তার চারধারে জড়ো হবে। তার জন্যে কাউকে ডাকারও দরকার নেই, সাধ্য-সাধনারও প্রয়োজন হয় না। আমাদের দাত্বও ঠিক তেমনি। কি বলেন আপনারা ?

আরে এই যে আমাদের শান্তু ভায়া যে। তুমি কখন এলে? তোমার তো কালকে আসার কথা, একদিন এ্যাডভান্সই এসে গেলে দেখছি।—একদিকে সমবেতভাবে জনতার পক্ষ থেকে 'ঠিক, ঠিক' বলে শান্তনুকে পূর্ণ সমর্থন আর একদিকে শান্তনুকে স্বয়ং দাদুর সাদর আপ্যায়ন—এই দৃশ্যের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু যেন বলতে চায় রাসমণি।

কি, তুমি কিছু বলবে রাসু?—জিগ্যেস করেন দাদু।

হ্যাঁ, হুকুম পাইতো কিছু বলবো ভাবছি।

কিন্তু কি বিষয়ে বলবে তা যে আগে আমার জানা দরকার। শেষে এই আনন্দের হাটে বসে তোমাদের নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি শুরু হয়ে না যায়। আমার তো কেবল সেই ভয়।—দাদু সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন আগে থেকে।

না দাদু, কোনোরকম তর্ক-বিতর্কের কথা আমি বলবো না। আমাদের মেয়েদের চরিত্রের একটি দিক নিয়ে আপনি যে আলোচনা করলেন, একটি সুন্দর গল্প বলে আপনি যেভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন, আমি বলতে চাই ব্রজরাণী তার মৌখিক প্রতিবাদ জানালেও মনে মনে আপনার প্রত্যেকটি কথা সে মেনে নিয়েছে। তার নিজের মুখ থেকে শোনা তার নিজের সম্বন্ধে বলা কথাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই।—রাসমণির এই কথায় আসরের মধ্যে বেশ একটা নড়াচড়া পড়ে যায়। ব্রজরাণী নিজেও আর এক খিলি পান

মুখে পুরে নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করে কবে আবার সে এমন ফেঁফাস কথা রাসমণিকে বলেছে যা সে এখন এখানে ফাঁস করতে চায়। প্রায় মাসেক হলো তাদের দুজনে কথা বন্ধ। রাসমণি সন্দেহ করেছিলো, ব্রজরাণী তার নামে দুর্নাম রটিয়েছে। তা নিয়ে তর্কাতর্কি, তারপরেই আড়ি। তার আগে কতো রকমের কথাবার্তাই তো হতো দুজনের মধ্যে। তার কিছু যদি রাসমণি প্রকাশই করে এই আসরের মধ্যে তাতে ব্রজরাণীর কীইবা এমন আসবে যাবে। সে তাই এ নিয়ে আর কোনো কিছু বলতে যাবে না, মনে মনে ঠিকই করে ফেলে ব্রজরাণী। তবু শুনে যাওয়া যাক রাসমণি কি বলে। সে জন্যেই তার অপেক্ষা।

কি দাদু, বলবো ?—মুহূর্ত নীরব থেকে রাসমণি অনুমতি প্রার্থনা করে।

বেশ বলো। তবে দেখো কোনো কথা যেন বাড়িয়ে বলো না। সাবধান, আমার বিরুদ্ধে 'বানিয়ে বলা'র যে অভিযোগ সে অভিযোগ আবার তোমার বিরুদ্ধেও যেন না ওঠে।—এ কথাগুলো রাসমণিকে বলা হলেও দাদুর আসল লক্ষ্য যে ব্রজরাণী তা বুঝতে আর বাকি থাকে না কারো। আসর জুড়ে তাই মুচকি হাসির লহরী খেলে যায়।

এই চাপা হাসির পরিবেশের মধ্যে রাসমণি তার বক্তব্য অতি সাবধানেই বলতে আরম্ভ করে।

কথাটা হলো কি, বিয়ের পরেও মেয়েদের বাপের বাড়ির দিকে যে একটা টান থাকবে তা স্বাভাবিক। বাপ-মা ভাই-

বোনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না সে তো আর হতে পারে না। তবে স্বামীর ঘর থেকে ভাইয়ের ঘরকে বেশি নিশ্চিন্ত আশ্রয় মনে করা যে কিরূপ বিপজ্জনক হতে পারে তাই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন দাদু। একজন তাতে আপত্তি তুলেছে এবং বলেছে, মেয়েদের সম্বন্ধে এসব বানানো গল্প। কিন্তু আমি জিগ্যেস করতে চাই, এমন ঘটনার কি অভাব রয়েছে বাঙলা দেশের সমাজজীবনে ?

জিজ্ঞাসার আর কোনো দরকার নেই, ব্রজরাণী তোমায় যা বলেছে বলে তুমি বলছো শুধুমাত্র সেটুকুই আমাদের শুনিয়ে দাও দেখি। এদিকে যে ঘরে যাবার ঘণ্টা পড়লো বলে।—এই বলে সময়ের দিকে অংগুলি নির্দেশ করেন দাদু।

আচ্ছা, শুধু সেটুকুই বলছি। দাদুর গল্পে যে আপত্তি জানিয়েছে সেই ব্রজরাণীই আমাকে মাস পাঁচছয় আগে একদিন বলেছিলো যে, দুটো ভাইয়ের সংসারকে রীতিমতো টানতে হয় তাকে। কখনো তার কর্তাকে জানিয়ে, কখনো না জানিয়ে যখন তখন দুভাইকে সাহায্য করতে হয়। না জানানো সাহায্যের পরিমাণ জানানো সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি। বিয়ের পর ছ বছর ধরে একইভাবে চলে আসছিলো। কিন্তু ব্রজরাণীর হাসপাতালে চলে আসার পর তার দু ভাইয়ের সংসারের যে কি হাল হয়েছে তা ভেবে সে অস্থির। ব্রজরাণীর নিজের বেলাতেই যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে দাদুর গল্পকে বানানো অর্থাৎ মিথ্যে বলা যায় কি করে ?

রাসমণি তার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়ে। সভা

নিস্তব্ধ। এমন কি ব্রজরাণীও এ নিয়ে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করা সংগত মনে করে না। অন্য কেউ না হোক, সে তো জানে রাসমণির বলা প্রত্যেকটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আসলে তার বলা কথাগুলোইতো সে নতুন করে এখানে বলেছে। কাজেই তার বিরুদ্ধে কীইবা আর বলার থাকতে পারে ব্রজরাণীর? বরং অনেক তথ্যই এখনো অনেকে জানে না। আটমাস ধরে ব্রজরাণী এই হাসপাতালে। এই সময়ের মধ্যে তার ভাই, ভাই-বৌ বা ভাইপোদের যে কেউ যখন এসেছে তাকে দেখার জন্যে ব্রজরাণী তার নিজের খরচ থেকে তার হাতে কিছু-না-কিছু তুলে দিয়েছেই। এতে কোনোদিন তার ভুল হয় নি। তাই রাসমণির কথার পর সে চুপ করে থাকবে না তো কি।

এই নীরবতারই সুযোগ পুরো মাত্রায় নেন দাদু। তিনি ঘোষণা করে দেন, দাদুর আসর বন্ধ করা হবে না, ঠিক মতোই চলবে। তবে একটা পরিকল্পনা হঠাৎ তাঁর মাথায় এসেছে। তাঁর মনে হয়, এখন থেকে আসরকে দুভাগে ভাগ করে দিলে কোনো তরফ থেকেই কোনোরকম অভিযোগ ওঠবার ভয় থাকবে না। একদিন বসবে পুরুষ বিভাগের অধিবেশন আর একদিন মহিলা বিভাগের। এই হলে পুরুষদের কাছে মহিলাদের ডাউন করার বা মহিলাদের সামনে পুরুষদের ছোট করার আর কোনো কথাই উঠতে পারবে না।

পরদিনের বৈঠকে শালা-ভগ্নীপতি বিষয়ক একটি গল্প আলোচনায় পুরুষদের চাবকানোর যে কড়া ব্যবস্থা রয়েছে সে

প্রসংগেরও উল্লেখ করেন দাছ্ এবং বলেন যে, সেই চাবুক মারার ব্যাপারটা মেয়েদের সামনে না হলেই হয়তো ছেলেরা খুশি হবে, কাজেই আসর সভ্য-সভ্যারা যদি রাজী থাকে তাহলে ছেলেদের আসর এবং মেয়েদের আসর পৃথক পৃথক ভাবে বসবে, এ সিদ্ধান্ত এখনই গ্রহণ করা যেতে পারে।

না দাছ্, তা হতেই পারে না, তা কখনোই হতে দেওয়া হবে না। পর পর কদিন ধরে মেয়েদের যতো রকমের কেচ্ছা গাওয়া হলো ছেলেদের সামনে, আর ছেলেদের চাবকানোর ব্যাপারটা হবে মেয়েদের আড়ালে রেখে! কেন তা হবে? আমাদের নিন্দে-কুৎসায় ওরা যে আনন্দ পেলো, ওদের কেচ্ছা শোনার সে আনন্দ থেকে আমরা কেন বঞ্চিত থাকবো?—পান চিবোতে চিবোতে গর্জে ওঠে ব্রজরাণী।

ঠিক বলেছে ব্রজরাণী, আসরকে ভাগ করতে দেওয়া হবে না। আমাদের কথা যদি ছেলেরা অমন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পারে, আমরাই বা ওদের কথা শোনবার সুযোগ ছাড়বো কেন? তা হবে না।—ব্রজরাণীর সমর্থনে দাঁড়িয়ে উঠে বলে রাসমণি। তারপর থেকেই ওদের ছুজনের মধ্যে আবার বেশ মিলমিশ, আগের মতোই অন্তরংগ ভাব।

আরে আসল কথা দেখছি কেউ ধরতে পারেনি। দাছুর এ একটা মোক্ষম চাল। এই পাঁচিল ঘেরা ভয়ের বেড়ায় আবদ্ধ হাসপাতালে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার এই সামান্য সুযোগটুকু বোধ হয় আর সইতে পারছেন না দাছ্। মেয়েদের সঙ্গে আলাপের মনোপলিটা দাছুর চাই। সে মতলবেই

পৃথক করে মেয়েদের নিয়ে আর একটা দাদুর আসর বসাবার প্রস্তাবনা। সেটি আমরা হতে দেবো না। দাদুর আসর যেমনি আছে তেমনি চলবে।—এতোক্ষণ পরে অনাদি মুখ খোলে। তার গলা শুনেই দাদু তাকান তার দিকে। আঙুলের টোকায় পোড়ামুখ বিড়ির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বলেন :

ও অনাদি ভায়াও এসেছো তাহলে। শান্ত ভায়ার সঙ্গেই এসেছো বুঝি। বেশ, বেশ! তা তোমরাই যখন নিজেদের সব গোলমাল মিটিয়ে নিয়ে তেলেজলে বেশ মিলেমিশে যাচ্ছো তখন আমি আর নতুন করে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ভাগাভাগির পাঁচিল তুলে দিয়ে পাপের ভাগী হতে যাই কেন? তুমি যা বল্লে তাই হবে, তোমাদের দাদুর আসর যেমনি চলছিলো তেমনি চলবে। তবে একটা কথা ভায়া, তোমরা ছেলেরা মেয়েরা মিলেমেশে একাকার হয়ে যাও তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, শুধু এই বুড়োর ঘাড়ে মেয়েদের ব্যাপারে মনোপলি টনোপলির অভিযোগ চাপিও না, এই অনুরোধ। আর একটা কথা। তোমার লাঙ-এর তো বেশ জোর আছে দেখছি। যে রকম চেঁচিয়ে গোটা হাসপাতাল কাঁপিয়ে কথা বললে লাঙ-এর খুব বেশি জোর না থাকলে তা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। যে দিনই অপারেশন হোক, তুমি খুব ইজিলিই তা ফেস করতে পারবে। ঘাবড়াও মৎ। —দাদু যোগেন মজুমদারের আশ্বাসে সত্যি সত্যি অনেকখানি ভরসা পায় অনাদি।

শান্তনুও সেই আশ্বাসের কথা তুলেই অনাদিকে আরো চাঙা করে তুলতে চায়।

এদিকে ঘরে ফেরার ঘণ্টা পড়ে গেছে। আসর ভেঙে যায়। আকাশে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকালো কেন? ও কিছু নয়, স্বাভাবিক কারণেই তা ঘটে থাকে। এসব ঘটনার ওপর আধিভৌতিক কোনো কারণ আরোপ করা মূর্খতা, কি একটা প্রসংগে দাদুই একথা একদিন বলেছিলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

এই যে ভালোদা, কোথায় চলেছো?

তোমার খোঁজ নিতেই তো চলেছি। হাতে আজ আর কোনো কাজ নেই। ভাবলুম, যাই অনাদির অপারেশনের কোনো চিঠি এলো কিনা জেনে আসি।

আমিও তো সে খবর নিয়েই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। আজই সকালে আর এম ও এসে আমায় এ চিঠিখানা দিয়ে গেলেন।—বলেই অনাদি পকেট থেকে একখানা টাইপ করা কার্ড তুলে এগিয়ে দেয় শান্তনুর হাতে।

ভালোই হয়েছে, আসছে শুক্রবার তোমার অপারেশনের দিন ঠিক করা হয়েছে। শুক্রবার অবধি আমি থাকবোই। হরষিৎ-পদ্মা ওরা আবার ঠিক করেছে আমাকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা দেবে। তার তারিখও নাকি অস্থায়ীভাবে ঠিক করে

ফেলেছে আসছে বুধবার। তা হলে সে সভায় তোমারও থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। কি বলো?

সে তোমার সম্বর্ধনা যে তারিখেই হোক আমি তাতে থাকবোই। তার জন্যে দরকার হলে আমার অপারেশনের তারিখ পাল্টানোর জন্যেও আমি সুপারকে অনুরোধ করবো। আর এ হয়তো তুমি জানোনা, বুধবার যে তোমার সম্বর্ধনার তারিখ অস্থায়ীভাবে ঠিক হয়েছে সে আমারই প্রস্তাব মতো—তোমার হরষিৎ বা পদ্মার কথা মতো নয়। —পদ্মা নাম শান্তনু উচ্চারণ করতেই পদ্মাকে খোঁচা মারতে উদ্যত হয়ে ওঠে অনাদি। হরষিতের নামটা সেখানে একটা উপলক্ষ মাত্র। পদ্মাই তার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে ভালোদার মনকে বিষয়ে তুলতে চেয়েছিলো তার বিরুদ্ধে, অনাদি কোনোদিন ভুলতে পারবে না সে কথা।

অনাদির সন্দেহটা খুব মিথ্যে নয়। শান্তনু অনাদিকে যে এতোটা ভালোবাসে তা মোটেই ভালো লাগতো না পদ্মার। তার কারণও আছে। শান্তনুর পর এবং সত্যনাথের আগে এই অনাদির দিকেই চোখ দিয়েছিলো পদ্মা। আসতে যেতে চলতে ফিরতে তার শাড়ি ও চুড়ির খসখস-টুংটাং শব্দ সময় সময় অনাদির দৃষ্টিকে ফেরাতে পারলেও তার মনের কাঁটাকে কখনো ঘুরিয়ে নিতে পারেনি পদ্মার দিকে। সব বুঝতে পেরেও অনাদি চুপ করে গিয়েছে। এমন কোনো কথা সে কখনো বলেনি যাতে পদ্মা আহত বা অপমানিত বোধ করতে পারে। এমন কি কোনো রকম উপেক্ষার ভাবও

সে কখনো তাকে দেখায়নি। অনাদির অকৃত্রিম ভদ্রতাবোধই তাকে সব সময় তাতে বাধা দিয়েছে। সহজ এবং সরলভাবে সে পদ্মার সঙ্গে কথাবার্তা বললেও তার ইশারায় সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে পদ্মা। সত্যনাথকে পেয়ে সে ক্ষোভের মাত্রা অনেকখানি কমে গেলেও অতি সূক্ষ্মভাবে পদ্মা যখন তখন অনাদি সম্বন্ধে কথা তুলেছে শান্তনুর কানে। প্রথম প্রথম তার বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলেনি। শান্তনুও তার কথা কখনো শুনেছে, কখনো মোটেই গ্রাহ্য করেনি। তবে ঐ শেষ-দিনের কথাটা তার খুব লেগেছিলো, কারণ অন্য কোনো মেয়ে সম্বন্ধে আর একজন মেয়ের কাছে এমন কিছু জিগ্যেস করা কোনো পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ বলেই সে মনে করে যা সে মেয়েটির নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং তা জানা মাত্রই সে তার মতামত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলো অনাদিকে। তার আগে পর্যন্ত অনাদি টেরই পায়নি পদ্মা তার বিরুদ্ধে কীভাবে অতি চতুরতার সঙ্গে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। সেদিন যে শান্তনু তাকে দুএকটা কথা বলেছিলো তাতে সে দুঃখ পেয়েছিলো এবং সেই দুঃখেই সে এ কয় দিন ভালোদার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি। সেই অভিমানের কথা সেই দুঃখের কথা জানা মাত্রই শান্তনু ছুটে এসেছিলো তার খবর নিতে। এতেই অনাদি বুঝতে পেরেছে ভালোদা তাকে কতো ভালোবাসে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই একদিন একটা কথা বলেছিলো শান্তনু। সে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনাদির। 'ভালোবাসার কি আর কোনো

কুলকিনারা আছে ভাই, ও একেবারে মহাসমুদ্রের মতো। আর আরো একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মানুষকে যতোই ভালোবাসা যায় ভালোবাসার ক্ষুধাও ততোই বেড়ে চলে। এও ঠিক বিত্তে দানের মতোই ব্যাপার—'যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে!' কতো উদার, কতো উঁচু মন হলে এমন কথা বলা চলে!

কালকের সন্ধ্যেটা ভারি আনন্দে কেটেছে তোমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে। আজও তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, খুবই ভালো হলো।—একটু থেমে অনাদি তার আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে। বাস্তবিকই শান্তনুকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে কদিন ধরে কম অশান্তি আর কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি অনাদিকে। কিন্তু কাল শান্তনু নিজে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হবার পর থেকে কী যে পরম শান্তি সে অনুভব করছে কোনো ভাষাই তা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না অনাদির।

চলতে চলতে অনেক বিষয় নিয়েই কথা হয় শান্তনু আর অনাদির মধ্যে। আজ আর তারা দাদুর আসরে যায় না। ভিড়ের বাইরে থেকে নিজেদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। কথায় কথায় নবজীবন সংস্কৃতি সংঘ ও 'নবারুণ' ত্রৈমাসিকের প্রসংগ তোলে শান্তনু।

আমার ঘরের অরিজিৎ ছেলেটি খুবই ভালো, বুঝলে অনাদি। ওর সঙ্গে তোমার বোধ হয় এখনো তেমন আলাপ হয়নি। একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশলেই বুঝতে পারবে ছেলেটি

ভারি উৎসাহী। ভাবছি, হরষিতের সঙ্গে অরিজিৎকেও লাগিয়ে দিয়ে যাবো 'নবারুণ' সম্পাদনার কাজে।

বেশ তো ভালোই। 'নবারুণে'র মহিলা বিভাগের কাজ সম্বন্ধে তো তুমি নিশ্চিন্তই আছো।—অনাদি উত্তর দেয়।

হ্যাঁ, পদ্মার ওপর যে ভার দেওয়া রয়েছে তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। তবু আমার চলে যাবার পর সব কিছুর দায়িত্বই তো পড়বে হরষিতের ওপর। পদ্মার কাজও তাকেই যাচাই করে নিতে হবে।

তাই বোধ হয় ভালো হবে। বুঝলে ভালোদা, কোনো ব্যাপারেই ওই মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আমার কেন জানি খুব ভালো লাগে না।

সে জন্যেই তো সকলে বলে তোমার এতো দুর্নাম। যাকগে সে সব, আর একটা বিষয় আমি ভেবে ঠিক করে রেখেছি। তা হলো আমাদের 'নবজীবন সংস্কৃতি সংঘ পাঠাগার' সম্বন্ধে। আমার তত্ত্বাবধানে সুপ্রতুলই অনেকদিন লাইব্রেরীটি চালিয়ে আসছে। আমি চলে যাবার পর তার একার পক্ষে সবটা দেখাশুনো করা কঠিন হবে। তাই সুপ্রতুলের সঙ্গে তোমাকেও ভাই লাইব্রেরীর কিছুটা ভার নিতে হবে।—অনেকটা অনুরোধের সুরেই শান্তনু এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। অনাদিও তা সানন্দেই মেনে নেয়, কোনোরূপ কুণ্ঠা দেখায় না। কেবল জানায়, অপারেশনের বড়ো ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠতে পারলে কল্যাণকর কোনো কাজের দায়িত্ব নিতেই সে কখনো আপত্তি করবে না।

ভগবানের ইচ্ছায় অপারেশন তোমার সাকসেসফুলই হবে আর ভালোও তুমি হয়ে উঠবে তাড়াতাড়ি। তোমার অপারেশন তো আমি নিজেই দেখে যাবো। দায়িত্ব তোমার ওপর দেবার আগে তোমার অপারেশনের কথাও আমি যে ভাবিনি তা নয়। একবার পঞ্চাননের কথা মনে হয়েছিলো। তুমি হয়তো জানো না, পঞ্চানন চক্রবর্তীই ছিলো হাসপাতালে এই 'নবজীবন সংস্কৃতি সংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী। প্রথম দিকে সেই তো ছিলো সংঘের সেক্রেটারী। যে কোনো ভালো কাজে তার সাহায্য পাওয়া যেতো। কিন্তু সবইতো জানো, হালে ঐ বিশ্রী ঘটনাটা ঘটে যাবার পর কোনো ব্যাপারেই আর সে আসে না। আর তাকে অনুরোধ করেও কোনো কাজে আনা যাবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া পঞ্চাননের বোধহয় ছাড়া পাওয়ারও সময় হয়ে এসেছে। দু-তিনদিন আগে তেমন একটা কথাও শুনেছিলাম। কাজেই ওর নামটা সুপ্রতুলের সহযোগী হিসেবে বাতিল করে তোমাকেই আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

বেশ তো ও নিয়ে আর এতো বলাবলির কি আছে। তুমি যাকে যে কাজের ভার দেবে আমি জানি সবাই তা মাথা পেতে নেবে। তবে আমার মনে হয়, আমাদের সংঘের কার্যকরী সমিতির একটা সভা ডেকে সেখানে সবার সামনে এক এক জনের ওপর এক একটা কাজের ভার দিয়ে দিলে ভবিষ্যতে তা নিয়ে কোনো কথা উঠবে না। তাই করা উচিত।

তাই তো করা হবে। তবে তার আগে যাদের ওপর কাজ চাপিয়ে দেবো তাদের মতামত না জেনে নিলে চলবে কেন। হরষিৎ সংঘের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, সভা-টভা সে-ই ডাকে। আজই সে সংঘের কার্যকরী সমিতির একটা সভার নোটিশে আমার সই নিয়ে গেছে। আসছে মঙ্গলবার বিকেলে সে সভা। সেখানেই পাকাপাকিভাবে সব কাজ বেঁটে দেবার ব্যবস্থা হবে।—শান্তনু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলে অনাদিকে। অনাদিও আর ও নিয়ে কিছু বলে না।

ফুলবাগানের ধারে একটা বেঞ্চের ওপর যেয়ে বসে ওরা দুজনে। পড়ন্ত রোদের আভা ফুলের রঙের মেলায় অপূর্ব সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়। সেই সৌন্দর্যের নেশায় পেয়ে বসেছে বুঝি অনাদিকে। অনেকক্ষণ ধরে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে বাগানের দিকে, কী যেন গভীর ভাবে ভাবছে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না শান্তনু। কি করবে সে? ডাকবে অনাদিকে? তাই ডাকে।

এতো কি ভাবছো অনাদি!—ডাক শুনেই চমকে ওঠে অনাদি। প্রথমটায় ঠিকই করে উঠতে পারে না কি উত্তর সে দেবে। তারপর ধীরে সুস্থে বলে, ভাবছিলাম কি জিগ্যেস করছো ভালোদা—ভাবছিলাম রত্নার কথা।

কেন, হঠাৎ তার কথা অমন করে ভাবছো, কী হয়েছে?

হ্যাঁ তোমায় সে কথা বলা হয়নি। এইতো গেলো রোববারের ব্যাপার। অনুপম তার বৌদিকে নিয়ে সেদিনও যথারীতি এসেছিলো। কথায় কথায় তাপসী হঠাৎ বলে

ফেললে রত্নার জ্বরের কথা। তারপরেই অবশ্যি দেওর ও বৌদি মিলে আমায় অনেক করে বুঝিয়েছে যে, ও কিছু নয় নেহাৎই সর্দিজ্বর, একদিন বা দুদিনেই সেরে যাবে।

তাইতো, এইটুকু ছেলেমেয়ের জ্বর-সর্দি এক-আধটুকুও কি হবে না? হবে আবার সেরে যাবে। ও নিয়ে আবার ভাববার কি আছে ভাই। আর তোমায় সে খবরটা দেবারই বা কী এমন দরকার ছিলো তাও তো বুঝি না। হয়তো কোনো অসতর্ক মুহূর্তেই কথাটা বলে ফেলেছেন তোমার গিন্নী। আমাদের বাড়ির কথা বলতে পারি, গত দুবছরের মধ্যে কেউ কোনোদিন ভুল করেও আমার কাছে কারো কোনো অসুখ বিসুখের খবর দেয় নি। যে কেউ যখন দেখা করতে আসে, প্রত্যেকেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে যায় সবাই ভালো আছে।

তাইতো স্বাভাবিক, তাই উচিত। তবে তুমি যা বলেছো, নেহাৎ অসতর্কতার জন্যেই তাপসীর মুখ দিয়ে 'রত্নার অসুখের কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিলো। পরে তা সংশোধন করে নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেও আমার মনকে আমি কিছুতেই আর শান্ত করতে পারি নি। কি বলবো ভালো-দা, রোববার সারাটা রাত ছটফট করে কাটিয়েছি। আমার জন্যে আমার ঘরের অন্য দুই রোগী অবিনাশ এবং সতীশদারও হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হয়ে থাকবে। কিন্তু রত্না ও সুবাসের কথা ছাড়া আর কোনো কথাই তখন আর আমি ভাবতে পারছিলাম না। এবং তাদের কথা ভাবতে ভাবতে আমি

শেষরাত্তের দিকে এমন একটা কাণ্ড করে বসেছি যা বললে তুমি নিশ্চয় আমায় পাগল বলবে।—এই বলে অনাদি পরোক্ষে নিজেই নিজের কাজের সমালোচনা করে।

কী আবার কাণ্ড করেছো?—শান্তনু কিছুই অনুমান করতে না পেরে বেশ একটু ভাবিত হয়েই প্রশ্ন করে।

বলতে আমার নিজেরই এখন কেমন যেন সংকোচ লাগছে।

বলোই না।—শান্তনু তাগিদ দেয়।

রাত্রিতে কিছুতেই আমার ঘুম হচ্ছিলো না এবং কেবলই মনে হচ্ছিলো, সুবাস ও রত্নার ফটো আমার ঘরে টাঙিয়ে রাখা মোটেই উচিত হয়নি। যে ঘরে আমরা তিন তিনটে টি-বি রোগী সে ঘরে আমি সুবাস ও রত্নাকে রেখেছি? ক্ষয় রোগের হাসপাতালে আমার ছেলেমেয়েকে আমি এনে রেখেছি বাপ হয়ে? কেমন বাপ আমি! মেয়েটার জ্বর জ্বর হয়েছে, হয়তো খুব খারাপ জ্বর। আমারও তো প্রথম প্রথম জ্বর জ্বরই হতো, পরে ধরা পড়লো তা সাধারণ জ্বর নয়—খুব খারাপ জ্বর। আমার রত্নার হঠাৎ জ্বর হলো কেন? টি-বি বড্ড ছোঁয়াচে রোগ। তারই জন্যে টি-বি রোগীকে পৃথক হয়ে দূরে সরে থাকতে হয়। আর আমি আমার নিজের ছেলে-মেয়েকে এনে রেখেছি যক্ষ্মা রোগীদের মধ্যে। রত্নার জ্বর হয়েছে। টি-বির ছোঁয়াচ লাগেনি তো! ভারি ভয়। সুবাসেরও যদি আবার জ্বর হয়। যদি টি-বির ছোঁয়াচ লাগে! ভাবতে ভাবতে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। দেয়ালে টাঙানো ওদের ভাইবোনের

ফটোখানাকে খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছি। ছবির নিচে ওদের মায়ের হাতে লেখা 'টুটুল ও বুবলি' ঐ রাতের অন্ধকারের মধ্যেই আমার চোখে যেন জ্বল জ্বল করছিলো। এই কঠিন সংক্রামক রোগের হাত থেকে সুবাসকে রত্নাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে খুব জোরে দীঘির জলে ফটোখানিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। একটু বাদেই আকাশে ভোরের পাখি ডেকে গেলো। ঘরের মেঝেতে ভোরের আলো এসে পড়তেই মনে হলো, এ আমি কি করলাম!—প্রায় উন্মাদের মতোই এতোগুলো কথা একটানা বলে চুপ করে যায় অনাদি।

বাস্তবিকই কী করে তোমার এমন মনে হলো, ফটোতে ছোঁয়াচ লেগে তোমার ছেলেমেয়ের টি-বি হয়ে যেতে পারে? —সব শুনে শান্তনু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

কিন্তু আমি তো ভালোদা এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তরই এখন আর দিতে পারবো না। আগেই তো বলে নিয়েছি যে, এমন একটা কাণ্ড করে বসেছি যা শুনলে না হেসে পারবে না। সত্যি তাই। তবে যাই বলো, সোমবার অফিসে এসে অনুপম ফোন করে যদি রত্নার জ্বর ছেড়ে যাবার খবর না জানাতো তাহলে আমার পক্ষে পুরোপুরি শান্ত হওয়া সম্ভবই হতো না। সে খবরটা পেয়েছিলাম বলেই বিকেলে তোমাদের সঙ্গে বেরোতে পেরেছিলাম।—অনাদির প্রত্যেকটি জবাবে তার সন্তানবাৎসল্যের গভীরতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার কিন্তু এখন বেশ মনে পড়ছে, কাল বিকেলে যখন তোমার ঘরে গেলাম তখন টুটুল আর বুবলির ফটোখানা আর দেয়ালের গায়ে দেখতে পাইনি। কিন্তু তুদিন বাদে আজ আবার সেকথা তুমি ভাবতে শুরু করলে কেন, তাই আমায় ভাবিয়ে তুলছে।

কেন ভালোদা, এতো তোমাকে মোটেই ভাবিয়ে তোলার মতো ব্যাপার কিছু নয়। নিতান্তই সামান্য একটি ঘটনা। এই বেঞ্চিতে এসে বসতেই আমার চোখ পড়ে যায় ঐ সুন্দর ডালিয়াটির ওপর। আমার মনে হচ্ছিলো, ডালিয়ার রূপ নিয়ে আমার রত্নার মুখখানিই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। অনেকদিন আমি রত্নাকে দেখিনি। তাই একমনে ঐ ডালিয়ার দিকে চেয়ে থেকে আমার রত্নাকে আমি প্রাণভরে দেখছিলাম।—বলতে বলতে অনাদি নিজেকেই যেন একেবারে হারিয়ে ফেলে।

অপূর্ব! এর পরে এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলা চলে না। তবে আমার একটা কথা প্রায়ই কি মনে হয় জানো ভাই, আমাদের ছেলেমেয়েরা এ রোগে আক্রান্ত হবে না, তারা এই কাল রোগের প্রতিরোধে সারা দেশ জুড়ে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করবে যে শক্তি ভারতের মাটি থেকে নির্মূল করবে যক্ষ্মার বীজাণু।—শান্তনুর চোখ তুটো যেন দপ দপ করে জ্বলে ওঠে এ কথা বলতে বলতে।

তোমার এ স্বপ্ন সত্যি হবে ভালোদা।

কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। এ আমার অলীক স্বপ্ন

নয় ভাই, এ আমার অটল বিশ্বাস।—বদ্ধমুষ্টি তুলে তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রকাশ করে শান্তনু। অনাদি মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

তোমার খুব অবাক লাগছে আমার কথা শুনে, তাই না অনাদি! কিন্তু তুমি একটু ভেবে দেখো, তোমার ছেলে আমার ছেলে তাদের বাপকে দেখতে পাচ্ছে না কতো দিন ধরে। অন্য ছেলেরা যখন তাদের বাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আর নয়তো ধরো বর্ষার দিনে ঘরে বসেই বাবার মুখে ইতিহাসের কিংবা রূপকথার সুন্দর সুন্দর গল্প শোনে সে সব দেখেশুনে তোমার-আমার ছেলের মনও তো খুঁজে বেড়ায় তাদের বাপকে। তেমনি কতো সন্তানকে মা-ছাড়া হয়ে থাকতে হচ্ছে দিনের পর দিন, মাসের পার মাস, এমন কি বছরের পর বছর। শুধু তাই নয়, এই দুরন্ত রোগ কতো শিশু, কতো বালক-বালিকাকে পিতৃমাতৃহারা করে দিচ্ছে তারই কি কোনো সংখ্যা-সীমা আছে? এদের সবার মনে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে তীব্র একটা ক্ষোভ জমে উঠবেই এবং তার ফলে এমন একটা প্রতিরোধ-আন্দোলনের সৃষ্টি হবে যাতে করে আমাদের দেশ থেকেও এই যক্ষ্মারোগ চিরতরে দূর হয়ে যাবে।—শান্তনুর এই কথা এক পরম আশার জ্যোতি ছড়িয়ে দেয় অনাদির চোখে মুখে। শেষ সূর্যের আভার সঙ্গে মিলে গিয়ে তা এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

বাঃ ভালোদা, তোমরা দিব্যি এই নিরিবিলিতে বসে গল্প জমিয়ে নিয়েছো, আর আমি বেচারা তোমাদের এদিক ওদিক

খুঁজে মরছি।—বলেই ধপাস করে শান্তনুর একপাশে বসে পড়ে হরষিৎ।

কী ব্যাপার, হঠাৎ এতো খোঁজাখুজি?—অনাদিই প্রথম প্রশ্ন করে হরষিৎকে।

মঙ্গলবার বিকেলেই আমাদের সংঘের কার্যকরী সমিতির সভা হবে। সুপারের সঙ্গে কথাটা পাকা-পাকি করে এলাম। সুপার এবং মিসেস মুখার্জি হুজনই সভায় উপস্থিত থাকবেন কথা দিয়েছেন। তা জানাবার জন্মেই তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি জানতাম, ভালোদা আজ তোমার কাছে যাবে। কারণ তোমার অপারেশনের ডেটটা জানবার জন্মে গোড়া থেকেই সে ছটফট করছে। তোমার ঘরে গেলেই হুজনকে পাবো ভেবে তোমার ওখানেই প্রথম গিয়েছিলাম। সেখানে না পেয়ে গেলাম দাহুর আসরে। এদিক ওদিকে কোথাও তোমাদের চোখে পড়লো না। দাহু আজ আবার দেখলাম, গলা 'ছেড়ে একেবারে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন। সবাই কানখাড়া করে সে গান শুনছে। কিন্তু সেখানে তোমাদের কোনো পাত্তা না পেয়ে এদিকে চলে এলাম।—হরষিৎ বিস্তারিতভাবেই উত্তর দেয়।

সে কি হে, দাহুর গানটা না শুনেই চলে এলে? তোমাকে তো রসিক মানুষ বলেই জানতাম, কিন্তু এ তুমি কি করলে? জানোনা বোধহয় দাহু খুব ভালো গান জানেন। তোমরা শোনোনি, কিন্তু আমার ঘরে নিয়ে একা একা বসিয়ে আমি বেশ কদিন তাঁর গান শুনেছি। অবশ্য ওকে গান গাওয়ানো

খুবই মুশকিল। আচ্ছা, কোন গানটা তিনি গাইছিলেন বলতে পারো?—দাদুর গানের সত্যিকারের একজন সমঝদার শান্তনু, তাই সে জানতে চায়।

হ্যাঁ যেটুকু শুনেছি সেটুকু আমার বেশ মনে আছে। ভারি সুন্দর একটি কলি, তাই এতো তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে যায় নি।—এই বলে হরষিৎ দাদুর গানের শোনা কথা কয়টি শান্তনু এবং অনাদিকে শুনিয়ে দেয়ঃ

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ, দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।...

এই দাদু লোকটিকে সত্যি সত্যি পুরোপুরি বুঝে ওঠা কঠিন। কতো কীই যে জানেন ভদ্রলোক তার ঠিকঠিকানা নেই। সর্বক্ষণ একটা নিরুদ্বেগ হাসির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেও কি বড়ো কম কথা!—হরষিতের মুখে দাদুর গাওয়া গানের কথা কয়টি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই দাদু সম্বন্ধে এই মন্তব্য করে অনাদি।

কিন্তু সেসব তো হলো, মঙ্গলবার দিন সভার ব্যবস্থা করলে—মঙ্গলবারই তো মনে হচ্ছে আমার আবার ফর্টনাইটলি পরীক্ষার তারিখ। হ্যাঁ ঠিক তাই, মঙ্গলে মঙ্গলে আট আর এক মঙ্গলে পনেরো।—একই তারিখে দুটো ব্যাপার পড়ে যাওয়ায় শান্তনু যেন একটু অসুবিধে বোধ করে।

বারে, তাতে তোমার কি অসুবিধে ভালোদা! সকালবেলা

ডাক্তারবাবুরা তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন আর বিকেলবেলা তুমি সংঘের কার্যকরী সমিতির সভায় যাবে। কোনোটাই তো কোনোটার অন্তরায় নয়।

হ্যাঁ, তা অবশ্যি ঠিক। তার পরদিনইতো তোমরা আবার এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছো। এসব অকারণ ঝামেলা বাড়িয়ে লোককে ব্যতিব্যস্ত করে কি লাভ বলো তো?

ওর মধ্যে আবার তুমি মাথা গলাতে আসছো কেন? ওটা সম্পূর্ণই আমাদের নিজেদের ব্যাপার।—রীতিমতো ধমকের সুরেই উত্তর দেয় অনাদি। ভালোদাকে ভালোবাসার ধমক।

এর পরই ওরা তিনজন যে যার ঘরের দিকে চলে যায়।

॥ পনেরো ॥

দেখতে দেখতেই পক্ষকাল কেটে যায়। মাঝে এক মঙ্গলবার গেছে, আজ আর এক মঙ্গলবার। আজই আবার কনফারেন্স রুমে যেতে হবে শান্তনুকে। ছুটির আগে এই হয়তো তার শেষ পরীক্ষা। আজ ভোর থেকেই তাই মুখখানি তার ভার ভার।

প্রায় দুবছর কালের দীর্ঘ হাসপাতাল জীবনের পরিসমাপ্তির সম্ভাবনায় কোথায় আনন্দ হবে, তা না হয়ে শান্তনুর এই বিমর্ষতায় আশ্চর্য হয় নতুন রোগীরা। খুব সকাল সকাল শয্যাত্যাগের অভ্যাস শান্তনুর। কিন্তু আজ

তাকে মনমরা অবস্থায় অনেক বেলা অবধি শুয়ে থাকতে দেখে তার ঘরের অরিজিৎই প্রথম বিস্ময় প্রকাশ করে।

আজতো আপনার আনন্দের দিন ভালোদা। ডাক্তারবাবুরা আজ আপনার ছুটির দিন ঘোষণা করবেন তার চেয়ে আর ভালো খবর কি হতে পারে। কিন্তু তবু আপনি এমনভাবে মুখ কালি করে এখনো শুয়ে আছেন কেন?—শান্তনুকে অরিজিৎ ভালোদা বলে ডাকতে শুরু করেছে এই নতুন।

কাজেই অরিজিতের এ প্রশ্নে একেবারে নিরুত্তর থাকতে পারে না শান্তনু। তাই জোর করে হলেও একটু হাসবার চেষ্টা করেই তাকে বলতে হয় 'এই উঠছি'।

তারপরে আরো অনেকেরই চোখে পড়েছে শান্তনুর চেহারায় আজকের এই অস্বাভাবিকতা। নতুন রোগীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করছে তা নিয়ে। তাদের অবাক হবারই কথা। তারা তো আর জানে না, ছুটি হয়ে গেলে শুধু যে সমাজবর্জিত জীবনই তাকে যাপন করতে হবে তা নয়, বাইরের সমস্ত সাহায্যও তার বন্ধ হয়ে যাবে। কাল প্রায় সারা রাত ধরে সে কথাই সে কেবল ভেবেছে।

পারিবারিক দুরবস্থার সামান্য একটু আভাষ শান্তনু দিয়েছে দাদুকে। দাদুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার কাছ থেকে সেটুকু বার করেছে। তবু অনেক কথাই সে বলেনি। কারণ দারিদ্র্যের বিজ্ঞাপনে তার বড়ো আপত্তি। তাতে মনের সম্পদেও যে টান পড়ে।

শান্তনুর কোনো সম্পাদক বন্ধু তাকে না জানিয়েই তার

নামে এক আবেদন প্রচার করেছিলেন তার পত্রিকায়। প্রথমটায় সে তাতে ক্ষুব্ধই হয়েছিলো। সম্পাদক বন্ধুকে তার কাছ থেকে বেশ কিছু কড়া কড়া কথাও শুনতে হয়েছে তার জন্যে। কিন্তু দাতাদের ঔদার্যে শেষ পর্যন্ত সে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁদের এক একখানা চিঠি তার কাছে এই প্রমাণ নিয়ে এসেছে যে, মানুষের হৃদয়গুলো এখনো সব মরুভূমি হয়ে যায়নি, সহানুভূতির স্রোতধারা এখনো বহু হৃদয়ে বয়ে চলে।

সম্পাদক বন্ধুর ঐ একটি আবেদনের ফলেই একবারে বেশ কিছু সাহায্য জমেছিলো শান্তনুর হাতে। সেই টাকা দিয়ে বাবার অনেকগুলো দেনা শোধ করে দিয়েছে শান্তনু। শুধু তাই নয়, সেই আবেদন দেখে দুজন ভদ্রলোক ও একজন মহিলা প্রতিমাসেই তার কাছে কিছু কিছু সাহায্য পাঠিয়ে আসছেন গত একবছর ধরে। এরা তিনজনেই বাঙালী, কিন্তু বাঙলার বাইরের বাসিন্দে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কোলকাতা থেকে এক অবাঙালী অজ্ঞাত সাধু প্রতি অমাবস্যার পরদিন কিছু আশীর্বাদী ফুল-বিল্বপত্র, প্রসাদ এবং কিছু অর্থ পাঠিয়ে থাকেন তাঁর এক শিষ্যকে দিয়ে। আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা এবং প্রসাদ হাত পেতে নিলেও শান্তনু প্রথমবার অসম্মতই হয়েছিলো সাধুর অর্থ গ্রহণে। অন্যের অর্থের ওপর নির্ভর করতে হয় সাধুদের। পরের কাছ থেকে পাওয়া সাধুর সে টাকা সে গ্রহণ করতে পারে না, এই যুক্তিতে শিষ্যকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলো শান্তনু। কিন্তু

পারেনি। অনেক পীড়াপীড়ির পর তাকে সে টাকা নিতেই হয়েছে। এখনো সে সেই সাধুর কাছ থেকে শিষ্য মাধ্যমে প্রতি মাসেই টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই শিষ্যের কাছ থেকে গুরুর ঠিকানার কোনো সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। যাই হোক, সব মিলিয়ে শান্তনুর হাতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মতো সাহায্য আসতো মাসে মাসে। তাতে নিজের ওষুধপত্রের জন্যে সামান্য খরচ করেও বাড়িতে অন্তত ত্রিশটা টাকা সে পাঠাতে পারতো। তাতে অনেকখানি সাহায্য হতো তাদের সংসারের। কিন্তু যে মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাবে যে শান্তনু সমাদ্দার ভালো হয়ে গেছে—সে বাড়ি চলে গেছে ছুটি পেয়ে তখন আর কে তাকে সাহায্য করবে। এমন কি সাধুবাবার আশীর্বাদ থেকেও সে বঞ্চিত হবে। আর সুস্থ মানুষ হিসেবে কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য প্রত্যাশা করা বা কারো সাহায্য গ্রহণ করাও তো সঙ্গত হবে না। অথচ বাবার সামান্য আয় ও একয়টি সাহায্যের টাকায় যে সংসারটি কোনোরকমে টিকে ছিলো এর পরে কী করে চলবে তাদের ? এই দারুণ দুশ্চিন্তাই শান্তনুর বিমর্ষতার আসল কারণ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হয় শান্তনু। রুটিন মাফিক ডাক পড়ে তার কনফারেন্স রুমে। পরীক্ষাও হয় যথারীতি। কিন্তু এবার আর আগের বারের মতো জিজ্ঞাসাদির তেমন দরকার হয় না।

নতুন এক্স-রে প্লেটটা ডাক্তাররা সবাই মিলে দেখলেন

একবার। নিজেদের মধ্যেও ডাক্তারদের কথাবার্তা তেমন বিশেষ হলো না, অনেকটা আকারে-ইংগিতেই যেন মতামত বিনিময় হলো।

একবার মাত্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, কী বলেন ডাঃ গুপ্ত, সব ঠিক আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

ইয়েস স্যার।—সুপারের মনের ভাবটি বুঝে নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো মনে করলেন গুপ্ত সাহেব।

পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখার্জি যেন মুখস্ত লিখে যান শান্তনুর চার্টখানার ওপর। অদূরে দাঁড়িয়ে শান্তনু তা লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে চোখ দুটো তার যেন বড়ো হয়ে ওঠে।

ডাঃ মুখার্জি লিখেছেন: ফিট ফর ডিসচার্জ। পেশেণ্ট স্যুড লিভ হসপিটাল উইদিন এ উইক।

তার নিচে টানা টানা হরফে তিন অক্ষরে সুপারের স্বাক্ষর। সই করতে করতেই অর্ডারটা একবার ঘোষণাও করে দেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

এরপর আর কাকে কি বলার থাকতে পারে শান্তনুর। কনফারেন্স রুমে আর মুহূর্ত কালও দাঁড়িয়ে থাকায় তার অনিচ্ছা। তক্ষুনি সে ডাক্তারবাবুদের বিদায় নমস্কার জানিয়ে চলে আসে তার নিজের ওয়ার্ডে।

ওয়ার্ডে আসতেই এবারও তেমনি ভিড় জমে শান্তনুকে ঘিরে। তার ছুটির অর্ডারের কথা শুনে এক-একজন এক-

এক রকমের আশ্বাস দেয় তাকে। বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ আবার এক আধটুকু রসিকতাও করে তার ভবিষ্যৎ রঙীন দাম্পত্য জীবন নিয়ে। দুঃখের মধ্যেও হাসির ঢেউ লাগে তার মনে সে সব কথায়। স্ত্রী আর ছেলে, মা-বাপ আর বোন-বৌদির মধ্যে আবার ফিরে যাবে সে, আনন্দ হবারই তো কথা। কিন্তু অনেক বিবেচনার প্রশ্ন যে এসে দাঁড়ায় সেই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার সামনে! কাজেই মনে তার আনন্দভাব আসবে কি করে?

রোগীবন্ধুরাও মনে মনে ব্যথা বোধ করে শান্তনুকে ছেড়ে দেবার কথা ভেবে। সে যে কতো আপন তাদের সকলের তার বিদায়ের কথা মনে করতেই তা যেন আরো বেশি করে ধরা পড়ে। রোগীদের কল্যাণের জন্যে বছর দেড়েকের মধ্যে শান্তনুর চেষ্টায় কতো কিছুই না হয়েছে দীননাথ হাসপাতালে। শান্তনু অবশ্য যোগ্য লোকদের ওপরই নানা কাজের ভার দিয়ে যাবে শোনা যায়, তাহলেও সে চলে গেলে নতুন লোকদের দিয়ে কোনো কাজই যে আর আগের মতো সুষ্ঠুভাবে চলবে তেমন আশা কেউ করে না হাসপাতালে।

এই একটু আগে পঞ্চাশ কপি 'নবারুণ' ডেলিভারি দিয়ে গেছে প্রেস থেকে।—হরষিৎ 'নবারুণে'র আনন্দদা বিশেষ সংখ্যার কয়েক কপি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির শান্তনুর ঘরে। শান্তনুর হাতে এক কপি তুলে দিয়েই সে এই খবর জানায় সকলকে। প্রত্যেকেই এক এক কপি 'নবারুণ' তুলে নিয়ে দেখতে থাকে।

সুমিত্রার এবারের কভারটি কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট হয়েছে।—প্রকাশ হঠাৎ মন্তব্য করে।

সত্যি বলেছো ভাই, তুলির রেখায় আনন্দদা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন ছবিটায়।—সুপ্রতুলের দিক থেকে সমর্থন আসে।

বাস্তবিকই গভীর দরদ ও আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে ছবিখানার মধ্যে। এই শিল্পীও কি আমাদের এই হাসপাতালেরই?—অরিজিৎ শান্তনুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে শান্তনুর গাল বেয়ে।

ও কি ভালোদা, আপনার চোখে জল?—অরিজিতের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসায় অবাক হয়ে যায় সবাই। রুমালে ততোক্ষণে চোখমুখ মুছে নিয়েছে শান্তনু।

ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।—বলে অরিজিতের দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যায় শান্তনু এবং প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানায়—দরদ, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা ছাড়া কোনো ভালো কাজই সুন্দরভাবে শেষ করা যায় না। সুমিত্রার মধ্যে পুরোমাত্রায় সে গুণ রয়েছে এবং সে এই হাসপাতালেরই এক রোগিণী মাস আট-নয় ধরে। ছবি আঁকায় মেয়েটির গভীর নিষ্ঠা, এ ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তার তেমন কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ নাকি নেই। হাসপাতালের কোনো অনুষ্ঠানে বা ব্যাপারে তাকে বড়ো একটা দেখা যায় না। ছবি এঁকেই সে দিন কাটায়। কখনো সখনো বাইরে বেরোলেও একা একাই খানিক ঘুরে বেড়িয়ে আবার ঘরে ফিরে যায়।

এই সুমিত্রাকে শিল্পী হিসেবে কী করে যে শান্তনু আবিষ্কার করলো তাও এক জানবার কথা। এ হাসপাতালে আসার কিছুদিন বাদেই খেয়ালে খেয়ালে সে একখানা ছবি এঁকে ফেলে সুপারের। তার বেডের টেবিলের ওপরেই পড়েছিলো ছবিখানা। হঠাৎ তা একদিন চোখে পড়ে যায় সুপারের এবং তা দেখে তিনি ভারি খুশি। সুমিত্রার কাছ থেকে তিনি চেয়েই নিয়ে যান ছবিখানি এবং বাঁধিয়ে নিয়ে নিজের বৈঠকখানায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখেন। তরুণ শিল্পীর কাছে এ নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয় বৈকি!

দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সুপারের সেই ছবিখানার দিকে নজর পড়তেই শান্তনু কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলো শিল্পীর পরিচয় জানবার জন্যে। সে পরিচয় পাবার পরই সে যোগাযোগ করে সুমিত্রার সঙ্গে এবং 'নবারুণে'র চিত্রাংকনের সব ভারই সে চাপিয়ে দেয় তার ওপর। কভার ছাড়াও আরো কখানা ছবি এঁকে দিয়েছিলো সুমিত্রা 'নবারুণে'র নববর্ষ সংখ্যার জন্যে। তার প্রত্যেকটি ছবিই এতো ভালো হয়েছিলো যে সম্পাদক তার একখানাও বাদ দিতে পারেননি, সবগুলোই ছেপেছিলেন।

হরষিৎ আর বেশিক্ষণ বসে না। বসবার তার সময় নেই। বিকেল তিনটের সময় আজই আবার 'নবজীবন সংস্কৃতি সংঘে'র কার্যকরী সমিতির সভা। সেকথা শান্তনুকে এবং আর সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথাসময়ে সুপারের অফিস ঘরে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানায় হরষিৎ।

অরিজিৎ ছাড়া শান্তনু, অনাদি, সুপ্রতুল, প্রকাশ চারজনই কার্যকরী সমিতির সদস্য। তারা চারজনই ঠিক সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে, এ আশ্বাস আদায় করে নিয়ে হরষিৎ বিদায় নেয় শান্তনুদের ঘর থেকে। বাকি আর সবাইও চলে যায় একটু পরেই।

খাওয়াদাওয়ার পর আজ আর তেমন অবকাশ নেই বিশ্রামের। সুপ্রতুল ও অনাদি, এ দুজন আবার দিবানিদ্রায় খুব বেশি রকম অভ্যস্ত। তারা দুজনেই মনে মনে হরষিতের চৌদ্দপুরুষকে স্মরণ করেছে বে-আক্কেলে সময়ে সভা ডাকার জন্যে। বেলা তিনটের সময় সভা ডাকলে তাতে কোনো ভদ্রলোক যোগ দিতে পারে? কিন্তু কথা দেয়া হয়ে গেছে, না গিয়ে উপায় নেই। তাই নিদ্রা-সুখের লোভ ত্যাগ করেই তাদের সভায় যেতে হয় এবং হরষিতকে গালমন্দ করতে করতেই তারা সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের আগেই অবশ্য শান্তনু সমাদ্দার তার অভিপ্রেত আসনে এসে বসে আছে। সে বসেছে সবার পেছনের সারিতে একটি কোণায়।

সভা অবশ্য বেশিক্ষণ ধরে চালানোর প্রয়োজন হয় না। সংঘের বিভিন্ন কাজের জন্যে শান্তনুর প্রস্তাবিত নামের তালিকাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অরিজিৎকে কোঅপ্ট করে নেওয়া হয় কার্যকরী সমিতিতে এবং শান্তনু আনন্দের সঙ্গে এই ঘোষণা করে যে, অরিজিৎ 'নবারুণ' মুদ্রণের দায়িত্ব নিজে থেকেই গ্রহণ করেছে। সভাপতি ক্যাপ্টেন মুখার্জি নিজে অরিজিৎকে সাধুবাদ জানান এজন্যে।

সাধুবাদ অরিজিতের প্রাপ্য হলেও, তার এ সিদ্ধান্তের পেছনে যে শান্তনুর প্রেরণা রয়েছে একথা বলতে উঠেছিলেন মিসেস মুখার্জি। কিন্তু শান্তনুই বাধা দিয়ে বসিয়ে দেয় তাঁকে। সে জানায়, 'নবারুণে'র আনন্দদা সংখ্যা দেখে ভারি খুশি হয়েছে অরিজিৎ এবং নিজে থেকেই 'নবারুণ' মুদ্রণের সমস্ত ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নেবার কথা তাকে জানিয়েছে। কোলকাতায় তাদের খুব ভালো প্রেস রয়েছে যে! তাই তাদের প্রেসেই আরো সুন্দর করে 'নবারুণ' ছাপবার তার ইচ্ছে।

এর পর সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভঙ্গ।

অরিজিৎকে নিয়ে সভায় যখন এমনি আলোচনা চলেছে, তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা যখন জমে উঠেছে, অরিজিৎ নিজে তখন তার ঘরে বসে 'নবারুণে' প্রকাশিত শান্তনু সমাদ্দারের প্রবন্ধটি পড়ে তা বিশ্লেষণে অভিনিবিষ্ট।

যক্ষ্মা প্রতিরোধে জীবণ-পণের যে আহ্বান জানিয়েছেন ভালোদা তা কি সত্য সত্যই সার্থক হবে? বিদেশের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত লেখক তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সামনে। আনন্দদা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে তিনি লিখেছেন ট্রুডোর কাহিনী। অপূর্ব!—ভাবতে ভাবতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অরিজিৎ। শান্তনুর প্রবন্ধ সে আবার পড়তে শুরু করে:

ঘুমিয়ে আছেন দাদা।

দাদার কালিমাখা মুখখানির দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবছিলেন ট্রুডো। হঠাৎ শিউরে উঠলেন একবার। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেবিলে হাতের ওপর

মাথা রেখে আরো কতো কি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ক্রমশই যেন সারা ঘরের বাতাসটা ভারি হয়ে উঠছে বলে মনে হতে লাগলো তাঁর কাছে।

এর বিরুদ্ধে লড়তেই হবে।—মনে মনে সংকল্প করলেন ট্রুডো। বিশ বছরের তরুণের এ অটল প্রতিজ্ঞা।

এর পর বড়ো ভাইয়ের মৃত্যু দৃঢ়তর করে তোলে ট্রুডোর প্রতিজ্ঞাকে। কিন্তু সংগ্রামের আয়োজনের ফলে তাঁকেও আক্রান্ত হতে হলো। শত্রুর প্রথম আঘাতে প্রথমটায় তিনি একটু বিচলিত হয়েই পড়লেন। কারণ সংকল্প যতোই দৃঢ় হোক, তখনো পর্যন্ত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণই অপ্রস্তুত। তাহলেও একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়লেন না। ধীরে ধীরে তিনি বরং সাহস কুড়িয়ে নিতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অদম্য মনোবলের কাছে শত্রুকেই পরাজয় মানতে হলো।

আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনের ঘাটে ঘাটে কিছুদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে হলো ট্রুডোকে। মায়ের কথায় নৌ-বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে ফিরে আসতে হলো সেখান থেকে, কারণ তাঁর মন কিছুতেই সায় দিলে না তাতে। খনি-বিদ্যায় পারদর্শী হতে যেয়েও সেখানে তার ভালো লাগলো না। শেয়ার বাজারের দালালীতে বেশ কিছু উপার্জন হলো বটে, কিন্তু মন তাঁর বিষিয়ে উঠলো সে আবহাওয়ায়। মাঝে মাঝেই তাঁর বড়ো ভাইয়ের স্মৃতি তাঁর কঠোর সংকল্পকে স্মরণ করিয়ে দিতো, তাঁকে চঞ্চল করে তুলতো।

চিকিৎসা-শাস্ত্রকে আয়ত্ত করতে না পারলে ঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভবই হবে না।—আপন অন্তর থেকে পথনির্দেশ পেলেন ট্রুডো। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন তিনি চিৎকার করতে করতে।

আর দেরি নয়। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জনে উঠে পড়ে লেগে গেলেন ট্রুডো। ডাক্তারীতে স্নাতক উপাধি নিয়ে একটি হাসপাতালে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করলেন তিনি।

ট্রুডো এখন আত্মপ্রতিষ্ঠ। শার্লক বিয়ারকে বিয়ে করে একটি সুন্দর সংসার গড়ে তোলার নেশায় তিনি এখন মশগুল। চাকরির চেয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ের পথকেই বেছে নিলেন তিনি।

বিবাহিত জীবনে প্রথম দুবছরের প্রত্যেকটি দিনকেই নিতান্ত মধুময় বলে মনে হয়েছে ট্রুডোর। আরো কতো মধুরতর ভবিষ্যৎ তাঁদের জন্যে অপেক্ষমান, এ কথা ভেবে এক এক সময় কতোই না উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন তরুণ ডাক্তার। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও হঠাৎ আবার বিষাদের কালো ছায়া নেমে এলো তাঁর জীবনে।

শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে এবার নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়লেন ট্রুডো। তাঁর মনে হলো, দিন যেন তাঁর ফুরিয়ে এসেছে—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে তাঁর অধিকার যেন লুপ্ত হতে চলেছে।

নির্জন এক পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে ট্রুডো তাঁর জীবনের

বাকি দিনগুলো কাটাতে উদ্যোগী হলেন এবং সেখানে বসেই তিনি তাঁর সংগ্রামের কৌশল উদ্ভাবনে ব্রতী হবেন স্থির করলেন। মজার কথা, যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই যেন তাঁর প্রফুল্লতাও বেড়ে চললো। পাহাড়ী পরিবেশের মুক্ত আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশই ভালো হয়ে উঠতে লাগলো।

দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রুডো মুষড়ে পড়েছিলেন। তরুণী পত্নী এবং প্রাণের চেয়ে প্রিয় প্রথম সন্তান মাস্টার ট্রুডোর দিকে ফিরে তাকাতেও তাঁর যেন বুক ভেঙে যেতো। ট্রুডো তাই বাইরে বাইরে ঘুরেই কাটিয়ে দিতেন দিনের বেশির ভাগ সময়। কখনো কখনো তিনি বেরিয়ে যেতেন বন্যজন্তু শিকারে, আবার মাঝে মাঝে ছিপ নিয়ে বেরোতেন নদীতে মাছ ধরতে। আর কেবলি ভাবতেন কি করে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন মানুষের এই চরম শত্রুর বিরুদ্ধে।

কিন্তু দ্বিতীয়বারও যখন তাঁরই জয় ঘোষিত হলো ট্রুডোর জীবনে তখন আবার ছুটলো হাসির ফোয়ারা। তবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যতোই আনন্দে মেতে থাকুন না কেন, তিনি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারতেন না তাঁর সংকল্পের কথা। তাঁর কেবলি মনে হতো, যারা দরিদ্র, যারা নিঃসম্বল, এমন কি যারা স্বল্পবিত্ত, তারা একবার আক্রান্ত হলে কি করে মুক্তি পাবে এই শত্রুর হাত থেকে। এই ভাবনায় এক এক সময় অধীর হয়ে উঠতেন ট্রুডো।

বাস্তবিকই ট্রুডো যা পেরেছেন, অনেকের পক্ষেই তা

সম্ভব নয়। নিজেকে দিয়েই তিনি বিচার করেন অন্য সকলের অবস্থা। তাঁর বেশ কিছু সম্বল ছিলো। তাইতো তিনি উপযুক্ত জায়গায় গ্রীষ্মাবাস ও শীতাবাস করে নিয়েছেন নিজের জন্যে। আর তা করে নিয়েছিলেন বলেই দু-দুটো আক্রমণকে প্রতিরোধও করতে পেরেছেন। কিন্তু এ কি সহজ ব্যাপার?

না, আর ভাবনা নয়। ডাক্তার ট্রুডো সেই থেকে পুরো-পুরি মন দিলেন শত্রুকে আক্রমণের পদ্ধতি ও তাকে বিতাড়নের পদ্ধতি আবিষ্কারে।

অ্যাডিরোনডাকস পাহাড় অঞ্চলে তাঁর গ্রীষ্মাবাস। ঐ পাহাড়েরই দুহাজার ফুট উঁচুতে একটি ছোট কুটীর ট্রুডো উপহার পেলেন স্থানীয় রক্ষীদল-বন্ধুদের কাছ থেকে। বন-পাহাড়ী পরিবেশে অনেক উঁচুতে খোলা জায়গায় এমনি একটি কুটীর পেয়ে তাঁর ভারি আনন্দ হলো। তিনি সেটিকে নিবেদন করলেন অসচ্ছল যক্ষ্মারোগীদের সেবায় তাদের স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। আধা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই স্বাস্থ্য-নিবাসের নাম অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আমেরিকায় এ ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম।

দান ও চাঁদা সংগ্রহ করে করে স্বাস্থ্য-নিবাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের সাধনায় ট্রুডো গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। এমন কি সংসারের সমস্ত চিন্তা থেকে নিজেকে তিনি দূরে

সরিয়ে রাখলেন কিছুকাল ধরে। ঠিক এই সময়ই তাঁর দ্বিতীয় ছেলেটি জন্মগ্রহণ করে এবং নিতান্ত শৈশবেই তার মৃত্যুও ঘটে। কিন্তু এই সন্তানের জন্ম-মৃত্যু সংবাদ বিন্দু-মাত্রও বিচলিত করতে পারেনি ট্রুডোকে।

কয়েক বছর পর ট্রুডোর একটি কন্যারও মৃত্যু ঘটে এবং তার ফলে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে তাঁর সংগ্রামের সংকল্প। কারণ মেয়েটির মৃত্যু ঘটে সেই রোগে যে রোগের বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম।

ট্রুডো বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের লেখা সংগ্রহ করে পড়ে যেতে লাগলেন এবং নিজের আবিষ্কৃত চিকিৎসা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটিও সংশোধন করে চললেন। হঠাৎ তাঁর হাতে এসে পড়ে বিখ্যাত জার্মাণ জীবাণু-তত্ত্ববিদ রবার্ট কুকের একখানি গ্রন্থ। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে গবেষণা সম্বন্ধে এ বইখানি পড়ে একটি গবেষণাগার স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগলো ট্রুডোর মনে। তাঁর বাড়িতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সেই গবেষণাগার। মানবসেবী ডাক্তারের সমগ্র সত্তা নিমগ্ন হলো যক্ষ্মা-প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টির কাজে।

গবেষণায় ডুবে আছেন ট্রুডো।

একি দুর্দৈব! হঠাৎ একদিন আগুন লেগে গেলো ট্রুডোর বাড়িতে। গবেষণাগার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। এরই মধ্যে আর এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ট্রুডোর চতুর্থ সন্তানেরও মৃত্যু ঘটেছে। এমনি করে শুধু তাঁর সাধের গবেষণাগার নয়, এই আত্মভোলা বিজ্ঞান-সাধকের অন্তর-মনও

জলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে তাঁর কোনো প্রকাশ নেই। লোক-কল্যাণের চিন্তায়, মানুষের চিরশত্রু যক্ষ্মাকে দমনের চিন্তায় তিনি বিভোর।

ট্রুডো তাঁর শীতাবাস স্যারানাক লেক অঞ্চলে নতুন গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন করলেন এবার। এধরণের গবেষণাগার আমেরিকায় এই প্রথম। এখানেও চলে তাঁর নিজের ও সমগ্র মানব জাতির পরম শত্রু যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের অভিযান। এখানে বসেই যক্ষ্মা-প্রতিষেধক টীকা থেকে শুরু করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার জন্যে তিনি কতো যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। আজ সারা বিশ্বে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, তার সূত্রপাত যাঁরা করেছেন ট্রুডো তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর নানা গবেষণাকে ভিত্তি করেই যক্ষ্মা-শত্রু নিরোধে আজ চলেছে নতুন নতুন উদ্ভাবন।

কিন্তু হঠাৎ আর এক অঘটন ঘটলো।

১৯০৬ সন। তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান, তাঁর প্রথম সন্তান বড়ো ছেলেটি মারা যেতেই ট্রুডো একেবারে ভেঙে পড়লেন। পর পর তিনটি সন্তানের শোককে যিনি অবলীলায় সহ্য করেছেন, এই শেষ শোক হয়ে উঠলো তাঁর পক্ষে অসহ্য। যে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে মানুষের জয়যাত্রাকে নিশ্চিত সাফল্যে পৌঁছে দেবার জন্যে যিনি ছিলেন কৃতসংকল্প, প্রথম সন্তান বিয়োগে হৃদপিণ্ডহারা কাতর সেই মহাবিজ্ঞানীর ওপর চরম

আক্রমণ করে বসলো সেই মহাশত্রু। অচিরেই শয্যাশায়ী হলেন ট্রুডো। সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা। দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে ট্রুডো বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে ১৯১৫ সনে। কিন্তু তিনি চলে গেলেও তাঁরই নানা কীর্তি সকল মানুষের শত্রু যক্ষ্মার বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রামের স্মৃতি আজো বহন করে চলেছে।

ট্রুডোর মৃত্যুর পর 'ট্রুডো তহবিল' নামে যে বিরাট তহবিল গড়ে উঠেছিলো, তা দিয়ে এক বছরের মধ্যেই এমন একটি অভিনব বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো, যেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে যক্ষ্মারোগে মানুষের জীবনে ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়ের এবং সে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের। তারপর থেকে ব্যাপক এবং বিপুল চেষ্টায় আমেরিকা থেকে যক্ষ্মারোগ প্রায় নিঃশেষিত হলেও ট্রুডোর সাধনার পূর্ণ সাফল্য আজো লাভ করা সম্ভব হয়নি। ট্রুডোর আত্মদান সার্থক হবে সেদিন, যেদিন সকলের সহযোগিতায় সকলের শত্রু যক্ষ্মাকে এই পৃথিবীর সীমান্ত থেকে বিদূরিত করা সম্ভব হবে।—এখানেই শান্তনু তার প্রবন্ধ শেষ করেছে এবং শুরুতেই সে ঘোষণা করেছে, এই পৃথিবী থেকে যক্ষ্মা একদিন নির্মূল হবেই আর তার শেষ সংগ্রামের জন্যে সৈনিক তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর ঘরে ঘরে।

অরিজিৎ দ্বিতীয় বার এই প্রবন্ধ পড়া শেষ করে স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শান্তনুর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে মনে মনে সে নমস্কার জানায় তাকে।

॥ ষোল ॥

এক-একটা দিন যায় আর সংসারের বিভীষিকাময় রূপটাও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে শান্তনুর সামনে। কিন্তু সে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বড়ো দুশ্চিন্তাও তার মনের অনেকখানি জুড়ে থাকে। আজ বুধবার বিকেলে তার বিদায় সংবর্ধনা, তা নিয়ে একটুও সে মাথা ঘামায় না। কাল বাদে পরশু শুক্রবার অনাদির লাঙ অপারেশন, সে ভাবনাই বড়ো ভাবনা। তারই মধ্যে নানা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে, বহু ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আবার চিন্তা করতে হয় শান্তনুকে।

ঐ তো পঞ্চানন এসে গেছে তার নিজের কি কথা বলার জন্যে। ঘর থেকে বাইরে ডেকে এনে শান্তনুকে একটুকরো কি কাগজ পড়তে দেয় পঞ্চানন। এ কোনো প্রেসক্রিপসন নয়, কোনো কবিতাও নয়—এ একখানি মূল্যবান পত্র। আজই এসেছে এ চিঠি। একটু আগেই পঞ্চানন পেয়েছে ফুল্লরার এই শেষ চিঠি।

তোমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়তো নাও হতে পারে, কি বলো? কী মনে হলো তোমার আজকের চিঠি পড়ে?—পঞ্চানন জিগ্যেস করে শান্তনুকে।

এর মধ্যে আর মনে হওয়া না হওয়ার কি প্রশ্ন আছে ভাই? এতো চিঠির শুরু থেকেই একেবারে পরিষ্কার,

তোমার আসা-পথ চেয়ে বসে আছে ফুল্লরা এবং তুমি কবে পর্যন্ত ছাড়া পাবে আশা করছো তাই সে জানতে চাইছে।— এ উত্তরের মধ্যে নতুন কিছু না থাকলেও শান্তনুর কথায় সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননের মুখের হাসির রেখাগুলো স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে।

চিঠিতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ খবরও জানিয়েছে ফুল্লরা। তার মধ্যে পঞ্চাননের কাছে যে সংবাদ সব চেয়ে দরকারী তা হলো ফুল্লরার পৃথক হয়ে থাকার সংবাদ। ফুল্লরা লিখেছে, তার স্বর্গত স্বামী কমল সাহার উইল অনুসারে সে যে বাড়ি পেয়েছে, ভবানীপুর দেবেন ঘোষ রোডের সে বাড়িতেই সে সম্প্রতি উঠে এসেছে। তার এক ছোটবোন ও এক ভাইপোকে নিয়ে সে দেবেন ঘোষ রোডেই আছে এবং তার নামে গচ্ছিত টাকার সুদের একাংশ দিয়েই সে বেশ ভালো ভাবে সব খরচ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে পঞ্চাননের অভাবে সব কিছুই যেন অসম্পূর্ণ এবং অনেক সময় শূন্য বলে মনে হচ্ছে ফুল্লরার।

চিঠির ঐ কথার সূত্র ধরেই পঞ্চাননকে আশ্বাস দেয় শান্তনু, তোমারও ছুটি পাবার সময় হয়ে এলো বলে মনে হচ্ছে আমার। কারণ বেশ কিছু দিন হলো তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন কোনো কমপ্লেন শোনা যাচ্ছে না। কাজেই মিছামিছি কেনই বা আর তোমাকে বেশিদিন এঁরা আটকে রাখবেন হাসপাতালে ?

আমিও ভাই এখন তাড়াতাড়ি ছাড়া পেতে চাই। আর

আশ্রয় যখন একটা মিলেই গেলো তখন কেন আর এই হাসপাতালে পড়ে থাকবো বলো দেখি। ঐ যে আবার অনাদি আসছে দেখছি। যাই তাহলে।—বলেই পঞ্চানন পা বাড়ায়।

বিকেলের সভায় আসছো তো?

নিশ্চয়।—যেতে যেতেই শান্তনুর প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায় পঞ্চানন।

কি খবর, তুমি এ সময়ে?—অনাদি কাছে আসতেই শান্তনুর এ জিজ্ঞাসা।

ভয়ের কিছু নয় ভালোদা, তোমায় একটা ভালো খবর দিতেই এসেছি। আজই তাপসীর চিঠি পেলাম। রত্না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, দুদিন আর তার জ্বর হয়নি। ডাক্তার নাকি বলেছে, ও কিছু নয়, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিলো। —অনাদি খুব খুশি মনেই উত্তর দেয়।

সে কথা তো ভাই আমিও বলেছিলাম, ও কিছু নয়, ওর জন্যে ভয়ের কিছু নেই।—ডাক্তার না হলেও ডাক্তার যে তার কথাকেই সমর্থন করেছেন তা জেনেই শান্তনুর আত্মতুষ্টি।

যাক, ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এখন পরশুর অপারেশনে কি দাঁড়াবে কে জানে!—একটা হাঁফ ছাড়ে অনাদি। কী রকম একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে, কেমন একটা অসহায়তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা হলেও কৃতি অভিনেতার মতো মুহূর্তের মধ্যেই সে দিকটা সামলে নিয়েই অন্য কথায় চলে যায় অনাদি।

হ্যাঁ ভালোদা, আর একটা খবর জানো?

কি আবার সে খবর?

আজকের সভার উদ্বোধন গান গাওয়ানো হবে সুমিত্রা দেবীকে দিয়ে, হরষিৎ সে ব্যবস্থা করেছে।

সে আবার কী কথা? সুমিত্রা তো ভালো ছবি আঁকে জানতাম, সে আবার ভালো গানও গাইতে জানে নাকি?—রীতিমতো অবাক হয়েই প্রশ্ন করে শান্তনু।

হ্যাঁ, হরষিৎ তো বললে সুমিত্রা নাকি খুব ভালো গাইয়ে।

কী করে জানতে পেলো হরষিৎ সে খবর?

ছবি আনতে গিয়ে সে নাকি গুন গুন করে গান গাইতে শুনেছে সুমিত্রাকে। গান গেয়ে গেয়ে ছবি আঁকাই নাকি তার অভ্যাস। আর তার সে অভ্যাসের কথা জানতে পেরেই হরষিৎ উঠে পড়ে লেগেছিলো আসল খবর বার করার জন্যে। শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে সুমিত্রা যে সে গান জানে এবং ছোটবেলা থেকেই সে ওস্তাদের কাছে বছরের পর বছর গান শিখেছে।—হরষিতের কাছ থেকে শোনা কথাগুলোই অনাদি খুলে বলে শান্তনুকে।

সুমিত্রা তাহলে সত্যি সত্যি খুব গুণী মেয়ে। গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের পাশকরা শিল্পী, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে, তার ওপরে আবার গানেও ওস্তাদ! এমন মেয়ে সচরাচর বড়ো একটা চোখে পড়ে না, কি বলো?

তা আর বলতে! তবে একটা কথা বলি ভালোদা,

আমাদের হাসপাতালে এই গুণী মেয়েটিকে যে আবিষ্কার করেছে তাকেও তার প্রাপ্য বাহবা দেওয়া উচিত।

সেতো নিশ্চয়ই। কিছুকাল ধরে হরষিতের কাজের উৎসাহ দেখে আমার প্রায়ই মনে হতো তার মনে হয়তো বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এখন দেখছি আমার সেই মনে হওয়া সম্পূর্ণ সত্যি। বসন্তের হাওয়ায় সে গান খুঁজে বেড়িয়েছে। অন্তর জুড়ে এখন তার সুরের আগুন। খুবই ভালো কথা। তার জন্যে সামনা সামনিই তাকে প্রশংসা করা যাবে, কি বলো?—শান্তনু মিষ্টি করে জবাব দেয়।

বেশ, তাই ভালো।

আমার ধারণা কি ছিলো জান? আমি ভেবেছিলাম আজকের অনুষ্ঠানে হরষিৎ বোধ হয় উদ্বোধন গান গাইবার জন্যে দাহুকে রাজী করাবে। সেদিন দাহুর আসরে দাহুকে গান গাইতে শুনে সে যেভাবে তাঁর গানের প্রথম কলিটি মুখস্থ করে ফেলেছে তাতে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, হরষিৎ আমারই মতো দাহুর গানের একজন পরমভক্ত।

আরে ঠিকই ধরেছো তুমি ভালোদা, তোমার সংবর্ধনা সভায় দাহুকেও সে গান গাইতে রাজী করিয়েছে। দাহুর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করেই সে আজই সকাল বেলা ফিরছিলো, হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা। তখনই সে চলতি মুখে আমায় জানিয়ে গেলো, সুমিত্রা গাইবে উদ্বোধন গান আর অনেক করে দাহুর মত পাওয়া গেছে, তিনি গাইবেন সমাপ্তি সঙ্গীত।

বাঃ! এ দেখছি একেবারে গ্র্যাণ্ড আয়োজন করে ফেলেছে

হরষিৎ। তাকে যে কী ভাষায় প্রশংসা করা যাবে তাই ভাবছি।

তোমার যে কি কথা!—এই বলে ব্যস্ততার দিনে আর সময় নষ্ট না করে বিদায় নেয় অনাদি। তাকেও তো আবার তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে সংবর্ধনা সভায় আসার জন্যে তৈরি হতে হবে।

এদিকে সভার ব্যবস্থাপনা নিয়ে হরষিৎ সকাল থেকেই ব্যস্ত। হাসপাতালের ভেতরের প্রাংগণে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। হরষিৎ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তা করিয়েছে। স্তম্ভগুলোর সঙ্গে পুষ্পস্তবক বেঁধে দেওয়ায় সভামণ্ডপের সৌন্দর্য বেড়েছে। সভামঞ্চটি সাজানো হয়েছে অতি সুন্দর করে। ফুলে ফুলময় চারদিক। লতাপাতার সবুজ সমারোহে বিচিত্র মনোরম পরিবেশ। সহযোগী বা সহকর্মী অনেকে থাকলেও এর পুরোটাই হরষিতের পরিকল্পনার রূপায়ণ।

ঠিকই শান্তনুর ধারণা মিথ্যে নয়। বসন্ত এসেছে। সে বসন্ত শুধু প্রকৃতির জগতে নয়, অনেকের জীবনেও এসেছে। হ্যাঁ, হরষিতের জীবনেও সে বসন্তের হাওয়া লেগেছে। তাই তার এতো হাসি, এতো উচ্ছ্বাস, কাজে এতো উৎসাহ। বসন্ত সৃষ্টির প্রেরণা, তা প্রকৃতির ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনেও তেমনি। জীবনটা শুধু ঘড়ির কাঁটার একঘেয়ে টিক টিক শব্দ নয়। প্রকৃতির মতো জীবনেও রূপান্তর ঘটে এবং সেই রূপান্তরের বাণী বয়ে আনে বসন্ত। হরষিতের জীবনেও বুঝি সেই রূপান্তরেরই ডাক এসেছে।

সভার আয়োজন শেষ করে ঘরে ফেরে হরবিং। ফেরার পথে শাস্তনুকে জানিয়ে যায় সভার সর্বাংগসুন্দর ব্যবস্থার কথা। আরো বলে যায়, সে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে নিখুঁত অনাড়ম্বর শুচি-শুভ্র একটি সভার পরিবেশে উপস্থিত হয়ে। শাস্তনু উত্তরে তেমন কিছু বলে না, হেসে বিদায় দেয় হরষিংকে। কোনো কথা বলার মতো ভাষাই যেন আর খুঁজে পায় না শাস্তনু। দুদিকের চিন্তায় মন তার অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। এ হাসপাতালের প্রতিটি মানুষ তাকে ভালোবাসে। গভীর তাদের ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা তারা নতুন করে প্রকাশ করবে আজকের সভায়—তাকে বিদায় অভিনন্দন জানাবে প্রীতি সম্মেলনে। তাদের ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই যে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। শাস্তনু আরো স্তব্ধ বাড়ির কথা ভেবে। বরিশালের গাঁয়ের বাড়িতে সে যদি ফিরে যেতে পারতো তাহলে তার কোনোই ভাবনার কারণ থাকতো না। বাইরের যে কোনো একটা ঘরে সে অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারতো—কোনো ভয়ের প্রশ্নই তাতে দেখা দিতো না। কিন্তু এখন কি হবে? প্রিয়জন দর্শন যতোই আনন্দের হোক না কেন, সেই প্রিয়জনদের মধ্যে গিয়ে থাকতে এই রোগমুক্তদেরও আশংকা হয় বৈ কি। আর সেই আত্মজনদেরও দিন কাটাতে হয় ভয়ে ভয়ে। এসব ভাবতে ভাবতেই নিজের মনের আয়নায় শাস্তনু যেন দেখতে পায় তার খোকনকে, তার মঞ্জুকে এবং আর সবাইকে।

না, এভাবে অভিভূত হলে তো চলবে না। অবিমিশ্র প্রীতি ও ভালোবাসার বিনিময়ে তাকেও তো কিছু বলতে হবে সভায়। সে জন্যে আর একটু শক্ত হতে হবে তাকে। এই চেতনা মনে আসতেই একখানা ভালো ইংরেজী বই হাতে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ে শান্তনু। বীর নেপোলিয়ানের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত সে বইখানি। পড়তে পড়তে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে শান্তনু। নতুন পৌরুষ ও প্রেরণা ধুয়ে-মুছে দেয় তার মনের যতো দুর্বলতা।

সময় কিন্তু হয়ে এলো ভালোদা, এবার উঠুন।—লকারের ওপর টাইমপিস ঘড়িটায় চোখ পড়তেই উঠে বসে অরিজিৎ এবং শান্তনুকেও ডেকে তোলে। শান্তনু কিন্তু সত্যি সত্যি পড়ায় একেবারে ডুবে গিয়েছিলো। অরিজিৎ ডেকে না তুললে নিজের সংবর্ধনা সভায় সময়মতো তার যাওয়া হতো কিনা তা সন্দেহেরই ব্যাপার।

যাক মিনিট দশেকের মধ্যেই শান্তনু এবং অরিজিৎ সেজেগুজে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে এবং সভারম্ভের দু-এক মিনিট আগেই তারা সভায় এসে উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন মুখার্জি, মিসেস মুখার্জি এবং ডাক্তার সাহেবরা প্রায় সবাই হাজির আগে থেকেই। তাঁরা সবাই তার আগে এসে পড়ায় মনে মনে লজ্জা পায় শান্তনু।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখার্জির সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয় যথাসময়ে। সভাপতিকে এবং প্রধান অতিথি শান্তনু সমাদ্দারকে মাল্যদান করে একটি ছোট্ট ছেলে।

এই ছেলেটিও রোগী। মায়ের অনুগামী হয়ে তাকেও আশ্রয় নিতে হয়েছে এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে। তার মতো আরো কয়েকটি শিশুরোগী রয়েছে এখানে। তাদের যে কী ভয়ংকর রোগ সে বোধই তাদের কারো হয়নি। সবাই তাদের আদর করে, কাছে পেলেই তাদের নিয়ে খেলা করে বা গল্প করে। পাঁচ-ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে স্বপন শান্তনুর গলায় মালা পরিয়ে দিতেই শান্তনু বুকে চেপে ধরে ছেলেটিকে, মনে মনে ভাবে তার খোকনও তো এখন ঠিক এতোটুকু, তাকে দেখেও তো ঠিক এমনি করেই বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে হবে তার—কিন্তু সে কি তা পারবে?

আপন গলার ফুলের মালাটি খুলে নিয়ে স্বপনকে পরিয়ে দেয় শান্তনু। কয়েক মুহূর্ত ছেলেটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার দুচোখে যেন দুটি জিজ্ঞাসা। স্বপন! স্বপন!—সে কি পারবে তার বাপ-মায়ের স্বপ্ন-সাধ মেটাতে? আর তার খোকন? সেও কি পারবে তার ইচ্ছে পূর্ণ করতে? সহসা চোখ দুটি রাঙা জবার মতো হয়ে ওঠে শান্তনুর। চোখ নামিয়েই সে নীরবে বসে থাকে।

এদিকে উদ্বোধন সংগীত শুরু করেছে সুমিত্রা। হরষিতের কণ্ঠে সরস ঘোষণার পর সুমিত্রা গান ধরেছে :

ফিরে চলো, ফিরে চলো, ফিরে চলো
আপন ঘরে।

প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে এই বহুশ্রুত গানটিই সুমিত্রা গায় শান্তনুর গৃহাভিমুখী মনকে মধুময় করে তোলার জন্যে।

তার সে গানে দোলা লাগে আর সব রোগীদের মনে। আপন ঘরে ফিরে যেতে কেইবা না চায়? কেবল নানা শংকা সংকোচ সে চাওয়ার পথে বাধা হয়ে এসে দাঁড়ায়, এই বিপদ। এ শুধু শান্তনুরই যে সমস্যা তা নয়, যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রায় সব রোগীর বেলাতেই এ এক কঠোর সত্যি।

সুমিত্রার গানে সবাই মুগ্ধ। তার সে সাফল্য যেন হরষিতেরই সাফল্য। সেই গর্ব নিয়েই সে তাকায় সুমিত্রার দিকে। সুমিত্রা খুবই কম কথা বলে তা সত্যি। তবে ওর চোখের রঙের দিকে যখনই চোখ পড়ে তখনই অনেক কথার মেলা সেখানে দেখতে পায় হরষিৎ। এখনও দেখে। কিন্তু এখন তো আর উচ্ছ্বসিত হবার সময় নয়।

উদ্বোধন সংগীতের পরই যে বিদায়-অভিনন্দনপত্র পাঠ করতে হয় হরষিৎকে। তারপর নানা মহল থেকে একের পর এক বক্তৃতায় শান্তনুর মহিমা কীর্তন এবং তার কাছে হাসপাতালের .বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রোগীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

অভিনন্দন ও সমস্ত বক্তৃতার উত্তরে ছোট্ট একটি ভাষণ দেয় শান্তনু। সে ভাষণে সকলকে আশ্বাস দিয়ে সে বলে, যক্ষ্মা প্রতিরোধ আন্দোলন সে গড়ে তুলবে বাইরে গিয়ে, যারা হাসপাতালে পড়ে রইলো তাদের কথা সে কখনো ভুলবে না—তাদের দেখতে এবং তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান 'নবজীবন সংস্কৃতি সংঘ' ও সংঘের মুখপত্র 'নবারুণ' কেমন ও কীভাবে চলছে তা দেখবার জন্যে মাঝে মাঝেই তাকে আসতে হবে

এখানে। বলতে বলতে অশ্রু সজল হয়ে ওঠে তার দুচোখ, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। দুকথায় কোনোরকমে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে তার ভাষণ শেষ করে।

সবাই খুব খুশি শান্তনুর বক্তৃতায়। প্রতিটি লোক আশ্বস্ত বোধ করে তার কথায়, তারা প্রত্যেকেই মুগ্ধ তার আন্তরিকতায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে কেবল মাত্র একা পঞ্চানন চক্রবর্তী। অস্বস্তি তার হবারই কথা। কিছুতেই যে সে তার মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করে উঠতে পারছে না কী করে সে থাকবে এ হাসপাতালে শান্তনু চলে যাবার পর। সভায় এক নিভৃত কোণে এসে বসলেও কারো কোনো বক্তৃতাই তার কানে যায়নি। এমন কি শান্তনুর কথাও নয়। সর্বক্ষণই তার মনে এক চিন্তা—শান্তনু চলে গেলে হাসপাতালে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে।

সভাপতি ক্যাপ্টেন মুখার্জি ভাষণ দিতে উঠে উচ্ছ্বসিত ভাষায় সাধুবাদ জানান শান্তনুকে তার নানা কল্যাণকর কার্যকলাপের জন্যে। দীর্ঘ নীরোগ জীবন লাভ করে সমাজ সেবার বহু সুযোগ যেন পায় শান্তনু সেই শুভকামনাও জানান তিনি। 'নবারুণে'র আনন্দদা সংখ্যায় শান্তনুর রচনার বিষয় উল্লেখ করে সভাপতি উপসংহারে বলেন, আমেরিকার ট্রুডোর ন্যায় বাঙলার ছেলে শান্তনু সমাদ্দারও মানুষের চিরশত্রু যক্ষ্মা প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করেছে। তার সেই ব্রত একদিন না একদিন সফল হবেই। তার জন্যে দরকার বহুলোকের সহযোগিতা, অনেকের অনেক ত্যাগ

স্বীকার। যক্ষ্মা-বিরোধী এই সংগ্রামে যতো বেশি লোকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে ততোই এগিয়ে আসবে সেই সাফল্যের দিন।

সভাপতির বক্তৃতার পর সমাপ্তি সংগীত। সে গান গাইবার ভার নিয়েছেন স্বয়ং দাদু। গান আরম্ভের আগে সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার দায়টাও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বুড়ো যোগেন মজুমদারের ওপর। সে সুযোগে তাঁর স্বভাব সুলভ ভংগিতে দাদুও গুটিকয়েক কথা বলে নেন। তার মধ্যে মোক্ষম কথা, সমাজের ক্ষয়রোগ দূর করতে না পারলে, মানুষকে ক্ষয়রোগমুক্ত করা যাবে বলে বিশ্বাস হয় না। সমাজদেহের ক্ষয়কে ঠেকাতে হলে সমাজ ব্যবস্থাকেই পাল্টাতে হবে, তা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ার বা নিরানন্দ হবারও কোনো যুক্তি নেই। এই বলেই দাদু হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে জোরালো গলায় গান ধরেন :

মা যার আনন্দময়ী তার কি বা নিরানন্দ ?

তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ ?

অতি পুরনো এই ভক্তিমূলক গানখানি শেষ হতেই সভাভঙ্গ। তারপর যে যার ইচ্ছে মতো চলে যায় এদিক-ওদিক।

একা পেয়ে এক সুযোগে পঞ্চানন গিয়ে ধরে ফেলে সমাদ্দারকে। শুধু ধরে ফেলাই নয়, তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দেয় পঞ্চানন। তখন সন্ধ্যে। একবার

এপাশ ওপাশ তাকিয়ে পঞ্চানন কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি যেদিন যাবে আমিও সেদিন রাতেই পালিয়ে যাবো হাসপাতাল থেকে।

কেন, এখন আর তোমার ভাবনার কি আছে ভাই?—জিগ্যেস করে শান্তনু। ভাবনার কিছুই ছিলো না তুমি ছিলে বলে। কিন্তু তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আবার সেই পুরনো ঝামেলা শুরু হবে তাতে একটুও সন্দেহ নেই আমার।—চোখ মুছতে মুছতে বলে পঞ্চানন।

না, না—ফুল্লরার যখন ছুটি হয়ে গেছে তখন সে ভয়ের আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক আছে, আমি না হয় তবু বলে যাবো সবাইকে যাতে সেই পুরনো কথা কেউ কখনো না তোলে তোমার সামনে। তুমিও ভাই সবার সঙ্গেই একটু সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করো। দেখবে মনের আড়ষ্টতা তাতে সহজে কেটে যাবে।

পঞ্চানন বুঝ মানে কতকটা শান্তনুর কথায়। এর পর দুজনেই ঘরে ফিরে যায়।

ভারি দুর্বল মানুষ পঞ্চানন চক্রবর্তী। সব সময়েই যেন একটা অসহায়তার ভাব। এই দুর্বলতা থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে কম চেষ্টা করেনি শান্তনু। কিন্তু পারেনি। হয়তো সে জন্যেই তার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ শান্তনুর। তার ওপর যে পঞ্চাননের অদ্ভুত রকমের একটা নির্ভরতা! এ তার মোটেই ভালো না লাগলেও এরূপ একটা অবস্থা অত্যন্ত ভাবিয়ে তোলে তাকে। আজো সভা শেষে

ঘরে ফিরে আসার পর ঘুরে ঘুরে শান্তনুর কেবলই মনে পড়ছে পঞ্চাননের কথা।

কান্নার সুরে জড়ানো পঞ্চাননের কথাগুলো শান্তনুর কানের মধ্যে তখনো যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই সে আপন মনে ভেবে চলে, হতে পারে হাসপাতালে একটা ভুল করে ফেলেছে পঞ্চানন, কিন্তু যৌবনের ধর্মকে অস্বীকার করে চলাও তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বছর তিন আগে যেদিন প্রথম পঞ্চাননের টি-বি রোগ ধরা পড়ে তার কদিন বাদেই ছিলো তার বিয়ের তারিখ। নিজের জন্যে সে নিজেই নাকি পছন্দ করেছিলো তার বিয়ের কনে। কিন্তু টি-বি সব ওলট পালট করে দিলে। তাকে আশ্রয় নিতে হলো এই দীননাথ হাসপাতালে আর সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলো অন্য কোথাও অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে। এ অবস্থায় পড়ে যদি তার মন সাঁতার কাটতে কাটতে কোথাও গিয়ে তীর খুঁজে পায় তাতে অন্যায়টা এমন কী আছে? জীবন-তৃষ্ণায় পানের জল চাই বৈ কি!

পঞ্চাননকে দেখলেই সহানুভূতিতে ভরে ওঠে শান্তনুর অন্তর। সুপারের হাতে ধরা পড়ার পর সব কথাই পঞ্চানন খুলে বলেছিলো শান্তনুকে। ফুল্লরাকে দেখলেই নাকি তার মনে পড়ে যেতো সেই মেয়েটিকে। সেই মেয়েটি যাকে সে তার জীবনসংগিনী করে পেতে চেয়েছিলো এবং পাবে বলে ঠিকও হয়েছিলো। হাসপাতালে আসার পর শান্তনুরও তো অনেকদিন পর্যন্ত তেমনি হতো। রোগিণীদের মধ্যে মধ্য-যৌবনা কোনো মেয়ে চোখে পড়লেই মনে পড়ে যেতো

মঞ্জুশ্রীর কথা। তবে এই দুজনের মনে-পড়ার মধ্যে পার্থক্য অনেক। দুজনের মনে-পড়া সম্পূর্ণ দুরকমের। শান্তনুর বিবাহিতা স্ত্রী মঞ্জুশ্রী। তার একমাত্র সন্তানের জননী। মঞ্জুর চিন্তাই সব সময় তফাৎ করে রাখতো তাকে মেয়েদের সান্নিধ্য থেকে। কিন্তু পঞ্চাননের বেলা তো আর তা নয়। সে তার প্রার্থিত মেয়েটিকে পুনরাবিষ্কার করেছিলো ঐ ফুল্লরার মধ্যে। ফুল্লরা বিধবা, সে হয়তো সে কথা জানতো, হয়তো বা জানতো না। জানলেও ফুল্লরার কাছে প্রেম নিবেদনে তাকে সে অন্তরায় বলে মনে করতো না। তাকে দেখতে ভালো লাগতো পঞ্চাননের। শুধু দুটো চোখ দিয়েই সে দেখতো না তাকে, ফুল্লরার রূপলোকে সে তার অন্তরের দৃষ্টিকে বিছিয়ে রাখতো। তারপর এক বসন্ত সন্ধ্যায় নিবিড় করেই পঞ্চানন কাছে টেনে নিয়েছিলো ফুল্লরাকে। সুপারের সঙ্গে শান্তনুর আলাপ হয়েছিলো এই নিয়ে। ক্যাপ্টেন মুখার্জি বলেছিলেন, টি-বি হাসপাতালের এ সত্যি সত্যি এক কঠিন সমস্যা; ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক পৃথক হাসপাতাল হওয়া দরকার, তা না হওয়া অবধি এ সমস্যার সমাধান কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। ঠিকই বলেছিলেন সুপার। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন একই জায়গায় বাসের ফলে অপরিচয়ের প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পঞ্চাননের বিষয় ভাবতে ভাবতে ফুল্লরা-পঞ্চানন সম্পর্কে ক্যাপ্টেন মুখার্জির পুরনো মন্তব্যটিই মনে মনে বিশ্লেষণ করে শান্তনু।

॥ সতেরো ॥

পরের দিন লাঙ অপারেশনের জন্যে ও-টিতে অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হবে অনাদিকে। সে নিয়েও কি কম ভাবনা ভেবেছে শান্তনু! ভোর হতেই হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে শান্তনু চলে গেছে অনাদির কাছে।

অনেক সকালেই আজ ঘুম ভেঙেছে অনাদির। রাতে ঘুমই বা আর হয়েছে কতোটুকু। কেবল চিন্তা আর চিন্তা। সকাল থেকে বুক দুর দুর। কী হবে কে জানে? অনাদির যদি কিছু হয়—যদি—

সকাল গোটা নয়েকের সময় হাউস সার্জেন এসে হাঁক ছাড়েন—বেড নাম্বার থার্টি টু কোথায়? কোথায় গেলো থার্টি টু?

অনাদি এগিয়ে এসে বলে, এই যে স্যার আমি।

যান যান, তাড়াতাড়ি ব্লাড গ্রুপিং-এর জন্যে রক্ত দিয়ে আসুন। এখনি হয়তো রক্ত আনতে ব্লাড-ব্যাঙ্কে লোক যাবে।—হাউস সার্জেন ব্যস্তভাবে তাড়া দেন অনাদিকে। শান্তনুকে অনাদির পিছনে দাঁড়ানো দেখে তাকে বলেন, আপনি বুঝি বিদায় নেবার আগে সবার সঙ্গে দেখা করছেন এক এক করে।

অনেকটা তাই।—সংক্ষেপে উত্তর দেয় শান্তনু।

অনাদি একটুও সময় নষ্ট না করে রক্ত দিতে

ল্যাবরেটরিতে চলে যায়। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আনতে হলে গ্রুপিং-এর জন্যে রোগীর রক্তের নমুনার প্রয়োজন। অনাদিকে হাউস সার্জেনের তাড়া দেবার কারণ তাই।

ল্যাবরেটরি থেকে ঘুরে আসতেই হাউস সার্জেন অনাদিকে বলেন—যান, তাড়াতাড়ি এবার বেডে যান। ব্লাড প্রেসারটা আর একবার দেখতে হবে।

অনাদি বেডে আসে। শুধু ব্লাড প্রেসার দেখাই নয়, হাউস সার্জেনের হাতে একের পর এক অনেকগুলো পরীক্ষাই তার চলতে থাকে। সার্জেন চলে যাবার পর তার সোয়াস্তি।

বেলা গোটা এগারোর সময় বাসুদেব এসে হাজির অনাদির ঘরের সামনে। বাসুদেব প্রামাণিক দীননাথ হাসপাতালের ক্ষৌরকার। অনেক দিনের পুরনো লোক। এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা থেকেই সে এ পদে প্রতিষ্ঠিত। যেমনি সহানুভূতিশীল তেমনি নির্ভয় মানুষ বাসুদেব। অনাদির বুক-পিঠ নিখুঁত ভাবে কামিয়ে দেয় সে। কাজ করতে করতেই ভরসা দিয়ে বলে অনাদিকে—কোনো ভয় নেই বাবু। অপারেশনের পর তাড়াতাড়িই সেরে উঠবেন।

অনাদি একটু ম্লান হাসি হাসে। সহজ সরল বাসুদেবের সহানুভূতিপূর্ণ ঐ দুটি কথায় চোখের পাতা ভিজে ওঠে অনাদির। অন্তরে অন্তরে সে অনুভব করে, বাসুদেবের সামান্য দুটি কথার মধ্যে যে গভীর আন্তরিকতা রয়েছে তার তুলনা নেই।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনাদি অপারেশন থিয়েটারে যায় অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং নেবার জন্যে। হাউস সার্জেনের নির্দেশ মতোই খাওয়ার পরে সেখানে যায় এবং ড্রেসিং নিয়ে ওয়ার্ডে ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পরে। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল কতো কি ভাবে। ছেলে মেয়ের কথা, স্ত্রীর কথা, বাপ-মায়ের কথা, সকলের কথাই ঘুরে ফিরে তার মনে আসে।

তার লাগু অপারেশনের খবরটা বাড়িতে কি জানানো হয়েছে হাসপাতাল থেকে? ঠিক মতো খবরটা পেয়ে থাকলে অনুপম নিশ্চয়ই তার বৌদিকে নিয়ে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হবে। ওরা কাছে থাকলে খুব ভালো হবে। কিন্তু অপারেশনের সময় বাইরের কাউকেইতো কাছে থাকতে দেওয়া হয় না! তাহলেও ওদের উপস্থিতির সংবাদটা পেলেও মনে অন্তত কিছু ভরসা পাওয়া যেতো। আসবে, আসবে, ওরা নিশ্চয়ই আসবে!

এমনি সব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে অনাদি। তার ঘরের এক পেশেন্ট অনন্ত ছাড়া পেয়েছে এবং আর একজন অবিনাশদা তিন দিনের ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছেন। অনাদি তাই তার ঘরে এখন একা নিরিবিলি।

তা হলেও বেশিক্ষণ শান্তিতে ঘুমোনোর উপায় নেই। বিকেল পাঁচটা না বাজতেই সিষ্টার এসে ডাক শুরু করেন—উঠুন থার্টি টু, এবার ও-টিতে যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি উঠুন।

অনাদি ধড়মড় করে উঠে বসে। হঠাৎ ভাকে ঘুম থেকে উঠে বসায় বুকটা একবার ধড়াস করে ওঠে তার। তেমনি অবস্থায়ই দুহাতে চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে অনাদি জিগ্যেস করে—কী বলছেন সিষ্টার।

ঘুমের মধ্যে অনাদি ভালো করে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি সিষ্টারের কথা। একটা যান্ত্রিক আওয়াজের মতো শুধু তার গলার স্বরটা শুনেছে। তারই জন্যে এমনি প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তরও আবার আসে তেমনি।

কিছুই তেমন বলছিনা, শুধু বলছি এবার আপনাকে ও-টিতে যেতে হবে। আর জানতে চাইছি, কী কী জিনিস আপনি ও-টিতে নিয়ে যাবেন।—সিষ্টারের প্রতিটি কথা ধীরভাবে শুনে যায় অনাদি। তারপর বেশ ধীরে ধীরেই বলে :

হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়লেও ও-টিতে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। আর আমার সঙ্গে যাবে দুটো বেড-শীট, একটা পিলো-কেস, একটা প্যাণ্ট, একটা জামা, একটা টর্চ লাইট এবং একটা হ্যাণ্ড টাওয়েল।

সিষ্টার একে একে সবগুলো জিনিসের নামই টুকে টুকে নেন তার খাতায়। অনাদির কথা মতো একেবারে হু-বহু টুকে নেন।

ট্রলি আসে। চার্ট-প্লেট এবং অনাদির সব জিনিসপত্র বোঝাই করে নেওয়া হয় তার ওপর। সিষ্টারের পিছে পিছে ট্রলি এগোয়। তার পিছে পিছে অনাদি।

খবর পেয়ে রোগী বন্ধুরা অনেকেই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনাদিকে। তাদের সকলের মনেই কেমন একটা ভয় ভয় ভাব, একটা সংশয়—অপারেশনটা সাকসেসফুল হলে হয়!

ও-টির দিকে যাত্রার আগে অনাদি সকলকে নমস্কার জানায়। সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়। মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেলেও বুক তার ভয়ে তুরু তুরু।

প্রফুল্লনাথ নেহাতই ছেলেমানুষ। নতুন রোগী। কানপুরে একটা কারখানায় কাজ করতে করতে টি-বিতে কাবু হয়ে এ হাসপাতালে এসেছে। অনাদির সঙ্গে কিছুদিন ধরে তার খুব ভাব হয়েছে। তাকে কাছে টেনে নিতেই সে হাসতে হাসতে বলে—কোনো ভয় নেই অনাদি দা। দেখবে আমার কতো বড়ো অপারেশন হয়েছিলো?

বলেই প্রফুল্ল তার গায়ের সার্টটা তুলে ধরে তার পিঠের দিকটা দেখায় অনাদিকে। সে এক ভীষণ দৃশ্য। প্রফুল্লের পিঠের প্রান্তরে অপারেশনের ঐ দাগটি যেন একটি নির্জন রাজপথ!

সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রফুল্ল আবার বলে—দেখলেতো অনাদিদা! এতো বড়ো অপারেশনের পরেও তো আমি বেঁচে আছি। কাজেই তোমারও কোনো ভয়ের কারণ নেই!

না, না আমার মোটেই ভয় করছে না। তোমার আর আমাকে সাহস দিতে হবে না। —অনাদি এই বলে থামিয়ে

দেয় প্রফুল্লকে। কিন্তু মুখে একথা বললেও চোখ দুটো তার ছলছল করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

ঠিক সে সময়েই প্রফেসার চ্যাটার্জি বলে ওঠেন আর এক পাশ থেকে—সত্যিই তো, ভয় পাবে কেন? ইয়ং ম্যান, চিকিৎসায় আবার ভয় কিসের?

চ্যাটার্জিও নতুন রোগী। ওয়ার্ডে অনাদির পাশের ঘরেই তাঁর বাস। মফঃস্বল কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক। নিতান্তই কম কথার মানুষ, সর্বক্ষণ লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। তা হলেও আসতে যেতে প্রতিদিনই অনাদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে, মাঝে মাঝে এক-আধটুকু কথাবার্তাও হয়। এ ভাবেই দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অনাদির ডান হাতটা চেপে ধরে প্রফেসারও তাকে অভয় দেন। বলেন—কোনো চিন্তা করো না অনাদি। আমরা রোজ ও-টিতে গিয়ে তোমার খোঁজ নেবো।

না, না আপনারা কখনো ও-টিতে যাবেন না। সার্জেন অত্যন্ত রেগে যান অন্য পেশেণ্ট ও-টিতে গেলে।—প্রফেসারের কথা শেষ হতে না হতেই সিস্টার বলে ওঠেন। কথায় তার বিরক্তির ঝাঁজ মেশানো।

ভেতরে না-ইবা গেলাম। বাইরে থেকেই আমরা না হয় রোজ গিয়ে অনাদির খোঁজ নেবো।—প্রফেসার উত্তর দেন।

এমনি সব কথা বলতে বলতেই ধীরে ধীরে সবাই ও-টির দিকে এগিয়ে চলে। এরই মধ্যে আগে পিছে বেশ লোক

জমে গিয়েছে। জমাদার তার ট্রলিতে একটু জোরে ঠেলা মেরে বলে ওঠে—চলিয়ে বাবুজী, চলিয়ে! আউর থোরা জোরসে চলিয়ে।

মালবোঝাই ট্রলি নিয়ে আস্তে আস্তে চলায় অসুবিধে। ট্রলি নিয়ে দৌড়ে চলতেই জমাদারেরা অভ্যস্ত। তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্যে বাবুদের উদ্দেশ্যে জমাদারের তাগিদ। তার সঙ্গে আবার সুর মিলিয়ে দেন সিস্টার। তিনি তাড়া দিয়েই বলেন—চলুন, চলুন! আর দেরি করবেন না। গল্প করার আর সময় নেই।

এ তাড়ায় সবাই একটু হক-চকিয়ে যায়। মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে। অনাদিও কেমন একটু ইতস্তত করে। কী যেন তার বলার ইচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে তা বলেই ফেলে—আচ্ছা একটু দেরি করে গেলে হয় না? মানে, বেস্পতিবারের বার বেলায় ও-টিতে যাবো? হঠাৎ মনে পড়ে গেলো বেস্পতিবারের কথাটা। আর আধা ঘণ্টাটাক বারবেলা আছে। এই সময়টুকু পার করে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে? আপনি বরং এগোন। আমি এদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ধীরে সুস্থে একটু বাদেই যাচ্ছি।

অনাদি সিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই এতোগুলো কথা বলে। একটা প্রচণ্ড বিরক্তির ভাব যে ক্রমশ এসে ছেয়ে ফেলছে সিস্টারের মুখখানিকে তা লক্ষ্য এড়ায় না অনাদির। কড়া একটা জবাবেরই আশংকা করছিলো সে। সত্যি সত্যি তেমনি জবাবই আসে।

এসব কুসংস্কারের কোনো মানে হয়? হাসপাতালে আবার বারবেলা কালবেলা কী? চলুন, চলুন! আর দেরি করা চলবে না। আমার হাতে অনেক কাজ।—উষ্ণ অসহিষ্ণুতায় এ কয়টি কথা বলে বেশ ত্বরিত পদেই অগ্রসর হন সিষ্টার।

অনাদি আর কি করে, ধীরে ধীরে তার অনুসরণ করতে হয় সিস্টারকে। রোগী বন্ধুরাও সঙ্গে সঙ্গে চলে। সকলে মিলে অনাদিকে ও-টি অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

দলের মধ্যে শান্তনুও রয়েছে গোড়া থেকেই। কিন্তু এবেলা এ অবধি একটি কথাও সে বলেনি অনাদির সঙ্গে। তার যা কিছু বলার সবই সে অনাদিকে বলেছে সকাল বেলা। তবু যেন অনেক কথাই তার বলা হয়নি। অন্তত একটি কথা বলার জন্যে পেছন থেকে সামনে এগিয়ে আসে শান্তনু। এসেই অনাদির কাঁধে হাত রেখে বলে—কালকের দিনটাও আমি আছি এখানে। অপারেশনের সব খবরই আমি পাবো। পরশু হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেও যেমন করেই হোক তোমার খোঁজখবর আমি ঠিকই নেবার ব্যবস্থা করবো। তুমি কিছুই ভেবো না ভাই! যাবার আগে সুপারের পার্মিশন নিয়ে ও-টিতে এসে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমি দেখা করে যাবো।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে শান্তনুর। অনাদিও নির্বাক। কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না তার পক্ষে।

এক ঝলক বাতাস এসে শূন্য নীরবতাকে একটু নাড়িয়ে দিয়ে যায় মুহূর্তের জন্যে। অনাদি সকলের উদ্দেশ্যে আর একবার হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে ও-টিতে ঢুকে পড়ে। তখন থেকেই তার যেন মনে হয়, অনেকখানি ভয় তার দূর হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সে অনুভব করে, এতোগুলো লোকের শুভেচ্ছার শক্তি যেন কাজ করে চলেছে তার মধ্যে।

বন্ধুরা সব ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর অনাদিকে অ্যানিমা দেওয়া হয়। একবার অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং দেন স্টাফ নার্স। রাত্রে শুধু একটু দুধ খেতে দেওয়া হয় তাকে। সেটুকু খেয়েই অনাদি শুয়ে পড়ে তার নতুন বেডে। চোখ বুজতেই অন্ধকারের মধ্যে নানা রকমের ছবি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায় সে সব ছবি। কাল সকালে তার অপারেশন! সেই চিন্তারই সৃষ্টি এসব ছবির মিছিল। কেমন একটা বুকচাপা ঠাণ্ডা ভয় তাকে যেন ঘিরে ধরে। কিন্তু না, ভয়কে অনাদি দুহাতে দূরে ঠেলে ফেলবেই। আধুনিক বিজ্ঞান এবং এতো লোকের শুভেচ্ছা তার সহায়। কোনো আশংকাকেই সে আর আমল দেবে না।

এমনি ভাবতে ভাবতে একবার উঠে বসে অনাদি। টর্চের আলোয় নিজেকে একবার দেখে নেয়। তারপর আবার শুয়ে পড়ে। এবারের ঘুমে রাত ভোর।

সকাল থেকেই উদ্যোগ আয়োজন চলে অপারেশনের। নিজের বেডে বসে থেকেই সব টের পায় অনাদি। যতোই

সময় এগিয়ে চলে ততোই বেশি করে মনে পড়ে তার বাড়ির কথা। স্টাফ নার্সকে জিগ্যেস করে সে জেনে নিয়েছে, তার অপারেশনের সময় তারিখ সবই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বাড়ির লোকদের। অনুপম নিশ্চয়ই তাহলে তাপসীকে নিয়ে আসবে। গভীর আগ্রহ নিয়ে অনাদি প্রতীক্ষা করে তাদের জন্যে। একবার গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। ও-টির দিকে এলে এই বারান্দা থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে। আশায় আশায় পায়চারি করতে থাকে অনাদি। আশা মিথ্যে হয় না তার।

ঐতো অনুপম, ঐ যে তাপসী।—দোতলা থেকে ওদের দেখতে পেয়েই হাসি ফোটে অনাদির মুখে। খুশিতে তার মন ভরে যায়। সেই মনের খুশিরই প্রকাশ মুখের হাসিতে। অপারেশনের আগে তাদের দেখা পাবার জন্যে সে যে আকুল হয়ে উঠেছিলো।

ঠিক রাজহাঁসের মতো গলা তাপসীর। ছুটে গিয়ে সে গলা জড়িয়ে ধরতে মন উসখুস করে ওঠে অনাদির। কিন্তু সে কথা ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জা পেয়ে যায় সে। ছিঃ এ যে হাসপাতাল।

তবু এগিয়ে গিয়ে কথা বলার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে যাচ্ছিলো অনাদি। ঠিক তখুনি সিস্টার এসে বাধা হয়ে দাঁড়ান তার সামনে।

আপনি কোথায় চলেছেন? একটু বাদেই যে আপনার ডাক পড়বে।—সিস্টারের কথায় থমকে দাঁড়ায় অনাদি। চট করে যে কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গলাটা একটু

ঝেড়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে, আমার স্ত্রী আর ভাই এসেছে, ওদের রিসিভ করতে যাচ্ছিলাম।

সে কি কথা, তার জন্যে আপনাকে আবার নিচে নেমে যেতে হবে কেন? ওরা ওপরে উঠে এলেই তো দেখা হবে। আপনাকে পুরো বিশ্রাম নিতে বলেছেন সার্জেন। আপনার একেবারে শুয়ে থাকার কথা। আর আপনি এমনি ছুটোছুটি করছেন জানতে পেলে সার্জেন ভীষণ রেগে যাবেন।—সিস্টারের এবারের বলার মধ্যে বেশ কড়া ঝাঁজ। তার ওপর সার্জেনের ভয় দেখানোয় একটু সন্ত্রস্তই বোধ করে অনাদি। চুপিচুপি নিজের বেডে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

হাসপাতালের চিঠি দেখাতেই অনুপমকে আর তাপসীকে ছেড়ে দেয় দারোয়ান। তারা দোতলায় উঠে আসে। বাইরে থেকে অনাদিকে দেখতে পেয়েই তারা ঠিক অনুমান করে নিয়েছিলো তার ঘর কোথায়। তাই কোনোরকম খোঁজাখুঁজিও করতে হয় না, এমনকি জিগ্যেসও করতে হয় না কাউকে। খোঁজাখুজি করতে হলে অনাদির সঙ্গে তাদের হয়তো মুহূর্ত আলাপেরও সুযোগ ঘটতো না।

দোতলায় উঠেই বা-হাতের ঘরে অনাদি। অনুমান মতো দরজার পর্দাটাকে একটু সরাতেই দাদাকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পায় অনুপম। অনাদিও তাকে দেখেই উঠে বসে। বসতে বসতেই জিগ্যেস করে, সুবাস রত্না ওরা সবাই ভালো আছে তো?

হ্যাঁ, ওরা সবাই ভালো আছে। বুবলি টুটুল দুজনেই

বাপকে দেখতে আসার জন্তে অস্থির। কাল রাতে ভাই-বোনের সে কী বায়না! ভাগ্যি, রওনা হবার সময় অবধি ঘুম ভাঙেনি, ভাঙলে মুশকিলই হতো।—এই বলে অনাদিকে খুশি করতে চায় তাপসী।

কিন্তু তোমরা এতো দেরি করলে কেন আসতে বলতো?

বারে, দেরি কোথায়! ফার্ষ্ট ট্রেণ ধরে এলাম। রাণা-ঘাট থেকে কোলকাতা আসতে ট্রেণটাকে দুঘণ্টা টাইম তো দেবে। আর স্টেশন থেকে হাসপাতালও তো খুব কম পথ নয়!—অনুপম বেশ রসিয়েই উত্তর দেয় দাদার প্রশ্নের।

চলিয়ে বাবুজি, সার্জেন সাব আপকো আভি মাঙতা।—অনুপমের কথা শেষ হতে না হতেই জমাদার এসে তাগিদ দেয় অনাদিকে।

তাপসী এবং অনুপম দুজনেই এবার বুঝতে পারে কেন অনাদি দেরির কথা তুলেছিলো একটু আগে। এতো বড়ো একটা অপারেশন হবে, তার আগে দুদণ্ড বসে কথা বলার আশাতেই তো অতদূর থেকে এমন করে ছুটে আসা! আর অনাদিও তো কম আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো না তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসে একটু আলাপ করার জন্যে। আর একটু সময় পেলে বুবলি টুটুলকে নিয়ে কতো রকমের হয়তো প্রশ্ন করতো, কতো দরকারী কথাও হয়তো বলার ছিলো তার। তার জন্যেই বোধহয় জমাদারের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি অমন কালো হয়ে গেলো অনাদির।

এসে অবধি অনাদির মুখের দিকেই তাকিয়েছিলো

তাপসী। জমাদার এসে 'চলিয়ে বাবুজি' বলতেই সে মুখের পরিবর্তনও তাই লক্ষ্য এড়ায়নি তার। তবে সে পরিবর্তন যে স্ত্রী এবং ভাইয়ের সঙ্গে বসে আলাপের ব্যাঘাতের জন্যেই শুধু ঘটেছে তা না হলেও সেও যে একটা কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপারেশনের প্রাক মুহূর্তে, সার্জেনের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখের চেহারার একটু আধটু বদল হবে না, চেষ্টা করেও মনকে এতোটা সবল রাখা আর যার পক্ষেই হোক অনাদির পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

তোমরা এখানেই বোসো। একেবারে অপারেশনের খবর জেনে নিয়েই বাড়িতে ফিরবে।—পরিষ্কার জামাটা গায়ে চড়িয়ে এবং মাথাটা একটু আঁচড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে স্ত্রী ও ভাইকে নির্দেশ দিয়ে যায় অনাদি।

নটার পর বার দুই ও-টিতে এসে ঘুরে গিয়েছে শান্তনু, হরষিৎ, প্রকাশ, সুপ্রতুল ওরা। দাদুও অকিঞ্চন ঘোষকে নিয়ে একবার এসেছিলেন একটু আগে। কিন্তু তখনো অপারেশনের শেষ খবর জানা যায় নি, তবে ভয়ের কিছু নেই এটুকু জেনে তাঁরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ হরষিৎকে নিয়ে শান্তনু আবার এসে হাজির। ও-টির দরজার কাছে আসতেই অনুপম আর তার বৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাদের। দেওর-বৌদি দুজনের চোখে-মুখেই স্বস্তির ছাপ তারা লক্ষ্য করে।

কি, কখন এসেছিলে তোমরা?—অনুপম তার বৌদিকে নিয়ে বাইরে নেমে আসতেই শান্তনু জিগ্যেস করে তাকে।

আমরা এসেছি এই নটার একটু আগে।

দেখা হয়েছেতো অনাদির সঙ্গে? কেমন দেখে এলে?

অপারেশনের আগে দেখা হয়েছিলো, তবে কথাবার্তা বলার সময় পাওয়া যায়নি। অপারেশনের পর দাদাকে স্ট্রেচারে করে বেডে এনে রাখা হয়েছে। এখনো তিনি অজ্ঞান অবস্থায়ই আছেন। তবে ডাক্তার বাবুরা সবাই বল্লেন যে অপারেশন একেবারে নিখুঁত হয়েছে, ভয়-ভাবনার বিন্দুমাত্র কোনো কারণ নেই।

ব্যস, তা হলেই হলো। আমরা সবাই নিশ্চিন্ত।—নেহাৎ একজন মুরুব্বির মতোই মন্তব্য করে হরষিৎ।

হ্যাঁ, শোনো অনুপম। কালই হাসপাতাল থেকে আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে। ছমাস কমপ্লিট রেস্ট নেবার নির্দেশ রয়েছে ডাক্তারের। সেরকম রেস্ট নেওয়া কতোটা কি যে হবে ভগবান জানেন, তবে ডাক্তারদের ভয়েই হাসপাতালে অন্তত প্রথম দু-এক মাসের মধ্যে খুব বেশি আসা সম্ভব হবে না আমার। তাই বলছি এদের কাছ থেকে সব সময় চিঠিপত্র পেলেও তোমার চিঠিও মাঝে মাঝে আমি পাবার আশা রাখবো। অনাদির খবরের সঙ্গে তোমাদের সকলের খোঁজ খবর জানিয়ে সপ্তাহে অন্তত একখানি করে আমায় চিঠি দিও।—গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেই যে শান্তনু একথা বলছে অনুপম এবং তাপসী দুজনেই তা অনুভব করে।

অনুপম জবাবে জানায়, সপ্তাহে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে একখানা করে আপনি চিঠি পাবেন। এবং একথা

বলেই সে শান্তনুর সিদ্ধার্থ কলোনীর বাড়ির ঠিকানাটা টুকে নেয় ডাইরীতে।

আপনারা কি এখনই আবার রাণাঘাট চলে যাবেন নাকি?—তাপসীকে লক্ষ্য করেই প্রশ্ন করে হরষিৎ।

অনুপম তখন শান্তনুর ঠিকানাটা টুকছে ডাইরীতে। তাহলেও লেখাটুকু শেষ করে সে-ই উত্তর দেয় হরষিতের প্রশ্নের। বলে, না এবেলা আর আমরা যাচ্ছিনে, দাদার বিকেলের অবস্থাটা জেনে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ি ফিরবো। এই বলে অনুপম বৌদিকে নিয়ে গেটের দিকে এগোয় আর শান্তনু ও হরষিৎ কথায় কথায় তাদের ওয়ার্ডে চলে আসে।

ভালো কথা, সত্যি তুমি একটা বড়ো আবিষ্কার করেছো হরষিৎ।—ও-টি থেকে আসার পথে অনাদির অপারেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতেই হঠাৎ অন্য প্রসংগ তোলে শান্তনু।

সে আবার কি?

জিগ্যেস করছো, কেন নিজে থেকে বুঝতে পারছো না? তোমায় কাল থেকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি। বাস্তবিকই সুমিত্রা এতো সুন্দর গাইতে পারে আগে জানতে পেলে আমাদের আরো কতো আসরে তাকে দিয়ে গাওয়ানো যেতো।

শান্তনুর কথায় ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে ওঠে হরষিৎ। সে চাঞ্চল্যকে বাইরে প্রকাশ হতে না দিয়ে ছোট্ট একটি উত্তর দেয় সে, বারে, সুমিত্রা যে গীতশ্রী।

ছিঃ ছিঃ একী বলে ফেল্লে সে, ভালোদা কি ভাববে!— নিজের ঘরে ঢুকে লজ্জায় জিভ কাটে হরষিৎ। সুমিত্রাকে সে সুমিতা বলে ফেলেছে শান্তনুর কাছে, সেজন্যেই এ লজ্জাবোধ। কিছুদিন ধরে সুমিত্রাকে সুমিতা বলেই ডাকতে শুরু করেছে হরষিৎ, হঠাৎ একদিন সুমিত্রাও মিতা বলে ডেকে ফলেছে হরষিৎকে। কিন্তু এই ডাকা-ডাকি ওদের দুজনের বাইরে যে জানাজানি হবার কথা নয়!

এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে সুমিত্রাকে নিয়েই অনেক কথার জট পাকিয়ে যায় হরষিতের মনের মধ্যে। সুমিত্রা খুবই কম কথা বলে তা ঠিক, কিন্তু ওর চোখের রঙের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনই সে লক্ষ্য করেছিলো অনেক কথার মেলা ঐ চোখের তারায়। তারপর থেকেই সে আবিষ্কার করে চলেছে সুমিত্রাকে নানারূপে, নানা মহিমায়। শুধু গায়িকা সুমিত্রাকে আবিষ্কার করে সন্তুষ্ট হতে পারেনি হরষিৎ, প্রেমিকা সুমিতা ও মোহিনী সুমিতার সন্ধান পেয়ে তবেই তার সোয়াস্তি। তার সুমিতা ডাকের উত্তরে প্রথম যেদিন সুমিত্রা তাকে মিতা বলে ডাকলে সুমিত্রার সমগ্র চেতনার একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো সে। এসবের কোনো খবরই কেউ জানে না। অনাদিকে সামান্য একটু আভাষ সে দিয়েছিলো তার প্রেমচর্চার। তার কাছ থেকে শান্তনু যদি কিছু শুনে থাকে। তবে বুড়ো যোগেন মজুমদার যে হরষিৎ-সুমিতার গোপন তথ্যের সন্ধান কোথা থেকে কী করে পেলেন তাই এক

পরম আশ্চর্য। দাদু সেদিন যখন হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়িয়ে গানের সুরে বললেন, ওহে ছোকরা, ভালোবাসা ঝুলিয়ে রাখা চলে না বেশিদিন, তখন সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলো হরষিৎ।

তারপরে দাদুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি হরষিতের। তবু এই মুহূর্তে তাঁর ঐ দিনের সেই কথাটি বিশেষভাবেই তার মনে পড়ে, কারণ দাদুই প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন তার মনের খবরের। তাঁর আগে অনাদি ছাড়া আর কেউ বিন্দু-বিসর্গও টের পায়নি।

॥ আঠার ॥

'সিদ্ধার্থ কলোনীতে নিজেদের নতুন বাড়িতে ফিরে এসে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় শান্তনু। কী চেহারা হয়ে গিয়েছে সকলের! কাউকেই যে চেনা যায় না। দেখলেই মনে হয় যেন এক এক জন টি-বি রোগী।

শান্তনু বুঝল এদেরও আর বেশি দেরি নেই। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে একটা কালোছায়া এসে যেন ছেয়ে ফেললে তাকে।

বাড়ির সবাই কিন্তু খুবই খুশি শান্তনুকে এতোদিন পর তাদের মধ্যে ফিরে পেয়ে। আহা কী সুন্দর চেহারাই না হয়েছে তার! সকলের চোখে মুখেই একটা হাঁফ-ছেড়ে-বাঁচার ভাব। এবার শান্তনু সংসারের সব ভার নেবে—

তাদের সব দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে এই আর কি। শান্তনুর বুক কিন্তু শুকিয়ে এসেছে ততোক্ষণে চারদিকের পরিবেশ লক্ষ্য করে।

ঘরে ঢুকতেই সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায় শান্তনুকে। শুধু তার বাবা ছিলেন না সে সময় বাড়িতে। দুর্বল শরীর নিয়েও তিনি ছেলে পড়াতে গিয়েছেন কোথায়। নিরুপায় হয়েই দুবেলায় দুটি ট্যুইশানি করতে হয় তাঁকে।

মাকে আর বৌদিকে সামনে দেখতে পেয়েই প্রণাম করে শান্তনু। আর সঙ্গে সঙ্গে দরদর ধারায় জল ঝড়ে পড়ে মায়ের চোখ থেকে। বৌদি আর বোনের চোখও জল-ছলছল।

বোন অণিমা দাদাকে প্রণাম করেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, দাদার দিকে চাইতে যেন বুক ভেঙে যায় তার। জন্ম থেকেই অণিমা বড়ো বেশি আদরের শান্তনুর, তার মান-অভিমান, আব্দার-অভিযোগ সব কিছুই এই দাদার সঙ্গে আর দাদাকে নিয়ে! সেই দাদাকে ছেড়ে দুবছরেরও বেশি সময় সে দূরে সরে আছে। সে দূরত্বের দুঃখ কি বড়ো কম জমেছে এ দুবছরে? এ অবশ্য সত্যি কথা, তিন চার মাস পর পর অণিমাও দাদাকে গিয়ে দেখে এসেছে হাসপাতালে, কিন্তু সে কতোটুকু সময়ের জন্যে? আর সে কি আব্দারের জায়গা না অভিমানের? কাজেই দাদার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না অণিমা। শান্তনুও তা বুঝতে পারে।

একটু আড়ালে আসতেই স্বামীর মুখের দিকে একবার

তাকিয়ে মঞ্জুও সসংকোচে প্রণামের পালাটা চুকিয়ে ফেলে ক্ষিপ্র হাতে। খুবই রোগা হয়ে গেছে মঞ্জু। হাড়-মাংস একাকার হয়ে গেছে একেবারে। একমাত্র তার তাকাবার ভংগিমা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই তাকে চেনবার। ভারি মায়া হয় দেখে। বুকের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে ওঠে শান্তনুর তার আপন অক্ষমতার অসীম দুঃখে।

এরই মধ্যে কেমন করে খোকন টের পেয়ে গেছে তার বাবা এসেছে। বছর পাঁচেকের শিশু, বাবার কথা তার ছিটেফোঁটাও মনে থাকার কথা নয়, তবে বাবা কথাটি খোকনের একেবারে জিভের ডগায়। বাবার বিষয়ে তার আগ্রহেরও অন্ত নেই, আর দিনরাত্রিতে প্রশ্নেরও শেষ নেই। সেই বাবা এসেছে শুনতে পেয়ে বাইরে খেলার সাথীদের না জানিয়েই ছুটে আসে সে লাফাতে লাফাতে। কিন্তু বাবার চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় সে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে তার মায়ের পিছনে আর পালিয়ে পালিয়ে মুচকি মুচকি হাসে।

সে হাসি দেখে আর স্থির থাকতে পারে না শান্তনু। ছুটে গিয়ে সে এক টানে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নেয় খোকনকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুর মা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন একেবারে —ওরে, ওযে দুধের শিশু! ওকে নিয়ে এখনই অমন ছোঁয়াছুঁয়ি নাই বা....

বৃদ্ধা আর শেষ করতে পারলেন না তাঁর মুখের কথা।

কেমন যেন থতমত খেয়ে বলতে বলতে থেমে গেলেন। কথা বলার ক্ষমতাই যেন তিনি হঠাৎ হারিয়ে ফেললেন।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে শান্তনু, সে-ও গভীর আগ্রহে হাত বাড়িয়েছে ছেলেকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে। তারও ইচ্ছে নয় খোকনকে এখন কোলে নেয় বা আদর করে শান্তনু। ভীষণ ভয়, কিসে আবার কী হয়ে বসে কচি ছেলেটার।

কিন্তু শান্তনু নিজে তো জানে তার কাছ থেকে সংক্রমণের কোনো আশংকাই নেই বর্তমানে। ডিসচার্জ নোটিশ পাবার পর পৃথক পৃথক ভাবে সে এক একজন ডাক্তারকে জিগ্যেস করে জেনে নিয়েছে তার অবস্থার কথা। নিজের বুকের প্লেট দেখেও সে নিজের সম্বন্ধে একরূপ পুরোপুরিই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ডাক্তাররা তাকে খুব সতর্ক সাবধান থাকতে বলেছেন, এই যা। বেশি পরিশ্রম যদি তাকে না করতে হয়, যদি সে সত্যি সত্যি সাবধান থাকতে পারে তা হলে আবার অসুখে পড়ার কোনো ভাবনা নেই তার। এ সবই শান্তনু জানে। তবুও কোল থেকে শান্তনু নামিয়ে দেয় তার খোকনকে। দুঃসহ বেদনাকে উপেক্ষা করেই খোকনকে সে ছেড়ে দেয়—ঠেলে পাঠিয়ে দেয় তার মায়ের দিকে। নানা রকমের দুঃখের মধ্যে খোকনকে নিয়ে আবার একটা নতুন দুশ্চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় না শান্তনু তার মা এবং তার স্ত্রীর মনে। তবে খোকন তার মায়ের দিকে একপা দুপা করে এগুতে এগুতে পিছন ফিরে তাকাতেই আর স্থির

থাকতে পারেনা শান্তনু। সেখান থেকে পাশের একটা ঘরে ঢুকেই সটান সে তক্তপোষের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

শান্তনুর মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা। অসুখের আগে ছেলেকে বেশি করে কোলে না নেওয়ায় কতো অনুযোগই না তাকে শুনতে হয়েছে স্ত্রীর কাছ থেকে। আর আজ? আজ ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে কোল থেকে নামিয়ে দিতে হলো সেই স্ত্রীরই ইচ্ছায়! পিতার মনের যে ব্যথা তা তার নিজের মাও ধরতে পারলেন না, তার সন্তানের মায়ের কাছেও তা ধরা পড়লো না। কী অদ্ভুত এই টি-বি! এমনি আরো কতো চিন্তা ভেসে ওঠে শান্তনুর মন-সমুদ্রে তরংগের দোলায় দোলায়।

শান্তনু যা ভেবেছিলো ঠিক তাই হয়েছে। হাসপাতাল থেকে সে বাড়ি আসার পর এক এক করে সমস্ত সাহায্যই বন্ধ হয়ে গেছে।. আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও কেউ কেউ যারা মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতেন শান্তনুর বাবাকে, সবাই তাঁরা ধরে নিয়েছেন শান্তনু যখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে তখন আর সাহায্য পাঠানোর দরকার থাকতে পারে না।

কোথায় সকলের আশা সমাদ্দার পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে এতো দিনে, তা না হয়ে সংকট আরো তীব্রতর হয়ে উঠলো তাদের। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও শান্তনুর যে কিছুদিনের জন্যে পূর্ণ বিশ্রাম দরকার, সংসারের গুরুভার যে

এখনই তার নেওয়া উচিত নয়, একথাটা বাড়ির লোকরাও কেউ একবার চিন্তা করেনি। তা না করুক, সে জন্যে কোনো দুঃখ নেই শান্তনুর। তাদের অসহনীয় দুঃখকষ্ট দেখে সে-ই বরং ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে কোনো রকমে উপার্জনের একটা কিছু পথ খুঁজে বার করার জন্যে। কিন্তু এই অভিশপ্ত দেশে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার উপায় বার করে নেওয়া কি এতোই সহজ!

অনেক ঘোরাঘুরি করেও কিছুই করে উঠতে পারলো না শান্তনু।

সংসারের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। কোনোদিন একবেলা হয়তো চারটি আহার জোটে, কোনোদিন হয়তো কিছুই জোটে না। এমনি হাল।

এ অবস্থার জন্যে শান্তনুই যেন পুরোপুরি দায়ী এমনি ভাব বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকলেরই কেমন একটা বিরক্তি, একটা বেদনাদায়ক বিরূপতা শান্তনু প্রতিক্ষণেই লক্ষ্য করে তার প্রতি। বুকের পাঁজরে পাঁজরে ঝড়ের উন্মত্ততা অনুভব করে সে। মঞ্জুর চোখের জল পাগল করে তোলে তাকে। শুধু তার চোখের জলই নয়, তার মুখের কালিমা, ঠাণ্ডা গলার স্বর সব কিছু মিলে শান্তনুর মনের দিগন্তে একটা তুফানের আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

শান্তনুর হৃদয়ও ক্রমেই পাষাণ হয়ে ওঠে একটা নিরুদ্ধ অভিমানে। প্রায় দু বছর পর বাড়িতে ফিরে এসে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে বেশ

ভালো করেই জেনেছে, মুখে যে যতোই শুভ কামনা জানাক না কেন, তাকে এড়িয়েই চলতে চায় সবাই। কিন্তু বাড়ির লোকদের স্বার্থ পূরণ করতে পারেনি বলে তারাও যে এমনি বিরূপ হয়ে উঠবে তা ভাবতেই পারেনি শান্তনু। সেই বিরূপতা সেই উপেক্ষারই একটা প্রতিক্রিয়া সে যেন অনুভব করছে নিজের মধ্যে। মাস তিনেকের মধ্যেই সত্যি সত্যিই সে যে অনেকখানি উদাসীন হয়ে পড়েছে সংসারের প্রতি সে বিষয়ে সেও যথার্থই সচেতন।

শুধু খোকনকে ভুলতে পারেনি শান্তনু। তার বেলা বরং আকর্ষণ বেড়েই চলে তার দিনের পর দিন। নিরপরাধ শিশু খোকন। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সর্বক্ষণ হাসি লেগেই আছে তার মিষ্টি মুখে। ঐ মুখের দিকে চেয়েই শান্তনু পরিশ্রম করে চলে দিনরাত্রি।

খোকনকে মানুষ করে তুলতেই হবে, দেহে-মনে-মনীষায় বড়ো হতে হবে তাকে—যক্ষ্মা প্রতিরোধ আন্দোলনে এই খোকনই যে হবে শান্তনুর প্রধান সহায়, তার শ্রেষ্ঠ সহকারী! কিন্তু খোকনকে মানুষ করে তোলাতো সম্ভব নয় মঞ্জু না বাঁচলে। মঞ্জুকে বাঁচাতেই হবে খোকনের জন্যে।

কিন্তু মঞ্জু কি বাঁচবে? দিন দিন যে ছিরি হচ্ছে চেহারার!—তক্তপোষের ওপর মোড়ানো বিছানায় হেলান দিয়ে একা একাই বর্তমান ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছিলো শান্তনু। হঠাৎ অণিমার ডাকে সোজা হয়ে বসে।

দাদা, তোমার চিঠি এসেছে।—ঘরে ঢুকে একখানা খাম

দাদার হাতে তুলে দিয়ে অণিমা সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে যায়। শান্তনুর একবার ইচ্ছে হয়েছিলো বোনকে ডেকে কাছে বসিয়ে তু-চারটে কথা বলে। কিন্তু অণিমার কী পরিমাণ যে লজ্জা বেড়েছে এ তুবছরে, তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় শান্তনু। হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে আসার পর থেকেই অণিমা এড়িয়ে এড়িয়ে চলে দাদাকে। ক্বচিৎ কখনো তু-একটা কথা বলে নিতান্ত প্রয়োজনে। তাকেই শান্তনু লজ্জা বা সংকোচ বলে ধরে নিয়েছে।

আসলে কিন্তু তা নয়। এ কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়, এ তুঃখের। দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় অণিমার। আজ সে-ই তো তার বাপ-মায়ের, তার দাদার বড়ো গলগ্রহ। এক এক সময় সে ভাবে তার বড়দা আর ছোড়দার বদলে তার যদি মৃত্যু হতো তা হলে কতোই না ভালো হতো! কিন্তু মানুষ যা ভাবে তার কতোটাই বা আর ঠিক হয়! ঠিক হলে ভালো হতো কি মন্দ হতো তা বলাও ভারি মুশকিল। সংসারে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতাই হয়তো তাতে বেড়ে যেতো। তবু নিজ নিজ ইচ্ছে পূর্ণ হোক, সব মানুষেরই এই একান্ত কামনা।

বড়ো ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অণিমা হয়তো আঙুলের নখ খুঁটছে তো খুটছেই, কিংবা পিছনে রঙ চটে যাওয়া অতি পুরনো আয়নাখানাকে আরো পুরনো নড়বড়ে একমাত্র টেবিলখানার ওপর বসিয়ে নিয়ে তার

সামনে দাঁড়িয়ে অধিকাংশ ভাঙা দাঁতওয়ালা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়েই চলেছে, আর নয়তো ঠাকুর ঘরে ধূপ-দীপ দিতে গিয়ে সেখানেই বসে রয়েছে। এমনি সব নানা অবস্থায় অণিমাকে লক্ষ্য করেছে শান্তনু। দাদার শব্দ শুনে কখনো কখনো সে অলক্ষ্যেই পালিয়ে গিয়েছে। সামনা সামনি পড়ে গেলে দাদার দু-একটা কথার উত্তর দিয়েই সে উধাও হয়েছে। সে সব কথাই একে একে মনে পড়ে যায় শান্তনুর। তাই বোনকে কাছে ডেকে এনে কথা বলার ইচ্ছে হলেও সে আর ডাকে নি অণিমাকে। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়তে শুরু করেছে।

পঞ্চাননের চিঠি।

চিঠি খানা খুলে ধরতেই সমগ্র দীননাথ হাসপাতালের পরিবেশ যেন শান্তনু অনুভব করে তার চারদিকে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সে ভুলে যায় যে, সে ফিরে এসেছে সিদ্ধার্থ কলোনীতে। 'নবারুণ' প্রকাশের সময়তো আবার হয়ে এলো। পরের সংখ্যাটি নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। ভালো করে ছেপে দেবার ভার নিয়েছে অরিজিৎ। নিশ্চয়ই সে তা করবে। হরষিৎ যেরূপ করিৎকর্মা তাতে 'নবজীবন সংস্কৃতি সমিতি'র কাজ তার পরিচালনায় যে যথাযথ ভাবেই এগিয়ে চলেছে সে বিষয়েও সন্দেহের কোনোই কারণ নেই। সুপ্রতুল, প্রকাশ, পদ্মা ওরা সবাই কাজের মানুষ। তাই ওদের ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে এসে শান্তনু নিশ্চিন্ত। তা হলেও পঞ্চাননের চিঠিতে 'নবজীবন সংস্কৃতি সমিতি'র কাজকর্ম

সম্বন্ধে কিছু খবর আশা করেছিলো সে। কিন্তু নিজের কথা ছাড়া হাসপাতালের আর কোনো কথাই নেই সে চিঠিতে। পঞ্চানন লিখেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার ছুটি হয়ে যাবে। ছুটির পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ফুল্লরাকে নিয়েই শান্তনুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। বাড়িতে ফিরে এসে বাড়ির লোকদের পরিচর্যায় শান্তনু এখন নিশ্চয়ই বেশ ভালো আছে, এ আশাও প্রকাশ করেছে পঞ্চানন।

সে আশা পঞ্চানন করতে পারে। যার বাপ-মা রয়েছেন, স্ত্রী রয়েছেন, বোন রয়েছে সেই স্বজনদের মধ্যে ফিরে এসে একজন সুস্থ টি-বি রোগীর স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকার কথা, কিন্তু শান্তনুদের সংসারের যে অবস্থা তাতে কী করে সে ভালো থাকতে পারে? হাসপাতাল-জীবনে পঞ্চানন খুব অন্তরঙ্গ হলেও তার কাছেও শান্তনু কখনো নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের কথা তেমন ভাবে প্রকাশ করেনি। দাদুর কাছে কথায় কথায় ছুটির আগে যেটুকু বলেছিলো তার .বিচিত্র রকমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও কোনো কোনো মহল থেকে শান্তনুর কানে এসেছিলো। 'মরা হাতি লাখ টাকা' এই প্রবাদ বাক্যটিও কেউ কেউ প্রয়োগ করছিলো তার সম্বন্ধে। তার অবর্তমানে হাসপাতালে যদি সে ধারণাটা আরো বেশি করে চালু হয়ে থাকে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে ফুল্লরাকে নিয়ে পঞ্চানন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে তার কী অবস্থা।—পঞ্চাননের চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে বিছানার নিচে গুজে রেখে এমনি ধারায় ভেবে

চলে শান্তনু। কিছুক্ষণ বাদে আবার সে চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে।

পঞ্চানন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। শীঘ্রই সে ছুটি পাবে। সে তার ফুল্লরাকে ফিরে পাবে। কতো আনন্দ হবে তার। আনন্দেরই কথা। হাসপাতালে পঞ্চানন প্রায়ই খোকনের কথা জিগ্যেস করতো। এ চিঠিতেও সে খোকনের কথা লিখতে ভুল করেনি। এজন্যে খুবই খুশি শান্তনু। খোকনই যে তার আসল ভাবনা।

নিজের কথা এখন আর মুহূর্তের জন্যেও ভাবে না শান্তনু। অন্য কারো কথাও নয়। শুধু খোকনের কথা এবং খোকনের জন্যেই খোকনের মায়ের কথা।

সারাদিন খেটেখুটে যা কিছু শান্তনু নিয়ে আসে তা দিয়ে তিনটি প্রাণীর হয়তো কোনরকমে চলে যায়। কিন্তু সংসারে তারা তিন জনই তো শুধু নয়। আর তাতে ওষুধ-পত্র বা কোনো পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করাও চলে না। শান্তনু তাই বার বার মঞ্জুকে বলেছে তার নিজের শরীরের দিকে নিজে একটু লক্ষ্য রাখতে—নিজের কথাটা একটু ভাবতে।

হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এসে প্রথম রাত্রিতেই মঞ্জুর বুকের হাড়পাঁজরা কখানা দেখে শিউড়ে উঠেছিলো শান্তনু। কোনো জীবন্ত মানুষের দেহরূপ যে এমন হতে পারে তা ছিলো তার কল্পনাতীত। কিন্তু তার অমার্জনীয় অক্ষমতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কীইবা করার আছে তার? চেষ্টার তো কোনো কসুর করে নি সে।

আমতা লাইনে মার্টিনের ছোট রেলগাড়ি খুব ধীরে সুস্থে চলে। রেলগাড়ি এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে কি ভাবে আসে সবই খোকন লক্ষ্য করেছে গভীরভাবে মন দিয়ে। এখনো সে তা ভুলে যায়নি। গ্লাস-বাটি নিয়ে এই রেলগাড়ি খেলার মধ্যে সেই স্মৃতি-বিচরণই চলছে খোকনের।

সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শান্তনুর।

বাবা, তি হয়েছে ?—বাবার সেই বড়ো বড়ো চোখে চোখ পড়তেই খোকন জিগ্যেস করে বসে এই কঠোর প্রশ্ন।

হঠাৎ পিপাসায় যেন বুক শুকিয়ে আসে শান্তনুর। নিজেই কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। তারপরে 'বাবা, তুমি খেলা করো, আমি আসছি' —এই বলে খোকনের দুগালে মিষ্টি করে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে কোথায় যেন বেরিয়ে যায়।

নিশ্চিন্ত আনন্দে খোকন আপন মনে তার রেলগাড়ির খেলা চালিয়ে যায় আরো অনেকক্ষণ ধরে।

॥ উনিশ ॥

অর্থের সন্ধানে শান্তনুর দৌড়োদৌড়ির আর শেষ নেই। মঞ্জুকে সারিয়ে তোলার জন্যে চেষ্টার অন্ত নেই তার। একবার সে মনে মনে ঠিক করেছিলো, চিঠি লিখে মঞ্জুর কথা সে জানাবে দিদিকে। খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন মুখার্জিকে নিয়ে নিশ্চয়ই তিনি আসবেন মঞ্জুকে দেখতে। চিঠি লিখলে হয়তো সত্যি সত্যি তাঁরা আসতেন। কিন্তু পরে কী যেন ভেবে এ ব্যাপারে শান্তনু আর কিছুই লেখেনি দিদির কাছে।

প্রথমেই ক্যাপ্টেন মুখার্জিকে নাইবা টেনে আনা হলো। কাছেই বাড়ি ডাঃ গুপ্তের। তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললে তিনিও নিশ্চয়ই একবার আসবেন। তাই করেছে শান্তনু। সে যা ভেবেছিলো তাই হয়েছে। তার মুখে সব শুনে ডাঃ গুপ্ত এসে দেখে গিয়েছেন মঞ্জুকে এবং রায়ও দিয়ে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও।

হ্যাঁ, কালরোগেই ধরেছে ওকে।—রোগিনীকে দেখে মন্তব্য করেছেন ডাঃ গুপ্ত। তবে একথাও বলেছেন, এখনও ফাষ্ট´ স্টেজ, ভালো খাওয়া-দাওয়া ও ওষুধপত্র পড়লে হয়তো সেরেও যেতে পারে। খুব সাবধানে থাকা দরকার।

কিন্তু কোথা থেকে আসবে ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ-পত্তর? ডাঃ গুপ্ত খুবই সহানুভূতিশীল এবং শান্তনুকে

ভালোবাসেন বলেই বিনে টাকায় তাঁকে এনে মঞ্জুকে দেখানো গেছে। কিন্তু ফল-দুধ তো আর বিনে পয়সায় মিলবে না, ওষুধ-ইনজেকশনও নয়।

হ্যাঁ, ফুড অবশ্য কিছু মিলেছে রেডক্রসের কাছ থেকে। ডাঃ গুপ্তের চিঠির জোরে কিছু গুঁড়ো দুধ আর আমেরিকান ঘি জোগার করে এনেছিলো শান্তনু। কিন্তু সে-সব তো দিন পনেরোর মধ্যেই সাবাড়। তারপর আর দুধ-ঘি আসবে কোত্থেকে? ওষুধ-পত্তরের খরচই বা চলবে কী করে?

শান্তনু কাবু হয়ে পড়ে এসব চিন্তা করতে করতে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে শান্তনুদের বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন সস্ত্রীক ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

গাড়ির হর্ন শুনে সবাই হকচকিয়ে ওঠে বাড়ির মধ্যে। সেদিন ডাঃ গুপ্তকে অনুরোধ করে আনা হয়েছিলো, তিনিও গাড়ি করেই এসেছিলেন। এমনি ব্যাপার ছাড়া এ-বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াবে, সে কথা যে ভাবতেই পারে না কেউ। তাহলে ডাঃ গুপ্তই দয়াপরবশ হয়ে আবার এলেন নাকি! তেমনি একটা ধারণা নিয়েই শান্তনু বাইরের বারান্দায় ছুটে আসে। আর তাকে দেখেই মুখার্জি সাহেব সরব।

কীহে, তোমার গিন্নীও নাকি অসুখে পড়েছে, ডাঃ গুপ্ত বললেন। তোমার দিদিতো তাই শুনে আমায় নিয়ে ছুটে এলেন! কোথায়, চলো দেখি কী হয়েছে দেখা যাক।

আসুন, আসুন।—সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে শান্তনু বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায় তার দিদিকে আর ক্যাপ্টেন মুখার্জিকে।

শান্তনুদের ঘর-বাড়ির অবস্থা দেখে ব্যথায় অন্তর কেঁদে ওঠে মিসেস মুখার্জির। কোনোদিন তো এমন দারুণ দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায়নি শান্তনুর কোনো কথায়! সবটাই ভারি আশ্চর্যের বলে মনে হয় তাঁর কাছে। তাহলেও মুখে তার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করেন না তিনি। বরং তাঁর সমস্ত অনুভবকে চেপে রেখে তিনি বেশ খুশির সঙ্গেই আলাপ-সালাপ করে চলেন সবার সঙ্গে।

আর এক ঘরে বসে ক্যাপ্টেন মুখার্জির সঙ্গে গল্প করছে শান্তনু। একবার এসে ডাক্তার সাহেবের কাছে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে গেছেন শান্তনুর বাবা পুত্রের জীবন রক্ষার জন্যে। বৌমাকে সুস্থ করে দেবার জন্যেও আবেদন জানিয়ে গেছেন। বলেছেন, আমার বৌমাকে ভালো করে তুলতে না পারলে আমার দাদুকে কী করে বাঁচাবো ডাক্তার বাবু! ঐ একরত্তি শিশুইতো আমার বংশ-তিলক, বংশের একমাত্র প্রদীপ!

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন বৃদ্ধ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, সেখানে আর দাঁড়াতে পারেন নি।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। সাধারণত তিনি তা হন না। ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তির জোর তাঁর কাছে সব সময়েই বেশি, হৃদয়ের চেয়ে

মস্তিষ্কের। কিন্তু এক্ষেত্রে বৃদ্ধের কথায় একটু বিচলিত বোধ করছিলেন তিনি ভিতরে ভিতরে।

শান্তনু হাসপাতালের প্রসংগ তুলতেই সে অবস্থা থেকে নিজেকে সহজে সরিয়ে নিলেন মুখার্জি সাহেব। বললেন, হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার বন্ধু পঞ্চানন চক্রবর্তী দিন পাঁচ-সাত হলো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে, সে খবর রাখ তো ?

না তো! তবে কিছুদিন আগে পঞ্চাননের একখানা চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো, তাতে সে জানিয়েছিলো শীগগিরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে —শান্তনু উত্তর দেয়।

বাঃ, চিঠি দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ! এক সপ্তাহের মধ্যেও সে এসে দেখা করে যাবার সময় পেলো না তোমার সঙ্গে, এরই নাম বন্ধুত্ব ? ছোঃ!

না, নিশ্চয়ই পঞ্চানন এরই মধ্যে একদিন এসে পড়বে। এদ্দিন পর এসেছে, কতো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে হয়তো পড়ে গিয়েছে কে জানে।—শান্তনু বন্ধুকে বাঁচিয়ে কথা বলে।

পঞ্চাননের আবার কিসের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট। তবে শুনেছি, ফুল্লরাকে নাকি সে বিয়ে করবে—ফুল্লরার বাড়িতেই নাকি উঠেছে। বিয়ের ব্যাপার নিয়েই হয়তো সে মেতে আছে। তাহলেও বন্ধুকে তো একটা খবর দেওয়া উচিত ছিলো।—ভগ্নীপতি সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে শান্তনুকে একটু তাঁতিয়ে তোলার চেষ্টা করেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি। কিন্তু শান্তনু এরপর নির্বাক।

ঠিক সেই সময়ই মিসেস মুখার্জি মঞ্জুকে নিয়ে হাজির শান্তনুর ঘরে।

নাও এবার মঞ্জুকে ভালো করে পরীক্ষা করো দেখি। দরকার মনে করলে ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। —মিসেস মুখার্জি কর্তার কাছে আগে থেকেই আবেদন করে রাখেন মঞ্জুর একটি বেডের জন্যে।

এখন আর সাধারণভাবে পরীক্ষার অবশ্য তেমন কিছু নেই, মঞ্জুকে দেখেই ক্যাপ্টেন মুখার্জি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন তার কি অবস্থা। তবু বাড়ির সকলের সান্ত্বনার জন্যেই স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে মঞ্জুর বুক-পিঠটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন মুখার্জি সাহেব।

ব্লাউজটা খুলিয়ে নিয়ে মঞ্জুর পিঠে স্টেথিস্কোপ লাগাতে গিয়ে চমকে ওঠেন ডাক্তার।

পাখির ডুখানি উঁচু করে মেলে-ধরা ডানার মতো জেগে উঠেছে দুপাশের দুখানা হাড়। বুকের দিকটা আরো ভীষণ! কী আর এমন বয়েস মঞ্জুর? সাতাশ-আটাশ? কিন্তু যৌবন-মধ্যাহ্নের চিহ্ন কোথায় সেখানে? এ যেন মরু-প্রান্তর।

এমন অনেক রোগীকেই দেখতে হয় বিশেষ করে টি-বি হাসপাতালের ডাক্তারদের। রোগীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতায় অভিভূত হলে চলে না তাঁদের। কর্তব্যের পথে ব্যাঘাতই সৃষ্টি হয় তেমন হলে। কিন্তু শান্তনু লক্ষ্য করে মঞ্জুকে পরীক্ষা করে দেখবার পর করুণায় মমতায় যেন ভরে উঠেছে ক্যাপ্টেন মুখার্জির দৃষ্টি।

স্টেথিস্কোপটা নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ডাক্তার। তারপর বলেন, আগে একটা এক্স-রে প্লেট নিতে হবে। তারপর দেখা যাক হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে কি করা যায়।—এই বলেই গম্ভীরভাবে উঠে পড়ে যাত্রার উদ্যোগ করেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি এবং যেতে যেতেই কতোগুলো পরামর্শ দিয়ে যান শান্তনুকে। তাকে বলে যান, ডাঃ গুপ্তের চেম্বার থেকেই প্লেটটা তুলে নেবার জন্যে।

এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে মিসেস মুখার্জির কাছ থেকেও দীননাথ হাসপাতালের অনেক খবর সংগ্রহ করে নিয়েছে শান্তনু। অপারেশনের পর অনাদি বেশ সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে, দাদুর আসর তেমনি বসছে রোজ বিকেলে, অরিজিতের বাবা অনেকগুলো বই উপহার দিয়েছেন 'নবজীবন সমিতি'র লাইব্রেরীতে, পঞ্চানন বেশ খুশি মনে বিদায় নিয়েছে হাসপাতাল থেকে, সমিতির কাজে হরষিতের যেন উৎসাহের একটু অভাব দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব খবরই ভালো কেবল ঐ শেষ খবরটি ছাড়া। হরষিতের ওপরই যে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলো শান্তনু —সমিতির কাজে তার কাছেই তার সবচেয়ে বেশি আশা। তার উৎসাহে ভাটা পড়েছে শুনে শান্তনুর মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তা হয়েছিলোও। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে গিয়েছে সুমিত্রার কথা—সেই গুণী শিল্পী মেয়েটির কথা। ঐ মেয়েটির কাছ থেকেই কোনো আঘাত এসে থাকবে হয়তো। সমিতির কাছে হরষিতের হতোদ্যম হবার তাই

হয়তো কারণ, এই লাইনেই শান্তনুর ভাবনার গতি এগিয়ে চলেছে কয়েক মুহূর্ত ধরে। কিন্তু সে জন্যে তার যে বিষণ্নতা বা চিন্তা তা নিতান্তই সাময়িক। তার চেয়ে অনেক বেশি বেদনা, অনেক গুরুতর দুশ্চিন্তা তার মনকে যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে অনেক আগে থেকেই। তাই ক্যাপ্টেন মুখার্জি ও মিসেস মুখার্জি চলে যাবার পর হঠাৎ হঠাৎ তাঁদের কথা এবং হাসপাতালের কথা মনে পড়লেও সে সব আবার বিদ্যুৎ চমকের মতোই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

খুড়িয়ে খুড়িয়ে দিন চলে। কিন্তু দৌড়োদৌড়ি থেকে নিস্তার নেই শান্তনুর। মঞ্জুকে একদিন সে নিয়ে গিয়েছিলো ডাঃ গুপ্তের চেম্বারে। খুব কষ্ট করেই নিয়ে গিয়েছিলো এবং ক্যাপ্টেন মুখার্জির নির্দেশের কথাও তাঁকে জানিয়েছিলো। তবু সেদিন মঞ্জুর এক্স-রে পরীক্ষাটা করে দেওয়া সম্ভব হয়নি ডাঃ গুপ্তের পক্ষে। তিনি নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন আর একটা তারিখ এবং সময়-নির্দেশও করে দিয়েছেন। বলেও দিয়েছেন, নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে এলে সহজে এবং তাড়াতাড়ি সেরে দিতে পারবেন তাঁর কাজ।

কিন্তু মঞ্জুকে আর একদিন চেম্বারে টেনে নিয়ে যাবার কথা এখন আর ভাবতেই পারছে না শান্তনু। মঞ্জু যে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে!

ক্যাপ্টেন মুখার্জি মঞ্জুকে দেখে ফিরে যাবার সময় বলে গেছেন শান্তনুকে তার নিজের সম্বন্ধেও খুব হুঁসিয়ার

থাকতে। অসাবধান হলে এ রোগ রি-ল্যাপস করতে খুব বেশি সময় নেয় না, এই বলে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন ডাক্তার।

কিন্তু কী করে হুঁসিয়ার থাকবে শান্তনু। ঘুরে ঘুরেই জ্বর হয় মঞ্জুর। প্রত্যেক দিনই। কাশিটা যখন বাড়ে তখনই জ্বর আসে। কাশির সঙ্গে রক্তের ক্লট পড়ে। ঘুষ ঘুষে জ্বর, তবুও কী ভীষণ দুর্বল! দুর্বল হবে না, কী আছে আর ঐ শরীরে!

এক এক সময় শান্তনু গিয়ে বসে তার রুগ্না স্ত্রীর পাশে। কাঁথার নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মঞ্জুর গায়ে হাত বুলোয়। হাড়গুলো হাতে লাগে আর সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে। অপলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত হয়তো সে চেয়ে থাকে মঞ্জুর মুখের দিকে। বেশিক্ষণ ধরে চাইতে পারে না। মনের দুয়ারে অতীত অকস্মাৎ মুখর হয়ে ওঠে। মঞ্জু যখন এ সংসারে প্রথম আসে তখন সত্যি সত্যি সে ছিলো মঞ্জুশ্রী। আর আজ? আজ কি আর তাকে দেখে সেই মঞ্জুশ্রী বলে চেনবার জো আছে?

খোকন ছুটে ছুটেই চলে আসে মায়ের কাছে। মা ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেকে বার করে দেয় তার ঘর থেকে। ঠাকুমা, পিসিমা বা জ্যেঠির চোখে পড়লে তাঁরাও টেনে নিয়ে যান।

খোকন এখন ঠাকুমার কাছেই থাকে। দুখানা ঘরের মধ্যে বড়োখানায় সবাই মিলে থাকে ওরা। অন্য খানায় থাকে শান্তনু আর মঞ্জু। শান্তনুর সঙ্গে তার বাপ-মায়ের, বোন-বৌদির ভুল বোঝা-বুঝি হলেও খোকনের ব্যাপারে, তার

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবারই অশেষ চিন্তা। বংশটাই কি লোপ পেয়ে যাবে শেষে ; খোকনই যে এই সমাদ্দার বংশের একমাত্র প্রদীপ !

দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করে আর পেরে উঠছে না শান্তনু। ক্রমশই সেও যেন আবার দুর্বলতা বোধ করছে এবং সে দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। আবার তাহলে রি-ল্যাপসই করলো নাকি তার রোগ! শরীরটাও কেমন যেন মেজমেজ করছে কদিন ধরে।

না, আর সন্দেহ নয়, সত্যি সত্যি রি-ল্যাপস।

আগের দিন রাত্তিরে বার দুই কাশি এসেছিলো শান্তনুর। হঠাৎ কাশির সঙ্গে এক টুকরো জমাট রক্ত বেরিয়ে এলো। এর পরেও আর কি বুঝতে বাকি থাকে কিছু ?

মঞ্জুর জন্যে দীননাথ হাসপাতালে বেডের চেষ্টা করবেন এ আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ গুপ্ত। তারপর স্বয়ং ক্যাপ্টেন মুখার্জিও তেমনি কথাই বলে গিয়েছেন। অন্তত একজনের ব্যবস্থাও যদি হয়ে যায় তাহলেও অনেকটা বাঁচোয়া। এই ভেবে শান্তনু সেদিনই দুপুর বেলা মুখে চারটে পুরে দিয়ে ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে।

বিস্তারিত সব কিছু শুনে সহানুভূতি যথেষ্টই দেখালেন সুপারিন্টেডেন্ট। মঞ্জুর প্লেটটা দেখতে চাইলেন। তাঁর সে কথায় চমকে উঠলো শান্তনু। মঞ্জুর এক্স-রে পরীক্ষাটা আগে করিয়ে নেবার কথা যে বলে এসেছিলেন মুখার্জি সাহেব, সে আর স্মরণেই আসে নি সারাদিনে, তখন এমনি শান্তনুর মনের অবস্থা।

ডাঃ গুপ্তের চেম্বারে মঞ্জুকে একদিন নিয়ে গিয়েও যে সেদিন কোনো কাজ হয়নি, আর একদিন যাবার ব্যবস্থা হয়েছে সুপারকে তা জানিয়ে দিয়ে একটু যেন সোয়াস্তি পায় শান্তনু। কিন্তু সে সোয়াস্তিতে কি লাভ, আসল ব্যাপারেই যে আশা-ভরসা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্রি বেডে'র ব্যবস্থা করা যে অসম্ভব তা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করলেন সুপার। হাসপাতালের যে কী অবস্থা তা কি আর শান্তনুরই অজানা!

তবু সান্ত্বনার সুরেই সুপার উপদেশ দিয়েছেন 'প্রপার চ্যানেলে' তাঁর কাছে একটা এপ্লিকেশন দিয়ে যেতে, প্রথম সুযোগেই তিনি তার ওপর অর্ডার ইস্যু করবেন এমন কথাও ক্যাপ্টেন মুখার্জি দিয়েছেন শান্তনুকে।

প্রপার চ্যানেলে এ্যাপ্লাই করার যে কী অর্থ তা আর জানতে বাকি নেই শান্তনুর। তাই তেমন কোনো ভরসা সে করে না সুপারের কথায়। তবু মঞ্জুর নামে একটা আর্জি পেশ করে রাখে, এ পর্যন্ত। এক রকম হতাশ হয়েই সে বাড়ির দিকে ফেরে। মঞ্জুর ভর্তির ব্যবস্থাটা হয়ে গেলে সে ভেবেছিলো সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবে। কিন্তু উদ্দেশ্যের ব্যর্থতায় পালিয়ে যেতে পরেলেই এখন যেন সে বাঁচে!

কিন্তু পালাবে কী করে। চারটে যে বেজে গেলো! বাইরের লোকজন সব আসতে শুরু করবে এখুনি এবং ঘরের রোগীরা সব বাইরে আসতে থাকবে এক এক করে।

ঠিক তাই হয়েছে। অনাদি আর হরবিৎই সবার আগে

বেরিয়ে পড়েছে। পিছন থেকে চলা দেখেই ধরে ফেলেছে অনাদি। অমনি চিৎকার করে উঠেছে—

কে, ভালোদা না? ভালোদা, তুমি চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছ, তার মানে?—অনাদির হাঁক শুনে হরষিৎও তাকিয়ে দেখে, সত্যিই তো তাই! দুজনে ছুটে এগিয়ে যায়। শান্তনুও কি আর সে হাঁক শুনে থমকে না দাঁড়িয়ে পারে?

অনাদিতো বেশ ভালোই আছো দেখছি, কিন্তু হরষিৎ ভায়ার নাকি সমিতির কাজে আজকাল আর তেমন মন বসছে না?—শান্তনুই আগে থেকে জিগ্যেস করে বসে ওদের কোনো সুযোগ না দিয়ে।

রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে কোনো কাজে কি আর মন বসানো যায় ভালোদা?—উত্তরের মধ্যেই নতুন এক প্রশ্ন তোলে অনাদি।

সে আবার কী কথা?

কেন তা জানো না বুঝি! সুমিত্রার হরিণী চোখের আঁচড়ে আঁচড়ে হরষিতের অন্তর যে ক্ষতবিক্ষত।

ওসব কথা এখন রাখো ভাই, দেখছো না ভালোদাকে কেমন নির্জীব দেখাচ্ছে। কী হয়েছে তোমার ভালোদা? আবার কি তা হলে...

না, না ওসব কিছু নয়। তোমাদের বৌদির কিছুদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে এবং তার সঙ্গে আবার কাশি। শুকিয়ে শুকিয়ে এমন পাটখড়ি হয়ে গেছেন যে দেখে চেনবার জো নেই। ডাক্তাররাও খারাপ রোগ বলেই রায় দিয়েছেন। তাই

ছুটে এসেছিলাম হাসপাতালে।—নিজের বিষয় সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে হরষিতের প্রশ্নের জবাব দেয় শান্তনু এইভাবে।

বেডের ব্যবস্থা করতে পারলে কিছু?—অনাদির জিজ্ঞাসায় গভীর উদ্বেগের সুর। সে আরো বলে, পদ্মা নাকি খুব শীগগিরই ছাড়া পাবে শুনেছিলাম।

তা হয়তো হবে, কিছুই জানিনে। তবে সুপারের কথায়ই তাঁর হাতে একটা অবেদনপত্র রেখে এলাম। কবে বেড খালি হবে, কবে তা পাওয়া যাবে সবই অনিশ্চিত। যাক, তোমরা সবাই ভালো আছতো। দাদু, অরিজিৎ, প্রকাশ ওদের সকলকেই আমার কথা বলো। সবার সঙ্গে দেখা করে যাবার ইচ্ছে থাকলেও মনের অবস্থা তেমন নেই। সবাই যেন আমায় ক্ষমা করে।—নিরাশা-জর্জর এ উত্তর দিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় শান্তনু।

একটা বাস আসছে। দূর থেকে আওয়াজ আসছে বাসের। দীননাথ হাসপাতালের সমুখ দিয়েই বাসের গতিবিধি।

অনাদি এবং হরষিৎ দুজনেই গেট অবধি এগিয়ে যায় শান্তনুর সঙ্গে সঙ্গে। চলতে চলতে পঞ্চাননের কথা জিগ্যেস করে বসে হরষিৎ, আচ্ছা ভালোদা তুমি তো পঞ্চানন বলতে অজ্ঞান। তার নাকি বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফুল্লরার সঙ্গে। রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ! তোমার সঙ্গে এসে দেখা করেছে?

না এখনো দেখা করেনি, হয়তো যুগলে এসেই দেখা করবে।—বলেই বাসে উঠে পড়ে শান্তনু। মুহূর্ত বিরতির পরেই ধুলো উড়িয়ে বাস ছাড়ে, দক্ষিণে বাঁক নিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়।

॥ কুড়ি ॥

প্রায় সম্পূর্ণ হতাশা নিয়েই ফিরে আসে শান্তনু। বাড়ির সামনে আসতেই কানে যায় খোকনের কান্না। বাপকে দেখতে পেয়েই কাঁদতে কাঁদতে তার দিকে ছুটে আসে খোকন। খিদে পেয়েছে, তাই কাঁদে।

বছর পাঁচেকের ছেলে। শীর্ণ। আরো শুকিয়ে গেছে এ কয় মাসে। মায়ের আদর যত্ন তো আর পায় না কতোদিন ধরে! বুড়ি ঠাকুমাই বা আর কতো সামলাবে। পিসি-জ্যেঠিতো ঠোঙা বানানো নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত—সংসারের আর সব ঝামেলা তো আছেই।

খোকনের অবস্থা দেখে আজ বেজায় মোচড় লাগে শান্তনুর বুকের মধ্যে।

কান্না-ভাঙা গলায় ছেলেটা এসে যখন চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে—বাবা, বড্ড খিদে পেয়েছে তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না শান্তনু। মাত্র একদিন আগেই সে স্থির করেছিলো, আবার যখন অসুখটা রি-ল্যাপসই করলো তখন আর ভালো না হওয়া পর্যন্ত খোকনকে কিছুতেই সে ছোঁবে না। কিন্তু কালকের সেই সিদ্ধান্ত আজই অনায়াসে ভেঙে বসলো শান্তনু!

খিদে পেয়েছে শুনেই উন্মত্ত পিতা কোলে তুলে নিয়ে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। নিজের

পকেট থেকে কাশি-বন্ধ-রাখার কয়েকটা পিপারমেণ্ট লজেঞ্জ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দেয় খোকনের। আর সঙ্গে সঙ্গেই কান্না থেমে যায়, হাসি ফুটে ওঠে ছেলের মুখে।

সে অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের হাসি আরো উন্মাদ করে তোলে বাপকে। অধীর আবেশে ছেলেকে চুমু খেতে যেতেই হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় শান্তনু। সে যে যক্ষ্মা-রোগী! রোগমুক্ত হয়েও আবার যে সে রোগাক্রান্ত! খোকন যে তারই একমাত্র সন্তান!

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে যায় শান্তনুর মাথায়। শিউরে উঠে সে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয় ছেলেকে তার কোল থেকে। তারপর কী যেন একটু ভাবে। ভাবে তার প্রতিজ্ঞার কথা। দেশময় বিরাট যক্ষ্মা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সেই প্রতিজ্ঞার কথা। সেই আন্দোলনে খোকনই হবে তার প্রধান সহকারী ও পরবর্তী অধিনায়ক, এই ছিলো তার আশা। কিন্তু তার দ্বারা কি আর যক্ষ্মা প্রতিরোধ সম্ভব? এই কালরোগ বিস্তারের কারণও হয়ে উঠতে পারে সে এবং তার স্ত্রী। কে জানে যক্ষ্মাগ্রস্ত বাপ-মায়ের ছোঁয়াচ ভবিষ্যৎ অধিনায়ককেই শেষ পর্যন্ত গ্রাস করে বসবে কি না! না তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। পিতৃসত্য পালন করবে সে। তাকে ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করার জন্যে তাদের দূরে সরে থাকা দরকার। তাই না?

এ প্রশ্ন মনে আসতেই দপ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে

শান্তনুর চোখ ছুটোয়। ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঘর থেকে। আবার যখন ফিরে আসে তখন অনেক রাত্রি।

বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ হঠাৎ গর্জে ওঠে। দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘর বাড়ি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই বিদ্যুতের আলোয় আটচালা ঘরের অন্ধকার এক এক বার সরে সরে যায়, একে অন্যের মুখ দেখে শান্তনু আর মঞ্জুশ্রী। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা কয়।

সহসা আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। শোঁ শোঁ সাঁই সাঁই। তুফানের এই ভয়ংকর শব্দ আতংক ছড়িয়ে দেয় ঘরে ঘরে। ইষ্টমন্ত্র জপতে শুরু করে যতো বুড়োবুড়ি। ঠাকুমার বুকে মুখ গুজে দিয়ে খোকন কিন্তু ঘুমিয়ে যাচ্ছে দিব্যি নিশ্চিন্তে। বাইরের তাণ্ডবের দিকে খোকনের বাপ-মায়েরও তেমন হুঁশ নেই। তাদের অন্তরে যে প্রচণ্ডতর ঝড় বইছে তখন। চিন্তার ঝড়।

০

পরদিন সকাল বেলায় সূর্য-হাসিতে আকাশ-মাটি ঝলমল।

ঘুম থেকে শান্তনু দেরি করেই ওঠে। এ ওর চিরকালেরই অভ্যেস। ইদানীং মঞ্জুশ্রীরও দেরি হয়। অসুস্থতাই তার কারণ।

কিন্তু আজ যেন একটু বেশিই দেরি করে ফেলছে ওরা। শান্তনুর মা-বৌদি ওরা ভাবছেন, বলাবলিও আরম্ভ করেছেন নিজেদের মধ্যে।

শান্ত! শান্ত আছো না কি বাড়িতে?—ভোর বেলায়

এই অপরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে বাইরের দিকে ছুটে যায় অণিমা। বৌদিও এগিয়ে যান তার পিছে পিছে।

বেশ-বাস দেখেই ধরা যায় এরা নবদম্পতি। ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে ভদ্রলোক দূর থেকেই অণিমাকে জিগ্যেস করে, শান্তনু আছে তো!

আছে, আসুন। আপনার নাম?

আমার নাম পঞ্চানন চক্রবর্তী। আর ইনি·······

ও বুঝেছি, দাদার মুখে আপনার নাম অনেকবার শুনেছি। আসুন, আসুন!—সস্ত্রীক পঞ্চাননকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায় অণিমা।

ওমা দেখো কারা এসেছেন। দাদার বন্ধু পঞ্চাননবাবু নতুন বৌদিকে নিয়ে এসেছেন।—মা-বাবা দুজনেই বেরিয়ে আসেন মেয়ের ডাকে। পঞ্চানন এবং ফুল্লরা তাঁদের প্রণাম করে।

তোমাদের খেয়াল আছেতো আজ পনেরোই আশ্বিন, আজ শান্তনুর জন্মদিন?—অণিমাকে লক্ষ্য করেই এই প্রশ্ন করে পঞ্চানন। কিন্তু অণিমা কেন, কারোই সে খেয়াল নেই। তাদের সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে অজান্তেই সেই নির্দিষ্ট তারিখটি আবার বর্ষ পরিক্রমায় ঘুরে এসেছে। ঠিক এই দিনেই গত বছর দীননাথ হাসপাতালে শান্তনুর জন্মদিন পালন করেছিলো রোগী ও কর্মীরা মিলেমিশে। সেই থেকেই এই বিশেষ দিনটির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে আসছে পঞ্চানন। আর তারই জন্যে সপরিবারে সিদ্ধার্থ

কলোনীর এই বাড়িতে আজ তার এভাবে আগমন। ফুল্লরাকে নিয়ে শান্তনুর কাছে আসতেই তো হতো, তবে আজকের দিনটিকেই পঞ্চানন বেছে নিয়েছে।

ও তাই বুঝি এতো ফুল, এতো মিষ্টি!—নিজেদের অখেয়ালকে বুঝতে না দেবার জন্যে অণিমা অন্য কথা তোলে।

কোথায় আর এতো মিষ্টি, জন্মদিনের উৎসবটাই যে মিষ্টির উৎসব।—পঞ্চানন এভাবে উত্তর দেয় বটে, কিন্তু আসল বিষয়টি স্রেফ চেপে যায়। অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এসে ফুল্লরার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যে সে মিলিত হতে পেরেছে, তারা যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে দুজনে উৎসবের ঘটার মধ্যে দিয়ে তা ঘোষিত না হলেও শান্তনুর কাছে নিশ্চয়ই তা আনন্দ সংবাদ। সেই সংবাদের সঙ্গে সন্দেশও কিছু চাই বৈকি!

কিন্তু শান্তনু কোথায়? তার তো আবার দেরিতে ওঠার অভ্যেস। এখনো বুঝি ঘুম ভাঙেনি!—একটু থেমে আবার জিগ্যেস করে পঞ্চানন।

হ্যাঁ, আজ উঠতে একটু বেশি দেরিই করছেন দাদা। বৃষ্টির রাত পেয়ে একটু বেশি গভীর ঘুমই হয়েছে বোধ হয়। আচ্ছা বসুন, আমি দাদাকে একবার ডেকে আসি।—এই বলে দাদার ঘরের দিকে চলে যায় অণিমা।

কিন্তু একি, শান্তনুর ঘরের দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যায় আপনা থেকে! ঘরে যে কেউ নেই, দাদা-বৌদি কোথায় গেলেন! অণিমা ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে ওঠে

আশ্চর্য-বিস্ময়ে। তার হাঁকাহাঁকিতে সবাই এসে জড়ো হয় সেখানে। পঞ্চানন এবং ফুল্লরাও। কান্নাকাটা শুরু হয়ে যায়।

ভাঙা টেবিলটার ওপর পাথর চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ হঠাৎ চোখে পড়ে পঞ্চাননের। সঙ্গে সঙ্গেই সে তুলে নেয় ঐ টুকরো কাগজখানা। ও কোনো বাজে কাগজ নয়। ও ছোট্ট একখানি চিঠি। এক ফাঁকে টুক করে পঞ্চানন পড়ে ফেলে দু লাইনের ঐ চিঠিখানা। হতবাক হয়ে যায় সে মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তেই তার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলে। ফুল্লরাকে একটু আড়ালে ডেকে জানায় সে শান্তনুর লেখা ঐ চিঠির মর্মার্থ। খোকন যাতে রোগমুক্ত থেকে মানুষ হয়ে উঠতে পারে তারই জন্যে শান্তনু এবং মঞ্জুশ্রী হয়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রী। ভবিষ্যৎ জীবনে খোকনের অনেক কাজ। বিরাট তার দায়িত্ব। সে দায়িত্বের উপযোগী করে তাকে গড়ে তোলার অনুরোধ জানিয়ে গেছে শান্তনু ঐ ছোট্ট চিঠিটিতে।

চিঠির কথা পঞ্চানন খুলে বলে সবাইকে। কান্নার রোল আরো বেড়ে ওঠে তাতে। কোথা থেকে ছুটে এসে ভয় পেয়ে খোকনও কান্না জুড়ে দেয়।

ফুল্লরা কোলে তুলে নেয় খোকনকে। অভয় দেয়। আদরে আদরে তাকে শান্ত করে। নতুন এক জাতীয় ব্রত উদযাপনে ভবিষ্যৎ অধিনায়কের যোগ্য করে খোকনকে তৈরি করে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্বও যে ফুল্লরা এবং পঞ্চানন গ্রহণ করেছে।

শেষ